শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

পঞ্চম খণ্ড

ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ

স্বামী সারদানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

নিবেদন

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের' পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হইল। ব্রাহ্মভক্তগণের সহিত প্রথম পরিচয়ের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া গলরোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আগমন-পূর্ব্বক শ্যামপুকুরে অবস্থানকাল পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে ঠাকুরের জীবনের ঘটনাবলী ইহাতে যথাসম্ভব সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঠাকুর এই কালে নিরন্তর দিব্যভাবারূঢ় থাকিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত ব্যবহার ও প্রতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। আবার, এখন হইতে তাঁহার অবশিষ্ট জীবনকাল শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের (স্বামী বিবেকানন্দের) জীবনের সহিত ঈদৃশ মধুর সম্বন্ধে চিরকালের নিমিত্ত মিলিত হইয়াছিল যে, উহার কথা আলোচনা করিতে যাইলে সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রের জীবন-কথা উপস্থিত হইয়া পড়ে। সুতরাং বর্ত্তমান গ্রন্থখানির 'ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ' নামে অভিহিত হ[illegible]ই আমাদের নিকট যুক্তিযুক্ত মনে হইয়াছে।

ঠাকুরের জীবন-লীলা-প্রসঙ্গ যখন প্রথম লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করি তখন আমরা এতদূর অগ্রসর হইতে পারিব, একথা কল্পনায় আনিতে পারি নাই। কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্য কৃপায় উহাও সম্ভবপর হইল ! অতএব তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে বারম্বার প্রণামপূর্ব্বক আমরা গ্রন্থখানি পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। ইতি—

শুক্লা দ্বিতীয়া
২০ ফাল্গুন, ১৩২৫ সাল

বিনীত
গ্রন্থকার

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, পঞ্চম খণ্ডের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাশীপুর-উদ্যানে থাকা-কালীন ঘটনাবলীর কিয়দংশ ১৩২৬ সালে 'উদ্বোধনের' শ্রাবণ ভাদ্র এবং আশ্বিন-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে কোন পুস্তকে সন্নিবেশিত হয় নাই। এই সংস্করণে পুস্তকের শেষাংশে পরিশিষ্টাকারে সেগুলি সংযোজিত হইল। ইতি—

১৩ই আশ্বিন, বিনীত—

১৩৪২ সন প্রকাশক

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়—প্রথম পাদ

প্রথম অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

প্রথম অধ্যায়—তৃতীয় পাদ

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্ব্ব-পরিদৃষ্ট ভক্তগণের ঠাকুরের নিকটে আগমনারম্ভ

৫০—৬১

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়—প্রথম পাদ

ষষ্ঠ অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়—প্রথম পাদ

অষ্টম অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়—প্রথম পাদ

দ্বাদশ অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

দ্বাদশ অধ্যায়—তৃতীয় পাদ

পরিশিষ্ট

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ

পূর্ব্বকথা

৺ষোড়শীপূজার অনুষ্ঠান করিয়া ঠাকুর নিজ সাধন-যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, একথা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। উহা সন ১২৮০ সালে, ইংরাজী ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত হইয়াছিল। অতএব এখন হইতে তিনি দিব্য-ভাবের প্রেরণায় জীবনের সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, একথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না। ঠাকুরের বয়স তখন আটত্রিশ বৎসর ছিল। সুতরাং উনচল্লিশ বর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া কিঞ্চিদধিক দ্বাদশ বর্ষকাল তাঁহার জীবনে ঐ ভাব নিরন্তর প্রবাহিত ছিল। শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছায় তাঁহার চেষ্টাসমূহ এইকালে অদৃষ্টপূর্ব্ব অভিনব আকার ধারণ করিয়াছিল। উহার প্রেরণায় তিনি এখন বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য-শিক্ষাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে ধর্ম্ম-সংস্থাপনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। অতএব বুঝা যাইতেছে, পূর্ণ দ্বাদশবর্ষব্যাপী তপস্যার অন্তে ঠাকুর নিজ শক্তির এবং জনসাধারণের আধ্যাত্মিক অবস্থার সহিত পরিচিত হইতে ছয় বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন; পরে ইহকালসর্ব্বস্ব পাশ্চাত্যভাবসমূহের প্রবল প্রেরণায় ভারতে যে ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল তন্নিবারণ

দিব্যভাবের বিশেষ প্রকাশ ঠাকুরের জীবনে কতকাল ছিল—তন্নির্ণয়

ও সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে বিশেষভাবে ব্রতী হইয়া দ্বাদশ-বৎসরান্তে উক্ত ব্রতের উদ্‌যাপনপূর্ব্বক সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত কার্য্য তিনি যেরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহাই এখন আমরা যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইব।

ঠাকুরের জীবনের শেষ দ্বাদশ বর্ষে ঐ ভাবের বিশেষ প্রকাশ কেন বলা যায়

পাঠক হয়ত আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত কথায় স্থির করিবেন যে, উনচল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত ঠাকুর সাধকের ভাবেই অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহা নহে। 'গুরুভাব'-শীর্ষক গ্রন্থে আমরা ইতিপূর্ব্বে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছি যে, গুরু নেতা বা ধর্ম্মসংস্থাপকের পদবী স্বভাবতঃ গ্রহণপূর্ব্বক যাঁহারা মানবের হিতসাধন করিয়া চিরকালের নিমিত্ত জগতে পূজ্য হইয়াছেন, বাল্যকাল হইতেই তাঁহাদিগের জীবনে ঐ সকল গুণের স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য ঠাকুরের জীবনে বাল্যকাল হইতেই আমরা ঐ সকল ভাবের পরিচয় পাইয়া থাকি—যৌবনে সাধনকালে উহাদের প্রেরণায় তিনি অনেক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন একথা বুঝিতে পারি এবং সাধনাবস্থার অবসানে তাঁহার বত্রিশ বৎসর বয়সে শ্রীযুত মথুরের সহিত তীর্থপর্য্যটনকালে এবং পরে উহাদিগের সহায়ে প্রায় সকল কার্য্য করিতেছেন, ইহা দেখিতে পাই। অতএব সন ১২৮১ সাল হইতে তাঁহাতে দিব্যভাবের প্রকাশ এবং তাঁহার ধর্ম্মসংস্থাপনকার্য্যে মনোনিবেশ বলিয়া যে এখানে নির্দ্দেশ করিতেছি তাহার কারণ, এখন হইতে তিনি দিব্যভাবের নিরন্তর প্রেরণায় পাশ্চাত্ত্যের জড়বাদ ও জড়বিজ্ঞানমূলক যে শিক্ষা ও সভ্যতা ভারতে প্রবিষ্ট হইয়া ভারত-ভারতীকে প্রতিদিন বিপরীত-ভাবাপন্ন করিয়া

সনাতন ধর্ম্মমার্গ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছিল, তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ইংরাজীশিক্ষাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাকল্পে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিয়া জনসাধারণের জীবন ধন্য করিয়াছিলেন।

ঐরূপ করিবার যে বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল, এ কথা বলিতে হইবে না। ঈশ্বরকৃপায় ঠাকুরের অলৌকিক আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্ন দিব্যভাবময় জীবন উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইলে ভারতের নিজ জাতীয়ত্বের এবং সনাতন ধর্ম্মের এককালে লোপসাধন হইত বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। বাস্তবিক, ভাবিয়া দেখিলে একথা বেশ বুঝা যায় যে, ঠাকুর নিজ জীবনে যাবতীয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত সাধনপূর্ব্বক 'যত মত তত পথ'-রূপ সত্যের আবিষ্কার করিয়া যেমন পৃথিবীস্থ সর্ব্বদেশের সর্ব্বজাতির কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, তদ্রূপ পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের সম্মুখে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর নিজ আদর্শ-জীবন অতিবাহিত করিয়া তাহাদিগের মধ্যে এই কালে ধর্ম্মসংস্থাপনের যে চেষ্টা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা পাশ্চাত্যভাবরূপ বন্যা প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় বিষম সঙ্কটে ভারত উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছে। অতএব সনাতন ধর্ম্মের সহিত পূর্ব্বপ্রচলিত সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মমতকে সংযুক্ত করিয়া অধিকারিভেদে তাহাদিগের সম-সমান প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণ করা যেমন তাঁহার জীবনের বিশেষ কার্য্য বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তদ্রূপ পাশ্চাত্য জড়বাদের প্রবল স্রোতে নিমজ্জনোন্মুখ ভারতের উদ্ধারসাধন তাঁহার জীবনের ঐরূপ দ্বিতীয় কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ

দিব্যভাবের সহায়ে ঠাকুর পাশ্চাত্যভাব-বন্যার গ্লানি হইতে ভারতকে মুক্ত করিয়াছেন

করা যাইতে পারে। সন ১২৪২ সাল বা ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় এবং ঐ বৎসরেই ঠাকুর জন্মপরিগ্রহ করেন। অতএব পাশ্চাত্যশিক্ষার দোষভাগ যে শক্তির দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইবে এবং যাহার সহায়ে ভারত নিজ বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণভাগকে মাত্র নিজস্ব করিয়া লইবে, বিধাতার বিধানে তদুভয় শক্তির ভারতে যুগপৎ উদয় দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

দিব্যভাবের প্রকাশ মানব-জীবনে কখন উপস্থিত হয়

আধ্যাত্মিক রাজ্যের শীর্ষস্থানে অবস্থিত দিব্যভাবের পূর্ণ প্রকাশ মানব-জীবনে বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ জীব ঈশ্বরকৃপায় মুক্ত হইয়া উক্ত ভাবের সামান্যমাত্র-আস্বাদনেই সমর্থ হইয়া থাকে। কারণ মানব যখন শমদমাদি গুণসমূহ শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় বিনায়াসে অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়, পরমাত্মার প্রেমে আত্মহারা হইয়া তাহার ক্ষুদ্র আমিত্ববোধ যখন চিরকালের নিমিত্ত অখণ্ডসচ্চিদানন্দ-সাগরে বিলীন হইয়া থাকে, নির্ব্বিকল্প সমাধিতে ভস্মীভূত হইয়া তাহার মন-বুদ্ধি যখন সর্ব্বপ্রকার মলিনতা পরিহারপূর্ব্বক শুদ্ধসাত্ত্বিক বিগ্রহে পরিণত হয় এবং তাহার অন্তরের অনাদি বাসনা-প্রবাহ জ্ঞানসূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে এককালে বিশুষ্ক হইয়া যখন নবীন সংস্কার ও কর্ম্মপুঞ্জের উৎপাদনে আর সমর্থ হয় না—তখনই তাহাতে দিব্যভাবের উদয় হইয়া তাহার জীবন কৃতার্থ হইয়া থাকে। অতএব দিব্যভাবের পূর্ণ প্রকাশে চিরপরিতৃপ্ত ব্যক্তির দর্শনলাভ যেমন অতীব বিরল, তেমনি আবার ঐরূপ ব্যক্তির কার্য্যকলাপ কোনও প্রকার অভাব-

বোধ হইতে প্রস্তুত না হওয়ায় উদ্দেশ্যবিহীন বলিয়া প্রতীত হইয়া সাধারণ মন-বুদ্ধির নিকটে চিরকাল দুর্ব্বোধ্য থাকে। সুতরাং দিব্যভাবের স্বরূপ যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে কেবলমাত্র দিব্য-ভাবারূঢ় ব্যক্তিই সমর্থ হয় এবং উক্ত ভাবের প্রেরণায় যে-সকল অলৌকিক কার্য্যাবলী সম্পাদিত হয়, সে-সকলের আলোচনা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিত না করিলে তাহাদিগের কিঞ্চিন্মাত্র মর্ম্মগ্রহণও আমাদের ন্যায় মন-বুদ্ধির কখন সম্ভবপর হয় না।

দিব্যভাবের পূর্ণপ্রকাশ একমাত্র অবতার-পুরুষসকলেই দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাস ঐ বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করে। ঐজন্যই অবতারচরিত্র আমাদিগের নিকটে চির-রহস্যময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বাস্তবিক, আমরা কল্পনা-সহায়ে মায়ারহিত ব্রহ্মজ্ঞানাবস্থার আংশিক চিত্র মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে পারি, কিন্তু ঐ অবস্থায় যাঁহারা সহজ ও স্বাভাবিকভাবে সর্ব্বদা অবস্থান করেন, তাঁহারা কি ভাবে কোন্ উদ্দেশ্যে—কখনও আমাদিগের ন্যায় এবং কখনও অসীমশক্তিসম্পন্ন দেবতার ন্যায়—কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করেন, তাহা ধরিতে বুঝিতে পারি না। আমাদিগের মন-বুদ্ধি দূরে থাকুক, কল্পনা পর্য্যন্ত ঐ বিষয়ে অগ্রসর হইয়া সর্ব্বতোভাবে পরাজয় স্বীকার করে। অতএব শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের এই কালের কার্য্যাবলীর সম্যক্ আলোচনা যে সম্ভবপর নহে, তাহা আর বলিতে হইবে না। সুতরাং তাঁহার এই কালের কার্য্যপরম্পরার উল্লেখমাত্র করিয়া উহাদিগের সফলতাদর্শনে যেটি যে উদ্দেশ্যে সম্পাদিত বলিয়া

অবতারপুরুষদিগের জীবনে ঐ স্বভাবের বিশেষ প্রকাশ থাকায় তাঁহাদিগের চরিত্র এত দুর্ব্বোধ্য ও রহস্যময়

আমরা ধারণা করিয়াছি, তাহাই কেবল পাঠককে বলিয়া যাইব। কার্য্যের গুরুত্ব দেখিয়াই আমরা কারণের মহত্ত্বের সর্ব্বত্র পরিমাণ করিয়া থাকি। ঠাকুরের এই কালের কার্য্যাবলীর অলৌকিকত্ব অনুধাবন করিয়া তাঁহার অন্তরে দিব্যভাবের কতদূর অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রকাশ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে আমাদিগের বিলম্ব হইবে না।

দিব্যভাবারূঢ় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কার্য্যসকল অতঃপর কেবলমাত্র ধর্ম্মসংস্থাপনোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইলেও, উহাদিগের মধ্যে সাতটি প্রধান বিভাগ দৃষ্ট হয়। দেখিতে পাওয়া যায়—

উক্ত ভাবাবলম্বনে ঠাকুর যে-সকল কার্য্য করিয়াছেন তাহাদিগের সাতটি প্রধান বিভাগ-নির্দ্দেশ

১ম। তিনি তাঁহার সতী সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্মজীবন অপূর্ব্বভাবে গঠিত করিয়া তাহাকে অপরে ধর্ম্মশক্তিসঞ্চারের প্রবল কেন্দ্রস্বরূপা করিয়া তুলিয়াছিলেন।

২য়। উচ্চাদর্শে জীবন পরিচালিত করিয়া যে-সকল ব্যক্তি তৎকালে কলিকাতা মহানগরীতে ধর্ম্মবিষয়ে নেতা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎপূর্ব্বক নিজ আধ্যাত্মিক শক্তিসহায়ে তাঁহাদিগের জীবন সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

৩য়। দক্ষিণেশ্বরে সমাগত সর্ব্ববিধ সম্প্রদায়ের পিপাসু ব্যক্তি-সকলকে ধর্ম্মালোকপ্রদানে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

৪র্থ। যোগদৃষ্টিসহায়ে পূর্ব্বপরিদৃষ্ট ব্যক্তিগণকে নিজসকাশে আগমন করিতে দেখিয়া অধিকারিভেদে শ্রেণীবিভাগপূর্ব্বক তাহা-দিগের ধর্ম্মজীবন গঠন করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

৫ম। ঐ সকল ব্যক্তিদিগের মধ্যে কতকগুলিকে ঈশ্বরলাভের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগরূপ ব্রতে দীক্ষিত করিয়া সংসারে নিজ অভিনব উদার মত-প্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন।

৬ষ্ঠ। কলিকাতা-নিবাসী নিজ ভক্তগণের বাটীতে পুনঃ পুনঃ আগমনপূর্ব্বক ধর্ম্মালাপ ও কীর্ত্তনাদি-সহায়ে তাহাদিগের পরিবার-বর্গের এবং পল্লীবাসিগণের জীবনে ধর্ম্মভাব বিশেষভাবে প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন।

৭ম। অপূর্ব্ব প্রেমবন্ধনে নিজ ভক্তগণকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগের মধ্যে এমন অদ্ভুত একপ্রাণতা আনয়ন করিয়া-ছিলেন যে, উহার ফলে তাহারা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া ক্রমে এক উদার ধর্ম্মসঙ্ঘে স্বভাবতঃ পরিণত হইয়াছিল।

উক্ত সাত প্রকারের কার্য্যাবলীর মধ্যে প্রথমোক্তটি ঠাকুর কিরূপে সন ১২৮০ সালে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা পাঠককে 'সাধকভাব'-শীর্ষক গ্রন্থের শেষভাগে বলিয়াছি। উহার পর বৎসরে সন ১২৮১ সালে তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের নেতা আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া কি ভাবে দ্বিতীয় প্রকারের কার্য্যাবলী আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাও উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টে আমরা আলোচনা করিয়াছি। আবার পূর্ব্বোক্ত বিভাগের তৃতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ শ্রেণীর কার্য্যাবলীর সামান্য পরিচয় আমরা 'গুরুভাব' গ্রন্থের উত্তরার্দ্ধের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তমাধ্যায়ে পাঠককে প্রদান করিয়াছি। অতএব অবশিষ্ট প্রকারের কার্য্যসকল তিনি কখন কি ভাবে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাই আমরা সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করিব।

প্রথম অধ্যায়—প্রথম পাদ

ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুরের প্রভাব

কেশব-প্রমুখ ব্রাহ্মগণের ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পরে কলিকাতার জনসাধারণ ঠাকুরের কথা জানিতে পারিয়াছিল। গুণগ্রাহী কেশব প্রথম দর্শনের দিন হইতেই যে ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, একথা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত হইলেও তাঁহার হৃদয় যথার্থ ঈশ্বর-ভক্তিতে পূর্ণ ছিল এবং অমৃতময় ভক্তিরসের একাকী সম্ভোগ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সুতরাং ঠাকুরের পুণ্যদর্শন ও অমৃতনিঃস্যন্দিনী বাণীতে তিনি জীবনপথে যতই নূতন আলোক দেখিতে লাগিলেন, ততই ঐকথা মুক্তকণ্ঠে জনসাধারণকে জানাইয়া তাহারা সকলেও যাহাতে তাঁহার ন্যায় তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য সোৎসাহে আহ্বান করিতে লাগিলেন। সেইজন্য দেখা যায়, পূর্ব্বোক্ত সমাজের ইংরাজী ও বাংলা যাবতীয় পত্রিকা, যথা—'সুলভ সমাচার', 'সান্‌ডে মিরর্‌', 'থিইষ্টিক্ কোয়ার্টারলি রিভিউ' প্রভৃতি এখন হইতে ঠাকুরের পূত চরিত, সারগর্ভ বাণী ও ধর্ম্মবিষয়ক মতামতের আলোচনায় পূর্ণ। বক্তৃতা এবং একত্র উপাসনার পরে বেদী হইতে ব্রাহ্মসঙ্ঘকে সম্বোধনপূর্ব্বক উপদেশপ্রদানকালেও কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্ম-নেতাগণ অনেক সময়ে ঠাকুরের বাণীসকল আবৃত্তি করিতেছেন। আবার অবসর পাইলেই

তাঁহারা কখন দু-চারিজন অন্তরঙ্গের সহিত এবং কখন বা সদলবলে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সদালাপে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া আসিতেছেন।

ঠাকুরের ব্রাহ্মগণের সহিত সপ্রেম সম্বন্ধ

ব্রাহ্মনেতাগণের ধর্ম্মপিপাসা ও ঈশ্বরানুরাগদর্শনে আনন্দিত হইয়া যাহাতে তাঁহারা সাধনসমুদ্রে এককালে ডুবিয়া যাইয়া ঈশ্বরের প্রত্যক্ষদর্শনরূপ রত্নলাভে কৃতার্থ হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে পথ দেখাইতে ঠাকুর এখন বিশেষভাবে যত্নপর হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সহিত হরি-কথা ও কীর্ত্তনে তিনি এত আনন্দ অনুভব করিতেন যে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রায়ই মধ্যে মধ্যে কেশবের বাটীতে উপস্থিত হইতেন। ঐরূপে উক্ত সমাজস্থ বহু পিপাসু ব্যক্তির সহিত তিনি ক্রমে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন এবং কেশব ভিন্ন কোন কোন ব্রাহ্মগণের বাটীতেও কখন কখন উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিতেন। সিঁদুরিয়াপটির মণিমোহন মল্লিক, মাথাঘষা গলির জয়গোপাল সেন, বরাহনগরস্থ সিঁতি নামক পল্লীর বেণীমাধব পাল, নন্দনবাগানের কাশীশ্বর মিত্র প্রভৃতি ব্রাহ্মমতাবলম্বী ব্যক্তিগণের বাটীতে উৎসবকালে এবং অন্য সময়ে তাঁহার গমনাগমনের কথা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লিখিত হইতে পারে। কখন কখন এমনও হইয়াছে যে, বেদী হইতে উপদেশপ্রদানকালে তাঁহাকে সহসা মন্দিরমধ্যে আগমন করিতে দেখিয়া শ্রীযুত কেশব উহা সম্পূর্ণ না করিয়াই বেদী হইতে নামিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার বাণীশ্রবণে ও তাঁহার সহিত কীর্ত্তনানন্দে সেই দিনের উপাসনার উপসংহার করিয়াছেন।

স্ব স্ব সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণের সহিতই মানব অকপটে মিলিত হইতে এবং নিঃসঙ্কোচ আনন্দানুভব করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহাদিগের সহিত তাঁহাকে ঐরূপভাবে মিলিত হইতে এবং আনন্দ করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মনেতাগণ যে ঠাকুরকে এখন তাঁহাদিগের ভাবের ও মতের লোক বলিয়া স্থির করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। হিন্দুদিগের শাক্ত-বৈষ্ণবাদি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাঁহাকে তাঁহাদিগের প্রত্যেকের সহিত ঐরূপে যোগদান ও আনন্দ করিতে দেখিয়া অনেক সময়ে ঐরূপ করিয়াছেন। কারণ সর্ব্বভাবের উৎপত্তি এবং সমন্বয়ভূমি 'ভাবমুখে' অবস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই যে ঠাকুর ঐরূপ করিতে পারিতেন —একথা তখন কে বুঝিবে? কিন্তু তিনি যে তাঁহাদিগের সহিত নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের ধ্যান ও কীর্ত্তনাদিতে তন্ময় হইয়া তাঁহাদিগের অপেক্ষা অধিক আনন্দ অনুভব করিতেছেন এবং তাঁহারা যেখানে অন্ধকার দেখিতেছেন সেখানে অপূর্ব্ব আলোক সত্যসত্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন, এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজস্থ ব্যক্তিগণের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাঁহারা এ কথাও বুঝিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া তাঁহার ন্যায় তন্ময় হইতে না পারিলে ঐরূপ দর্শন ও আনন্দানুভব কখন সম্ভবপর নহে।

ঠাকুর তাঁহাদিগের মতের লোক—ব্রাহ্মদিগের এইরূপ ধারণা হইবার কারণ

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজস্থ অনেকগুলি ব্যক্তির সত্যানুরাগ, ত্যাগশীলতা এবং ধর্ম্মপিপাসা প্রভৃতি সদ্‌গুণনিচয় দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাদিগকে নিজ জীবনাদর্শে ধর্ম্মপথে অগ্রসর করিয়া দিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তিগণ যে সম্প্রদায়ভুক্তই

হউন না কেন, তিনি তাঁহাদিগকে চিরকাল পরমাত্মীয় জ্ঞান করিতেন এবং যাহাতে তাঁহারা নিজ নিজ পথে অগ্রসর হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হন, তদ্বিষয়ে অকাতরে সাহায্য প্রদান করিতেন। আবার যথার্থ ঈশ্বরভক্ত সকলকে ঠাকুর এক পৃথক জাতি বলিয়া সর্ব্বদা নির্দ্দেশ করিতেন এবং তাঁহাদিগের সহিত একত্রে পান-ভোজন করিতে কখনও দ্বিধা করিতেন না। অতএব কেশব এবং তাঁহার পার্ষদগণ, যথা—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, চিরঞ্জীব শর্ম্মা, শিবনাথ শাস্ত্রী, অমৃতলাল বসু প্রমুখ ব্যক্তিগণকে তিনি যে এখন পরম স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আধ্যাত্মিক সহায়তা করিতে উদ্যত হইবেন এবং তাঁহাদিগের সহিত একত্র পান-ভোজনে সঙ্কুচিত হইবেন না, একথা বলা বাহুল্য। পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং ভাব-সহায়ে ইঁহারা যে জাতীয় ধর্ম্মাদর্শ হইতে বহুদূরে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন এবং অনেক সময়ে সমাজ-সংস্কারকেই ধর্ম্মানুষ্ঠানের চূড়ান্ত জ্ঞান করিয়া বসিতেছেন, একথা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। তিনি সেজন্য তাঁহাদিগের ভিতরে যথার্থ সাধনানুরাগ প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং সমাজ তাঁহাদিগের সহিত ঐ পথে অগ্রসর হউক বা নাই হউক, একমাত্র ঈশ্বর-লাভকেই তাঁহাদিগকে জীবনোদ্দেশ্যরূপে অবলম্বন করাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ফলে শ্রীযুত কেশব সদলবলে তৎপ্রদর্শিত মার্গে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন—মধুর মাতৃনামে ঈশ্বরকে সম্বোধন ও তাঁহার মাতৃত্বের উপাসনা সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল এবং উক্ত সমাজের সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি সকল বিষয়ে ঠাকুরের

ব্রাহ্মসাধকদিগকে ঠাকুরের সাধন-পথে অগ্রসর করা

ভাব প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে সরস করিয়া তুলিয়াছিল। শুদ্ধ তাহা নহে; কিন্তু ভ্রম ও কুসংস্কারপূর্ণ ভাবিয়া হিন্দুদিগের যে আদর্শ ও অনুষ্ঠানসকল হইতে ব্রাহ্মসমাজ আপনাকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক করিয়াছিল, সে-সকলের মধ্যে অনেক বিষয় ভাবিবার এবং শিখিবার আছে—উক্ত সমাজের নেতাগণ একথাও ঠাকুরের জীবনালোকে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মগণকে 'ল্যাজা-মুড়ো' বাদ দিয়া তাঁহার কথা গ্রহণ করিতে বলিবার কারণ

পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত কেশব ও তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহার সকল প্রকার ভাব ও উপদেশ যে যথাযথ বুঝিতে পারিবেন না এবং যাহা বুঝিতে পারিবেন তাহাও সম্যক্ গ্রহণ করা তাঁহাদিগের রুচিকর হইবে না—এ বিষয় ঠাকুর পূর্ব্ব হইতেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে উপদেশপ্রদানকালে কোন কথা বলিবার পরে ঐ বিষয় স্মরণ করিয়া তিনি সেজন্য প্রায়ই বলিতেন, "আমি যাহা হয় বলিয়া যাইলাম, তোমরা উহার 'ল্যাজা-মুড়ো' বাদ দিয়া গ্রহণ করিও।" আবার ব্রাহ্মসমাজভুক্ত অনেক ব্যক্তির নিকটে সমাজসংস্কার এবং ভোগবাসনার তৃপ্তিসাধন জীবনোদ্দেশ্যের স্থল অধিকার করিয়াছে—একথা তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। ঐ বিষয় তিনি অনেক সময়ে রহস্যচ্ছলে প্রকাশও করিতেন। বলিতেন—

"কেশবের ওখানে গিয়াছিলাম। তাহাদের উপাসনা দেখিলাম। অনেকক্ষণ ভগবদ্-ঐশ্বর্য্যের কথাবার্ত্তার পরে বলিল—'এইবার আমরা তাঁহার (ঈশ্বরের) ধ্যান করি।' ভাবিলাম কতক্ষণ না জানি ধ্যান করিবে! ওমা! দু-মিনিট চোক্ বুজিতে না বুজিতেই হইয়া গেল!—এই রকম ধ্যান করিয়া কি তাঁহাকে

পাওয়া যায়? যখন তাহারা সব ধ্যান করিতেছিল, তখন সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম। পরে কেশবকে বলিলাম, 'তোমাদের অনেকের ধ্যান দেখিলাম, কি মনে হইল জান?—দক্ষিণেশ্বরে ঝাউতলায় কখন কখন হনুমানের পাল চুপ করিয়া বসিয়া থাকে—যেন কত ভাল, কিছু জানে না। কিন্তু তা নয়, তারা তখন বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে—কোন্ গৃহস্থের চালে লাউ বা কুম্‌ড়োটা আছে, কাহার বাগানে কলা বা বেগুন হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরেই উপ্ করিয়া সেখানে গিয়া পড়িয়া সেইগুলি ছিঁড়িয়া লইয়া উদরপূর্ত্তি করে। অনেকের ধ্যান দেখিলাম ঠিক সেই রকম!' সকলে শুনিয়া হাসিতে লাগিল।"

ঠাকুরের রহস্যচ্ছলে শিক্ষাপ্রদান

এরূপ রহস্যচ্ছলে শিক্ষাপ্রদান তিনি কখন কখন আমাদিগকেও করিতেন। আমাদের স্মরণ আছে, স্বামী বিবেকানন্দ একদিন তাঁহার সম্মুখে ভজন গাহিতেছিলেন। স্বামিজী তখন ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেন এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইবার উক্ত সমাজের ভাবে উপাসনা ও ধ্যানাদি করিয়া থাকেন। '(সেই) এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনে চিত্ত সমাধান কর রে' ইত্যাদি ব্রহ্মসঙ্গীতটি তিনি অনুরাগের সহিত তন্ময় হইয়া গাহিতে লাগিলেন। উক্ত সঙ্গীতের একটি কলিতে আছে—'ভজন-সাধন তাঁর কর রে নিরন্তর'; ঠাকুর ঐ কথাগুলি স্বামিজীর মনে দৃঢ়মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য সহসা বলিয়া উঠিলেন, "না, না, বল্—'ভজন-সাধন তাঁর কর রে দিনে দুবার'—কাজে যাহা করিবি না, মিছামিছি তাহা কেন বলিবি?" সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, স্বামিজীও কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন।

আর এক সময় ঠাকুর উপাসনাসম্বন্ধে কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্মগণকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা তাঁহার (ঈশ্বরের) ঐশ্বর্য্যের কথা অত করিয়া বল কেন? সন্তান কি তাহার বাপের সম্মুখে বসিয়া 'বাবার আমার কত বাড়ী, কত ঘোড়া, কত গরু, কত বাগ-বাগিচা আছে' এই সব ভাবে? অথবা বাবা তাহার কত আপনার, তাহাকে কত ভালবাসে, ইহা ভাবিয়া মুগ্ধ হয়? ছেলেকে বাপ খাইতে পরিতে দেয়, সুখে রাখে, তাহাতে আর কি হইয়াছে? আমরা সকলেই তাঁহার (ঈশ্বরের) সন্তান, অতএব তিনি যে আমাদের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যথার্থ ভক্ত সেইজন্য ঐ সকল কথা না ভাবিয়া তাঁহাকে আপনার করিয়া লইয়া তাঁহার উপর আবদার করে, অভিমান করে, জোর করিয়া তাঁহাকে বলে, 'তোমাকে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেই হইবে, আমাকে দেখা দিতেই হইবে।' অত করিয়া ঐশ্বর্য্য ভাবিলে, তাঁহাকে খুব নিকটে, খুব আপনার বলিয়া ভাবা যায় না, তাঁহার উপর জোর করা যায় না। তিনি কত মহান্, আমাদের নিকট হইতে কত দূরে, এইরূপ ভাব আসে। তাঁহাকে খুব আপনার বলিয়া ভাব, তবে ত হইবে (তাঁহাকে পাওয়া যাইবে)।"

ব্রাহ্মগণকে শিক্ষাপ্রদান—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ঈশ্বরকে আপনার করা যায় না।

ঈশ্বরলাভের জন্য সাধন-ভজন ও বিষয়বাসনা-ত্যাগের একান্ত প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা করা ভিন্ন ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়া কেশব-প্রমুখ ব্রাহ্মগণ অন্য একটি বিষয়ও জানিতে পারিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যের ধর্ম্মপ্রচারকগণের মুখে এবং ইংরাজী পুস্তকাদি হইতে

তাঁহারা শিক্ষা করিয়াছিলেন, ঈশ্বর কখন সাকার হইতে পারেন না; অতএব কোন সাকার মূর্ত্তিতে তাঁহার অধিষ্ঠান স্বীকার করিয়া পূজোপাসনাদি করায় মহাপাপ হয়। কিন্তু "নিরাকার জল জমিয়া সাকার বরফ হওয়ার ন্যায় নিরাকার সচ্চিদানন্দের ভক্তিহিমে জমিয়া সাকার হওয়া", "শোলার আতা দেখিয়া যথার্থ আতা মনে পড়ার ন্যায় সাকার মূর্ত্তি-অবলম্বনে ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপের প্রত্যক্ষজ্ঞানে পৌছান" —ইত্যাদি প্রতীকোপাসনার কথা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়া তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, 'পৌত্তলিকতা' নামে নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহারা যে কার্য্যটাকে এতদিন নিতান্ত যুক্তিহীন ও হেয় ভাবিয়া আসিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বলিবার ও চিন্তা করিবার অনেক বিষয় আছে। তদুপরি যেদিন ঠাকুর, 'অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তির ন্যায় ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম-শক্তির প্রকাশ বিরাট জগতের অভিন্নতা' কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্মগণের নিকটে প্রতিপাদন করিলেন, সেদিন যে তাঁহারা সাকারোপাসনাকে নূতন আলোকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহারা সেদিন নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিলেন যে কেবলমাত্র নিরাকার সগুণ ব্রহ্মরূপে নির্দ্দেশ করিলে ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপের একাংশমাত্রই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, ঈশ্বর-স্বরূপকে কেবল-মাত্র সাকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করায় যে দোষ হয়, কেবলমাত্র নিরাকার সগুণ বলিয়া উহাকে নির্দ্দেশ করিলে তদ্রূপ দোষ হয়। কারণ ঈশ্বর সাকার-জগৎরূপে ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন, নিরাকার সগুণ-ব্রহ্মস্বরূপে জগতের নিয়ামক হইয়া রহিয়াছেন, আবার সর্ব্বগুণের অতীত থাকিয়া ঈশ্বর জীব, জগৎ প্রভৃতি যাবতীয় ব্যক্তি ও বস্তুর নামরূপযুক্ত

ঈশ্বরের স্বরূপের অন্ত নির্দ্দেশ করা যায় না

প্রকাশের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া সতত অবস্থান করিতেছেন। "ঈশ্বর-স্বরূপের ইতি করিতে নাই—তিনি সাকার, তিনি নিরাকার (সগুণ) এবং তাহা ছাড়া তিনি আরও যে কি, তাহা কে জানিতে-বলিতে পারে?" ঠাকুরের এই সামান্য উক্তির ভিতর ঐরূপ গভীর অর্থ দেখিতে পাইয়া কেশবপ্রমুখ সকলে সেদিন স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষীয় সমাজের রূপপরিবর্ত্তন

ঐরূপে সন ১২৮১ সালের চৈত্র মাসে, ইংরাজী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে, ঠাকুরের পুণ্যদর্শন প্রথম লাভ করিবার পর হইতে তিন বৎসরের কিঞ্চিদধিককাল পর্য্যন্ত কেশব-পরিচালিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পাশ্চাত্যভাবের মোহ হইতে দিন দিন বিমুক্ত হইয়া নবীনাকার ধারণ করিতে লাগিল এবং ব্রাহ্মগণের মধ্যে অনেকের সাধনানুরাগ সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিল। পরে সন ১২৮৪ সালে, ইংরাজী ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ্চ তারিখে শ্রীযুত কেশব তাঁহার কন্যাকে কুচবিহার প্রদেশের মহারাজের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিলেন। বিবাহকালে কন্যার বয়সের যে সীমা ব্রাহ্মসমাজ ইতিপূর্ব্বে স্থির করিয়াছিল, কেশব-দুহিতার বয়স তদপেক্ষা কিঞ্চিন্ন্যূন থাকায় উক্ত বিবাহ লইয়া সমাজে বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হইল এবং পাশ্চাত্যানুকরণে সমাজসংস্কারপ্রিয়তারূপ শিলাখণ্ডে প্রতিহত হইয়া এখন হইতে উহা 'ভারতবর্ষীয়' ও 'সাধারণ' নামক দুই ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজের উপর ঠাকুরের প্রভাব কিন্তু ঐ ঘটনায় নিরস্ত হইল না। তিনি উভয় পক্ষকে সমান আদর করিতে লাগিলেন এবং উভয় পক্ষের পিপাসু ব্যক্তিগণই তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় আধ্যাত্মিক পথে সহায়তা লাভ করিতে লাগিল।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদলের নেতা শ্রীযুত কেশব এখন হইতে দ্রুতপদে সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং ঠাকুরের কৃপায় তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন এখন হইতে সুগভীর হইয়া উঠিয়াছিল। হোম, অভিষেক, মুণ্ডন, কাষায়-ধারণাদি স্থূল ক্রিয়াসকলের সহায়ে মানব মন আধ্যাত্মিক রাজ্যের সূক্ষ্ম ও উচ্চ স্তরসমূহে আরোহণে সমর্থ হয়, একথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি ঐ সকলের স্বল্পবিস্তর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বুদ্ধ, শ্রীগৌরাঙ্গ, ঈশা, প্রভৃতি মহাপুরুষগণ জীবন্ত ভাবময় তনুতে নিত্য-বিদ্যমান এবং তাঁহাদের প্রত্যেকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে এক এক বিশেষ বিশেষ ভাব-প্রস্রবণ-স্বরূপে সতত অবস্থান করিতেছেন, একথা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগের ভাব যথাযথ উপলব্ধি করিবার জন্য তিনি কখন একের, কখন অন্যের ধ্যানে তন্ময় হইয়া কিয়ৎকাল যাপন করিয়াছিলেন। ঠাকুর সর্ব্বপ্রকার 'ভেক্' ধারণপূর্ব্বক সকল মতের সাধনা করিয়াছিলেন শুনিয়াই যে কেশবের পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তি হইয়াছিল, ইহা বলা বাহুল্য। ঐরূপে সাধনসমূহের স্বল্পবিস্তর অনুষ্ঠানপূর্ব্বক 'যত মত, তত পথ'-রূপ ঠাকুরের নবাবিষ্কৃত তত্ত্বের বিষয় শ্রীযুত কেশব যতদূর বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাই কুচবিহার-বিবাহের প্রায় দুই বৎসর পরে 'নববিধান' আখ্যা দিয়া জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। ঠাকুরকে তিনি উক্ত বিধানের ঘনীভূত মূর্ত্তি জানিয়া কতদূর শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন তাহা প্রকাশ করিতে আমরা অসমর্থ। আমাদিগের মধ্যে অনেকে দেখিয়াছে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তিনি 'জয় বিধানের জয়' 'জয় বিধানের জয়' একথা বারংবার

ঠাকুরের আবিষ্কৃত তত্ত্বের কিয়দংশ গ্রহণপূর্ব্বক কেশবের 'নববিধান' আখ্যা-প্রদান ও প্রচার

উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতেছেন। 'নব-বিধান'-প্রচারের প্রায় চারি বৎসর পরে তিনি ইহলোক হইতে প্রস্থান না করিলে, তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন ক্রমে কত সুগভীর হইত, তাহা কে বলিতে পারে?

ঠাকুর শ্রীযুত কেশবকে এতদূর পরমাত্মীয় জ্ঞান করিতেন যে, এক সময়ে তাঁহার অসুস্থতার কথা শুনিয়া তাঁহার আরোগ্যের নিমিত্ত শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকটে ডাব-চিনি মানত করিয়াছিলেন। পীড়িতাবস্থায় তাঁহাকে দেখিতে যাইয়া অতিশয় কৃশ দেখিয়া নয়নাশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই; পরে বলিয়াছিলেন, "বসরাই গোলাপের গাছে বড় ফুল হইবে বলিয়া মালী কখন কখন উহাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া উহার শিকড় পর্য্যন্ত মাটি হইতে বাহির করিয়া রোদ ও হিম খাওয়ায়। তোমার শরীরের এই অবস্থা মালী (ঈশ্বর) সেই জন্যই করিয়াছেন।" আবার তাঁহার শেষ পীড়ার অন্তে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁহার শরীর-রক্ষার কথা শুনিয়া অভিভূত হইয়া ঠাকুর তিন দিন কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা না কহিয়া শয়ন করিয়াছিলেন এবং পরে বলিয়াছিলেন, "কেশবের মৃত্যুর কথা শুনিয়া আমার বোধ হইল, যেন আমার একটা অঙ্গ পড়িয়া গিয়াছে।" শ্রীযুত কেশবের পরিবারবর্গের স্ত্রীপুরুষ সকলে ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি করিতেন এবং কখন কখন তাঁহাকে 'কমল কুটীরে' লইয়া যাইয়া এবং কখন বা দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শ্রীমুখ হইতে আধ্যাত্মিক উপদেশাবলী শ্রবণ করিতেন। মাঘোৎসবে তাঁহার সহিত ভগবদালাপ ও কীর্ত্তনাদিতে একদিন আনন্দ করা কেশবের

ঠাকুর কেশবকে কতদূর আপনার জ্ঞান করিতেন

জীবৎকালে নববিধান সমাজের অবশ্যকর্ত্তব্য অঙ্গবিশেষ হইয়া উঠিয়াছিল। ঐসময়ে শ্রীযুত কেশব কখন কখন জাহাজে করিয়া সদলবলে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইতেন এবং ঠাকুরকে উহাতে উঠাইয়া লইয়া ভাগীরথী-বক্ষে পরিভ্রমণ করিতে করিতে কীর্ত্তনাদি-আনন্দে মগ্ন হইতেন।

কুচবিহার-বিবাহ লইয়া বিচ্ছিন্ন হইবার পরে শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শিবনাথ শাস্ত্রী 'সাধারণ' সমাজের আচার্য্যপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুত বিজয় ইতিপূর্ব্বে সত্যপরায়ণতা এবং সাধনানুরাগের জন্য কেশবের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। আচার্য্য

ঠাকুরের প্রভাবে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মত-পরিবর্ত্তন ও ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ

কেশবের ন্যায় ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভের পরে বিজয়কৃষ্ণেরও সাধনানুরাগ বিশেষভাবে প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল। ঐ পথে অগ্রসর হইয়া স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁহার নানা নূতন আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষসকল উপস্থিত হইয়াছিল এবং ঈশ্বরের সাকার প্রকাশে তিনি বিশ্বাসবান হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পূর্ব্বে বিজয় যখন সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতে কলিকাতায় আগমন করেন, তখন দীর্ঘ শিখা, সূত্র এবং নানা কবচাদিতে তাঁহার অঙ্গ ভূষিত ছিল; সত্যের অনুরোধে বিজয় সেই সকল একদিনে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মদলে যোগদান করিয়াছিলেন। কুচবিহার-বিবাহের পরে সত্যের অনুরোধে তিনি নিজ গুরুতুল্য কেশবকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। আবার সেই সত্যের অনুরোধে তিনি এখন তাঁহার সাকার বিশ্বাস লুকাইয়া রাখিতে না পারিয়া ব্রাহ্মসমাজ হইতে আপনাকে পৃথক করিতে বাধ্য

হইয়াছিলেন। উহাতে তাঁহার বৃত্তিলোপ হওয়ায় কিছুকালের জন্য তাঁহাকে অর্থাভাবে বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি উহাতে কিছুমাত্র অবসন্ন হয়েন নাই। শ্রীযুত বিজয়, ঠাকুরের নিকট হইতে আধ্যাত্মিক সহায়তালাভের কথা এবং কখন কখন অদ্ভুতভাবে তাঁহার দর্শন পাইবার বিষয় অনেক সময় আমাদিগের নিকটে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে উপগুরু অথবা অন্য কোনভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, তাহা বলিতে পারি না। কারণ গয়াধামে আকাশগঙ্গার পাহাড়ে কোন সাধু কৃপা করিয়া নিজ যোগশক্তিসহায়ে তাঁহাকে সহসা সমাধিস্থ করিয়া দেন ও তাঁহার গুরুপদবী গ্রহণ করেন, একথাও আমরা তাঁহার নিকটে শ্রবণ করিয়াছিলাম। ঠাকুরের সম্বন্ধে কিন্তু তাঁহার যে অতি উচ্চ ধারণা ছিল তাহাতে সংশয় নাই এবং ঐ বিষয়ে তাঁহার স্বমুখ হইতে আমরা যে সকল কথা শুনিয়াছি, তাহা গ্রন্থের অন্যত্র প্রকাশ করিয়াছি।[১]

বিজয় অতঃপর সাধনায় কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন

ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক্ হইবার পরে বিজয়কৃষ্ণের আধ্যাত্মিক গভীরতা দিন দিন প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল। কীর্ত্তনকালে ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহার উদ্দাম নৃত্য ও ঘন ঘন সমাধি দেখিয়া লোকে মোহিত হইত। ঠাকুরের শ্রীমুখে আমরা তাঁহার উচ্চাবস্থার কথা এইরূপ শুনিয়াছি—"যে ঘরে প্রবেশ করিলে লোকের ঈশ্বরসাধনা পূর্ণত্ব লাভ করে তাহার পার্শ্বের ঘরে পৌঁছিয়া বিজয় দ্বার খুলিয়া দিবার নিমিত্ত করাঘাত করিতেছে!"—আধ্যাত্মিক গভীরতালাভের

১ গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ, ৫ম অধ্যায়, দেখ।

পরে শ্রীযুত বিজয় অনেক ব্যক্তিকে মন্ত্রশিষ্য করিয়াছিলেন এবং ঠাকুরের শরীররক্ষার প্রায় চৌদ্দবৎসর পরে ৺পুরীধামে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন।

কুচবিহার-বিবাহের পরে ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ ব্রাহ্মদলের মধ্যে বিশেষ মনান্তর লক্ষিত হইত। একদলের সহিত অন্য দলের কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। উভয় দলের সাধনানুরাগী ব্যক্তিগণ কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় সমভাবে দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন, একথার আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কেশব ও বিজয় উভয়েই একদিন এই সময়ে নিজ নিজ অন্তরঙ্গগণের সহিত সহসা ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

'শিব-রামের যুদ্ধ'-কথায় কেশব ও বিজয়ের মনোমালিন্য দূর হওয়া

একদল অন্যদলের আসিবার কথা না-জানাতেই অবশ্য ঐরূপ হইয়াছিল এবং পূর্ব্ব বিরোধ স্মরণ করিয়া উভয় দলের মধ্যে একটা সঙ্কোচের ভাব দৃষ্ট হইয়াছিল। কেশব এবং বিজয়ের মধ্যেও ঐ সঙ্কোচ বিদ্যমান দেখিয়া ঠাকুর সেদিন তাঁহাদিগের বিবাদভঞ্জন করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন—

"দেখ, ভগবান শিব এবং রামচন্দ্রের মধ্যে এক সময়ে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়া ভীষণ যুদ্ধের অবতারণা হইয়াছিল। শিবের গুরু রাম এবং রামের গুরু শিব—একথা প্রসিদ্ধ। সুতরাং যুদ্ধান্তে তাঁহাদিগের পরস্পরে মিলন হইতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু শিবের চেলা ভূত-প্রেতাদির সঙ্গে রামের চেলা বাঁদরগণের আর কখন মিল হইল না। ভূতে-বাঁদরে লড়াই সর্ব্বক্ষণ চলিতে লাগিল। (কেশব ও বিজয়কে সম্বোধন করিয়া) যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে,

তোমাদিগের পরস্পরে এখন আর মনোমালিন্য রাখা উচিত নহে, উহা ভূত ও বাঁদরগণের মধ্যেই থাকুক।"

তদবধি কেশব ও বিজয়ের মধ্যে পুনরায় কথাবার্ত্তা চলিয়াছিল।

শ্রীযুত বিজয় নিজ অভিনব আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষসকলের অনুরোধে সাধারণ সমাজ পরিত্যাগ করিলে উক্ত দলের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার উপর একান্ত বিশ্বাসবান ছিলেন, তাঁহারাও তাঁহার সহিত চলিয়া আসিলেন। সাধারণ সমাজ ঐ কারণে এইকালে বিশেষ ক্ষীণ হইয়াছিল। আচার্য্য শ্রীযুত শিবনাথ শাস্ত্রীই এখন ঐ দলের নেতা হইয়া সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন। শিবনাথ ইতিপূর্ব্বে অনেকবার ঠাকুরের নিকটে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। ঠাকুরও শিবনাথকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। কিন্তু বিজয় সমাজ ছাড়িবার পরে শিবনাথ বিষম সমস্যায় নিপতিত হইয়াছিলেন। ঠাকুরের উপদেশ-প্রভাবেই বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম্মভাব-পরিবর্ত্তন এবং পরিণামে সমাজ-পরিত্যাগ—এ কথা অনুধাবন করিয়া তিনি এক্ষণে ঠাকুরের নিকটে পূর্ব্বের ন্যায় যাওয়া-আসা রহিত করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ এই সময়ের কিছু পূর্ব্ব হইতে সাধারণ সমাজে যোগদান করিয়াছিলেন এবং শিবনাথপ্রমুখ ব্রাহ্মগণের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঐরূপে সাধারণ সমাজে যোগদান করিলেও কিন্তু স্বামিজী মধ্যে মধ্যে শ্রীযুত কেশবের এবং দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে গমনাগমন করিতেন। স্বামিজী বলিতেন, আচার্য্য শিবনাথকে তিনি এই সময়ে ঠাকুরের নিকটে না যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি

ঠাকুরের প্রভাবে ব্রাহ্মসঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া যাইবে বলিয়া আচার্য্য শিবনাথের দক্ষিণেশ্বর-গমনে বিরত হওয়া

বলিয়াছিলেন, দক্ষিণেশ্বরে তিনি ঘন ঘন গমন করিলে তাঁহার দেখাদেখি ব্রাহ্মসঙ্ঘের অন্য সকলেও ঐরূপ করিবে এবং পরিণামে উক্ত দল ভাঙ্গিয়া যাইবে। স্বামিজী বলিতেন, ঐরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীযুত শিবনাথ এই সময়ে তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে গমন করিতে বিরত হইবার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, ঠাকুরের ভাবসমাধি প্রভৃতি স্নায়ুদৌর্ব্বল্য হইতে উপস্থিত হইয়াছে!—অত্যধিক শারীরিক কঠোরতার অনুষ্ঠানে তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতি হইয়াছে! ঠাকুর ঐ কথা শুনিয়া শিবনাথকে যাহা বলিয়াছিলেন, আমরা তাহার অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি।[১]

ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুরের প্রভাব সম্বন্ধে আচার্য্য প্রতাপচন্দ্রের কথা

সে যাহা হউক, ঠাকুরের প্রভাবে ব্রাহ্মসঙ্ঘে যে সাধনানুরাগ প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার ফলে 'নববিধান' এবং 'সাধারণ' উভয় সমাজের ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ ঈশ্বরকে যাহাতে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, এরূপভাবে জীবনগঠনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আচার্য্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এক সময়ে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া ঠাকুরের সঙ্গলাভের পর, সমাজে আধ্যাত্মিক ভাব-পরিণতি কিরূপ ও কতদূর হইয়াছে তদ্বিষয়ে আমাদিগের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "ইঁহাকে দেখিবার আগে আমরা ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা কি বুঝিতাম?—কেবল গুণ্ডামি করিয়া বেড়াইতাম। ইঁহার দর্শনলাভের পরে বুঝিয়াছি যথার্থ ধর্ম্মজীবন কাহাকে বলে।" শ্রীযুত প্রতাপের সঙ্গে সেদিন আচার্য্য চিরঞ্জীব শর্ম্মা (ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল) উপস্থিত ছিলেন।

১ গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়, দেখ।

নববিধান-সমাজে ঠাকুরের প্রভাব বিশেষ পরিলক্ষিত হইলেও বিজয়কৃষ্ণ যতদিন আচার্য্য-পদবীতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ততদিন পর্য্যন্ত সাধারণ সমাজেও উহা স্বল্প দেখা যাইত না। বিজয়ের সহিত অনেকগুলি ধর্ম্মপিপাসুর পরিত্যাগের পর হইতেই উক্ত সমাজে ঐ প্রভাব হ্রাস হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহা আধ্যাত্মিকতা হারাইয়া সমাজসংস্কার, দেশ-হিতৈষণা প্রভৃতির অনুষ্ঠানেই আপনাকে প্রধানতঃ নিযুক্ত রাখিয়াছে। হ্রাস হইলেও উক্ত প্রভাব যে একেবারেই লুপ্ত হয় নাই, তাহার নিদর্শন সমাজস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও যোগাভ্যাসে, বেদান্ত-চর্চ্চায় এবং প্রেততত্ত্বাদির (Spiritualism) অনুশীলনে দেখিতে পাওয়া যায়। উচ্চাঙ্গের কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়ের বৈদিক মতের অনুশীলনও যে সাধারণ সমাজস্থ কোন কোন ব্যক্তি করিয়া থাকেন এবং ধ্যানাদিসহায়ে শারীরিক ব্যাধি-নিবারণের চেষ্টা করেন, এ বিষয়ও আমরা জ্ঞাত হইয়াছি। নববিধান-সমাজের আচার্য্য চিরঞ্জীব শর্ম্মা ব্রহ্মসঙ্গীতের বিশেষ পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, একথা বলিতে হইবে না। কিন্তু অনুসন্ধানে জ্ঞাত হওয়া যায়, ঠাকুরের নানাপ্রকার দর্শন, ভাব ও সমাধি প্রভৃতির সহিত পরিচিত হইয়াই তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠভাবোদ্দীপক পদগুলি রচনায় সমর্থ হইয়াছেন। ঐরূপ কয়েকটি পদের[১] প্রথম অংশ মাত্র আমরা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি—

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুরের প্রভাব

ব্রহ্মসঙ্গীতে ঠাকুরের প্রভাব

(১) নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি।

(২) গভীর সমাধি-সিন্ধু অনন্ত অপার।

১ নববিধান সমাজের সঙ্গীত-পুস্তকসকলে পাঠক পদগুলি দেখিতে পাইবেন।

(৩) চিদাকাশে হ'ল পূর্ণ প্রেম-চন্দ্রোদয় রে।

(৪) চিদানন্দ-সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।

(৫) আমায় দে মা পাগল ক'রে।

সুকবি আচার্য্য চিরঞ্জীব শর্ম্মা ঐরূপ পদসকল রচনা দ্বারা সমগ্র বঙ্গবাসীর এবং দেশের সাধককুলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু ঠাকুরের ভাবসমাধি দেখিয়াই যে তিনি ঐ সকল পদ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহাতেও সংশয় নাই। আচার্য্য চিরঞ্জীব সুকণ্ঠ ছিলেন। তাঁহার সঙ্গীতশ্রবণে আমরা ঠাকুরকে অনেক সময় সমাধিস্থ হইতে দেখিয়াছি।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরলাভের অন্যতম পথ বলিয়া ঠাকুরের ঘোষণা

ঐরূপে ব্রাহ্মসমাজ এইকালে ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। ঈশ্বরের নিরাকার স্বরূপের উপাসনা উক্ত সমাজে যেভাবে প্রচারিত হয়, তাহাকে ঠাকুর কখন কখন 'কাঁচা নিরাকার ভাব' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও[১] যথার্থ বিশ্বাসের সহিত ঐভাবে উপাসনা করিলে সাধক ঈশ্বরলাভে সমর্থ হয়েন—একথা তাঁহার মুখে আমরা বারংবার শ্রবণ করিয়াছি। কীর্ত্তনান্তে ঈশ্বর ও তাঁহার সকল সম্প্রদায়ের ভক্তগণকে প্রণাম করিবার কালে তিনি 'আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীদের প্রণাম' বলিয়া ব্রাহ্মমণ্ডলীকে প্রণাম করিতে কখনও ভুলিতেন না। উহাতেই বুঝা যায়, ভগবদিচ্ছায় ঈশ্বরলাভের জন্য জগতে প্রচারিত অন্য সকল মত বা পথের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মকেও তিনি এক পথ বলিয়া সত্য সত্য বিশ্বাস করিতেন। তবে পাশ্চাত্য ভাব হইতে বিমুক্ত

[১] গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ, ২য় অধ্যায়, দেখ।

হইয়া ব্রাহ্মমণ্ডলী যাহাতে যথার্থ আধ্যাত্মিক মার্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ও চেষ্টা ছিল ; এবং সমাজসংস্কারাদি কার্য্যসকল প্রশংসনীয় ও অবশ্য কর্ত্তব্য হইলেও ঐ সকল কার্য্য যাহাতে তাঁহাদিগের সমাজে মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া ঈশ্বরলাভের জন্য সাধনভজনাদি হেয় বলিয়া বিবেচিত না হয়, তদ্বিষয়ে তিনি তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে সতর্ক করিতেন। ব্রাহ্মসমাজই ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম অনুশীলন করিয়া কলিকাতার জনসাধারণের চিত্ত দক্ষিণেশ্বরে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে বসিয়া যাঁহারা আধ্যাত্মিক শক্তি ও শান্তিলাভে ধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকে ঐ বিষয়ের জন্য 'নববিধান' ও 'সাধারণ' উভয় ব্রাহ্মসমাজের নিকটেই চিরঋণে আবদ্ধ। বর্ত্তমান লেখক আবার তদুভয় সমাজের নিকট অধিকতর ঋণী। কারণ উচ্চাদর্শ সম্মুখে ধারণ করিয়া যৌবনের প্রারম্ভে আধ্যাত্মিকভাবে চরিত্রগঠনে তাহাকে ঐ সমাজদ্বয়ই সাহায্য করিয়াছিল। অতএব ব্রহ্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মমণ্ডলী বা সমাজরূপী ত্রি-রত্নকে স্বরূপতঃ এক জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাভরে আমরা পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি এবং ব্রাহ্মমণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়া ঠাকুরের আনন্দ করা সম্বন্ধে যে দুইটি বিশেষ চিত্র স্বচক্ষে দর্শন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম, তাহাই এক্ষণে পাঠককে উপহার দিতেছি।

প্রথম অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

মণিমোহন মল্লিকের বাটীতে ব্রাহ্মোৎসব

আমাদের বেশ মনে আছে, সেটা হেমন্তকাল; গ্রীষ্মসন্তপ্তা প্রকৃতি তখন বর্ষার স্নানসুখে পরিতৃপ্তা হইয়া শারদীয় অঙ্গরাগ ধারণপূর্ব্বক শীতের উন্মেষ অনুভব করিতেছিল এবং স্নিগ্ধ শীতল নিজাঙ্গে সযত্নে বসন টানিয়া দিতেছিল। হেমন্তের তিন ভাগ তখন অতীতপ্রায়। এই সময়ের একদিনের ঘটনা আমরা এখানে বিবৃত করিতেছি। ঠাকুরের পরমভক্ত, আমাদিগের জনৈক শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু[১] সেদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন; এবং তাঁহার প্রথামত পঞ্জিকাপার্শ্বে ঐ তারিখ চিহ্নিত করিয়া ঐকথা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে জানিয়াছি, ঘটনা সন ১২৯০ সালের ১১ই অগ্রহায়ণ, সোমবারে, ইংরাজী ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর তারিখে উপস্থিত হইয়াছিল।

ঘটনার সময়-নির্ণয়

তখন কলিকাতার 'সেণ্ট্ জেভিয়ার্স' কলেজে আমরা অধ্যয়ন করি এবং ইতিপূর্ব্বে দুই-তিন বার মাত্র দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পুণ্য-দর্শনলাভ করিয়াছি। কোন কারণে কলেজ বন্ধ থাকায় আমরা[২] ঐ দিবস অপরাহ্ণে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইব বলিয়া পরামর্শ স্থির করিয়াছিলাম। স্মরণ আছে নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার

১ বাগবাজারনিবাসী শ্রীযুত বলরাম বসু।

২ কুমিল্লানিবাসী শ্রীযুত বরদাসুন্দর পাল এবং চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত বেলঘরিয়ানিবাসী শ্রীযুত হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ)।

কালে আরোহীদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি আমাদিগের ন্যায় ঠাকুরের নিকট যাইতেছেন শুনিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া জানিলাম তাঁহার নাম বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল; আমাদিগের ন্যায় অল্পদিন ঠাকুরের দর্শনলাভে ধন্য হইয়াছেন। একথাও স্মরণ হয়, নৌকামধ্যে অন্য এক আরোহী আমাদের মুখে ঠাকুরের নাম শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি শ্লেষপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিলে বৈকুণ্ঠনাথ বিষম ঘৃণার সহিত তাহার কথার উত্তর দিয়া তাহাকে নিরুত্তর করেন। যখন গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হইলাম তখন বেলা ২টা বা ২৷৷টা হইবে।

বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালের সহিত পরিচয়

ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে প্রণাম করিবামাত্র তিনি বলিলেন, "তাইত, তোমরা আজ আসিলে; আর কিছুক্ষণ পরে আসিলে দেখা হইত না; আজ কলিকাতায় যাইতেছি, গাড়ি আনিতে গিয়াছে; সেখানে উৎসব, ব্রাহ্মদের উৎসব। যাহা হউক, দেখা যে হইল ইহাই ভাল, বস। দেখা না পাইয়া ফিরিয়া যাইলে মনে কষ্ট হইত।"

ঘরের মেজেতে একটি মাদুরে আমরা উপবেশন করিলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, আপনি যেখানে যাইতেছেন সেখানে আমরা যাইলে কি প্রবেশ করিতে দিবে না?" ঠাকুর বলিলেন, "তাহা কেন? ইচ্ছা হইলে তোমরা অনায়াসে যাইতে পার—সিঁদুরিয়াপটি মণিমল্লিকের বাটী।" একজন নাতিকৃশ গৌরবর্ণ রক্তবস্ত্র-পরিহিত যুবক ঐ সময় গৃহে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "ওরে, এদের মণিমল্লিকের বাটীর নম্বরটা

বাবুরামের সহিত প্রথম আলাপ

বলিয়া দে ত।" যুবক বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "৮১নং চিৎপুর রোড, সিঁদুরিয়াপটি।" যুবকের বিনীত স্বভাব ও সাত্ত্বিক প্রকৃতি দেখিয়া আমাদের মনে হইল তিনি ঠাকুরবাড়ীর কোন ভট্টাচার্য্যের পুত্র হইবেন। কিন্তু দুই-এক মাস পরে তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরীক্ষা দিয়া বাহির হইতে দেখিয়া আমরা তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া জানিলাম, আমাদের ধারণা ভুল হইয়াছিল। জানিয়াছিলাম, তাঁহার নাম বাবুরাম; বাটী তারকেশ্বরের নিকটে আঁটপুরে; কলিকাতায় কলুটোলায় বাসাবাড়ীতে আছেন; মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের নিকটে যাইয়া অবস্থান করেন। বলা বাহুল্য, ইনিই এক্ষণে স্বামী প্রেমানন্দ নামে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে সুপরিচিত।

অল্পক্ষণ পরেই গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ঠাকুর বাবুরামকে নিজ গামছা, মশলার বেটুয়া ও বস্ত্রাদি লইতে বলিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বাকে প্রণামপূর্ব্বক গাড়িতে আরোহণ করিলেন। বাবুরাম পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসকল লইয়া গাড়ীর অন্যদিকে উপবিষ্ট হইলেন। অন্য এক ব্যক্তিও সেদিন ঠাকুরের সঙ্গে কলিকাতায় গিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে জানিয়াছিলাম তাঁহার নাম প্রতাপচন্দ্র হাজরা।

ঠাকুর চলিয়া যাইবার পরেই আমরা সৌভাগ্যক্রমে একখানি গহনার নৌকা পাইয়া কলিকাতায় বড়বাজার ঘাটে উত্তীর্ণ হইলাম এবং উৎসব সন্ধ্যাকালে হইবে ভাবিয়া এক বন্ধুর বাসায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। নবপরিচিত বৈকুণ্ঠনাথ যথাকালে উৎসবস্থলে দেখা হইবে বলিয়া কার্য্যবিশেষ সম্পন্ন করিতে স্থানান্তরে চলিয়া যাইলেন।

প্রায় ৪টার সময় আমরা অন্বেষণ করিয়া মণিবাবুর বাটীতে

উপস্থিত হইলাম। ঠাকুরের আগমনের কথা জিজ্ঞাসা করায় একব্যক্তি আমাদিগকে উপরে বৈঠকখানায় যাইবার পথ দেখাইয়া দিল। আমরা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম ঘরখানি উৎসবার্থে পত্রপুষ্পে সজ্জিত হইয়াছে এবং কয়েকটি ভক্ত পরস্পর কথা কহিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম মধ্যাহ্নে উপাসনা ও সঙ্গীতাদি হইয়া গিয়াছে, সায়াহ্নে পুনরায় উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি হইবে এবং স্ত্রীভক্তদিগের অনুরোধে ঠাকুরকে কিছুক্ষণ হইল অন্দরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

উপাসনাদির বিলম্ব আছে শুনিয়া আমরা কিছুক্ষণের জন্য স্থানান্তরে গমন করিলাম। পরে সন্ধ্যা সমাগতা হইলে পুনরায় উৎসবস্থলে আগমন করিলাম। বাটীর সম্মুখের রাস্তায় পৌছিতেই মধুর সঙ্গীত ও মৃদঙ্গের রোল আমাদের কর্ণগোচর হইল। তখন কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে বুঝিয়া আমরা দ্রুতপদে বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলাম তাহা বলিবার নহে। ঘরের ভিতরে-বাহিরে লোকের ভিড় লাগিয়াছে। প্রত্যেক দ্বারের সম্মুখে এবং পশ্চিমের ছাদে এত লোক দাঁড়াইয়াছে যে, সেই ভিড় ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করা এককালে অসাধ্য। সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া গৃহমধ্যে ভক্তিপূর্ণ স্থিরনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে; পার্শ্বে কে আছে না আছে তাহার সংজ্ঞা-মাত্র নাই। সম্মুখের দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ অসম্ভব বুঝিয়া আমরা পশ্চিমের ছাদ দিয়া ঘুরিয়া বৈঠকখানার উত্তরের এক দ্বারপার্শ্বে উপস্থিত হইলাম। লোকের জনতা এখানে কিছু কম থাকায় কোনরূপে গৃহমধ্যে মাথা গলাইয়া দেখলাম—

মণিমল্লিকের বৈঠকখানায় অপূর্ব্ব কীর্ত্তন

অপূর্ব্ব দৃশ্য! গৃহের ভিতরে স্বর্গীয় আনন্দের বিশাল তরঙ্গ খরস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে; সকলে এককালে আত্মহারা হইয়া কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, উদ্দাম নৃত্য করিতেছে, ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে, বিহ্বল হইয়া উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করিতেছে; আর ঠাকুর সেই উন্মত্ত দলের মধ্যভাগে নৃত্য করিতে করিতে কখন দ্রুতপদে তালে তালে সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন, আবার কখন বা ঐরূপে পশ্চাতে হটিয়া আসিতেছেন এবং ঐরূপে যখন যেদিকে তিনি অগ্রসর হইতেছেন, সেই দিকের লোকেরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া তাঁহার অনায়াস গমনাগমনের জন্য স্থান ছাড়িয়া দিতেছে। তাঁহার হাস্যপূর্ণ আননে অদৃষ্টপূর্ব্ব দিব্যজ্যোতিঃ ক্রীড়া করিতেছে এবং প্রতি অঙ্গে অপূর্ব্ব কোমলতা ও মাধুর্য্যের সহিত সিংহের ন্যায় বলের যুগপৎ আবির্ভাব হইয়াছে। সে এক অপূর্ব্ব নৃত্য—তাহাতে আড়ম্বর নাই, লম্ফন নাই, কৃচ্ছসাধ্য অস্বাভাবিক অঙ্গবিকৃতি বা অঙ্গ-সংযম-রাহিত্য নাই; আছে কেবল আনন্দের অধীরতায় মাধুর্য্য ও উদ্যমের সম্মিলনে প্রতি অঙ্গের স্বাভাবিক সংস্থিতি ও গতিবিধি! নির্ম্মল সলিলরাশি প্রাপ্ত হইয়া মৎস্য যেমন কখন ধীরভাবে এবং কখন দ্রুত সন্তরণ দ্বারা চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করে, ঠাকুরের এই অপূর্ব্ব নৃত্যও যেন ঠিক তদ্রূপ। তিনি যেন আনন্দসাগর—ব্রহ্মস্বরূপে নিমগ্ন হইয়া নিজ অন্তরের ভাব বাহিরের অঙ্গসংস্থানে প্রকাশ করিতেছিলেন। ঐরূপে নৃত্য করিতে করিতে তিনি কখন বা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতেছিলেন; কখন বা তাঁহার পরিধেয় বসন স্খলিত হইয়া

ঠাকুরের অপূর্ব্ব নৃত্য

যাইতেছিল এবং অপরে উহা তাঁহার কটিতে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দিতেছিল; আবার কখন বা কাহাকেও ভাবাবেশে সংজ্ঞাশূন্য হইতে দেখিয়া তিনি তাহার বক্ষ স্পর্শ করিয়া তাহাকে পুনরায় সচেতন করিতেছিলেন। বোধ হইতেছিল যেন তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া এক দিব্যোজ্জ্বল আনন্দধারা চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হইয়া যথার্থ ভক্তকে ঈশ্বরদর্শনে, মৃদু-বৈরাগ্যবানকে তীব্র বৈরাগ্যলাভে, অলস মনকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে সোৎসাহে অগ্রসর হইতে সামর্থ্য প্রদান করিতেছিল এবং ঘোর বিষয়ীর মন হইতেও সংসারাসক্তিকে সেই ক্ষণের জন্য কোথায় বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার ভাবাবেশ অপরে সংক্রমিত হইয়া তাহাদিগকে ভাববিহ্বল করিয়া ফেলিতেছিল এবং তাঁহার পবিত্রতায় প্রদীপ্ত হইয়া তাহাদের মন যেন কোন এক উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে আরোহণ করিয়াছিল। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের ত কথাই নাই, অন্য ব্রাহ্ম-ভক্তসকলের অনেকেও সেদিন মধ্যে মধ্যে ভাবাবিষ্ট ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পতিত হইয়াছিলেন। আর সুকণ্ঠ আচার্য্য চিরঞ্জীব সেদিন একতারা-সহায়ে 'নাচ্‌রে আনন্দময়ীর ছেলে, তোরা ঘুরে ফিরে' —ইত্যাদি সঙ্গীতটি গাহিতে গাহিতে তন্ময় হইয়া যেন আপনাতে আপনি ডুবিয়া গিয়াছিলেন। ঐরূপে প্রায় দুই ঘণ্টারও অধিককাল কীর্ত্তনানন্দে অতিবাহিত হইলে, 'এমন মধুর হরিনাম জগতে আনিল কে'[১]—এই পদটি গীত হইয়া সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় ও

---

১ গীতটি আমাদের যতদূর মনে আছে নিম্নে প্রদান করিতেছি—

এমন মধুর হরিনাম জগতে আনিল কে।
এ নাম নিতাই এনেছে, না হয় গৌর এনেছে,
না হয় শান্তিপুরের অদ্বৈত সেই এনেছে।

ভক্তাচার্য্যদিগকে প্রণাম করিয়া সেই অপূর্ব্ব কীর্ত্তনের বেগ সেদিন শান্ত হইয়াছিল।

আমাদের স্মরণ আছে, কীর্ত্তনান্তে সকলে উপবিষ্ট হইলে ঠাকুর আচার্য্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে 'হরি রস মদিরা পিয়ে মম মানস মাত রে'[১]—এই সঙ্গীতটি গাহিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং তিনিও ভাবাবিষ্ট হইয়া উহা দুই-তিন বার মধুরভাবে গাহিয়া সকলকে আনন্দিত করিয়াছিলেন।

অনন্তর রূপরসাদি বিষয় হইতে মন উঠাইয়া লইয়া ঈশ্বরে অর্পণ করিতে পারিলেই জীবের পরম শান্তিলাভ হয়, এই প্রসঙ্গে ঠাকুর সম্মুখস্থ লোকদিগকে অনেক কথা কহিতে লাগিলেন। স্ত্রীভক্তেরাও তখন বৈঠকখানাগৃহের পূর্ব্বভাগে চিকের আড়ালে থাকিয়া তাঁহাকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে নানা প্রশ্ন করিয়া উত্তরলাভে আনন্দিতা হইতে লাগিলেন। ঐরূপে প্রশ্ন সমাধান করিতে করিতে ঠাকুর প্রসঙ্গোত্থিত বিষয়ের দৃঢ় ধারণা করাইয়া দিবার জন্য মা'র (শ্রীশ্রীজগদম্বার) নাম আরম্ভ করিলেন এবং একের পর অন্য করিয়া রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধক-ভক্তগণ-রচিত অনেক-

---

১ হরি রস মদিরা পিয়ে মম মানস মাতরে।
(একবার) লুটয় অবনীতল হরি হরি বলে কাঁদ রে।
(গতি কর কর বলে)
গভীর নিনাদে হরি, হরি নামে গগন ছাও রে।
নাচ হরি বলে দুবাহু তুলে হরিনাম বিলাও রে।
(লোকের দ্বারে দ্বারে)
হরি-প্রেমানন্দরসে, অনুদিন ভাস রে।
গাও হরিনাম, হও পূর্ণকাম,
(যত) নীচ বাসনা নাশ রে।
(প্রেমানন্দে মেতে)

গুলি সঙ্গীত গাহিতে থাকিলেন। উহাদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত গীত কয়েকটি যে তিনি গাহিয়াছিলেন ইহা আমাদের বেশ স্মরণ আছে—

(১) মজ্‌ল আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।

(২) শ্যামাপদ আকাশেতে মন-ঘুড়িখান উড়্‌তেছিল।

(৩) এ সব খ্যাপা মাগীর খেলা।

(৪) মন বেচারীর কি দোষ আছে।
তারে কেন দোষী কর মিছে॥

(৫) আমি ঐ খেদে খেদ করি।
তুমি মাতা থাক্‌তে আমার জাগা ঘরে চুরি॥

বিজয় গোস্বামীর সহিত ঠাকুরের রহস্যালাপ

ঠাকুর যখন ঐরূপে মা'র নাম করিতেছিলেন তখন গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ গৃহান্তরে যাইয়া কতকগুলি ভক্তের নিকটে তুলসীদাসী রামায়ণের পাঠ ও ব্যাখ্যায় নিযুক্ত ছিলেন। সায়াহ্ন-উপাসনার সময় উপস্থিতপ্রায় দেখিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উক্ত কার্য্য আরম্ভ করিবেন বলিয়া তিনি এখন পুনরায় বৈঠকখানাগৃহে উপস্থিত হইলেন। বিজয়কে দেখিয়াই ঠাকুর বালকের ন্যায় রঙ্গ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বিজয়ের আজকাল সঙ্কীর্ত্তনে বিশেষ আনন্দ। কিন্তু সে যখন নাচে তখন আমার ভয় হয় পাছে ছাদ শুদ্ধ উলে যায়! (সকলের হাস্য)। হাঁগো, ঐরূপ একটি ঘটনা আমাদের দেশে সত্য সত্য হয়েছিল। সেখানে কাঠমাটি দিয়েই লোকে দোতলা করে। এক গোস্বামী শিষ্যবাড়ী উপস্থিত হয়ে ঐরূপ দোতলায় কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। কীর্ত্তন জম্‌তেই নাচ

আরম্ভ হল। এখন, গোস্বামী ছিলেন (বিজয়কে সম্বোধন করিয়া) তোমারই মতন একটু হৃষ্টপুষ্ট। কিছুক্ষণ নাচবার পরেই ছাদ ভেঙ্গে তিনি একেবারে একতলায় হাজির! তাই ভয় হয়, পাছে তোমার নাচে সেইরূপ হয়।” (সকলের হাস্য)। ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণের গেরুয়া বস্ত্র-ধারণ লক্ষ্য করিয়া এইবার বলিতে লাগিলেন, “আজকাল এঁর (বিজয়ের) গেরুয়ার উপরেও খুব অনুরাগ। লোকে কেবল কাপড়চাদর গেরুয়া করে। বিজয় কাপড়, চাদর, জামা, মায় জুতা জোড়াটা পর্য্যন্ত গেরুয়ায় রঙ্গিয়েছে। তা ভাল, একটা অবস্থা হয় যখন ঐরূপ করতে ইচ্ছা হয়—গেরুয়া ছাড়া অন্য কিছু পড়তে ইচ্ছা হয় না। গেরুয়া ত্যাগের চিহ্ন কিনা, তাই গেরুয়া সাধককে স্মরণ করিয়ে দেয়, সে ঈশ্বরের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগে ব্রতী হয়েছে।” গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ এইবার ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন এবং ঠাকুর তাঁহাকে প্রসন্নমনে আশীর্ব্বাদ করিলেন, “ওঁ শান্তি, শান্তি, প্রশান্তি হউক তোমার।”

ঠাকুর যখন মা’র নাম করিতেছিলেন, তখন আর একটি ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। উহাতে বুঝিতে পারা যায়, অন্তর্মুখে সর্ব্বদা অবস্থান করিলেও তাঁহার বহির্বিষয় লক্ষ্য করিবার শক্তি কতদূর তীক্ষ্ণ ছিল। গান গাহিতে গাহিতে বাবুরামের মুখের প্রতি দেখিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, সে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়াছে। তাঁহার অগ্রে সে কখনই ভোজন করিবে না একথা জানিয়া তিনি খাইবেন বলিয়া কতকগুলি সন্দেশ ও এক গেলাস জল আনয়ন করাইয়াছিলেন এবং উহার কণামাত্র স্বয়ং গ্রহণপূর্ব্বক অধিকাংশ শ্রীযুত বাবুরামকে প্রদান

ঠাকুরের ভক্তের প্রতি ভালবাসা

করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট উপস্থিত ভক্তসকলে প্রসাদরূপে গ্রহণ করিয়াছিল।

বিজয় প্রণাম করিয়া সায়াহ্নের উপাসনা করিতে নিম্নে আসিবার কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরকে আহার করিতে অন্দরে লইয়া যাওয়া হইল। তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। আমরা ঐ অবকাশে শ্রীযুত বিজয়ের উপাসনায় যোগদান করিবার জন্য নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম উঠানেই একত্রে উপাসনার অধিবেশন হইয়াছে এবং উহার উত্তরপার্শ্বের দালানে বেদিকার উপরে বসিয়া আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মভক্তসকলের সহিত সমস্বরে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের মহিমা স্মরণপূর্ব্বক উপাসনা আরম্ভ করিতেছেন। উপাসনাকার্য্য ঐরূপে কিছুক্ষণ চলিবার পরেই ঠাকুর সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং অন্যসকলের সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়া উহাতে যোগদান করিলেন। প্রায় দশ-পনর মিনিট তিনি স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। পরে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। অনন্তর রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে বলিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবার জন্য গাড়ি আনয়ন করিতে বলিলেন। পরে হিম লাগিবার ভয়ে মোজা, জামা ও কানঢাকা টুপি ধারণ করিয়া তিনি বাবুরাম প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া ধীরে ধীরে সভাস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক গাড়িতে আরোহণ করিলেন। ঐ সময়ে আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ বেদী হইতে ব্রাহ্মসঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া যথারীতি উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। উক্ত অবকাশে সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া আমরাও গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

ঐরূপে ব্রাহ্মভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া ঠাকুর যেভাবে

আনন্দ করিতেন তাহার পরিচয় আমরা এই দিবসে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। মণিবাবু আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন কি না তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার পরিবারস্থ স্ত্রী-পুরুষ সকলেই যে তৎকালে ব্রাহ্মমতাবলম্বী ছিলেন এবং উক্ত সমাজের পদ্ধতি অনুসারে দৈনিক উপাসনাদি সম্পন্ন করিতেন, ইহা আমরা সবিশেষ অবগত আছি। ইঁহারই পরিবারস্থ একজন রমণী উপাসনাকালে মন স্থির করিতে পারেন না জানিতে পারিয়া ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কাহার কথা ঐ কালে মনে উদিত হয় বল দেখি?" রমণী অল্পবয়স্ক নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রকে লালনপালন করিতেছেন এবং তাহারই কথা তাঁহার অন্তরে সর্ব্বদা উদিত হয় জানিতে পারিয়া ঠাকুর তাঁহাকে ঐ বালককেই বাল-শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি জানিয়া সেবা করিতে বলিয়াছিলেন। রমণী ঠাকুরের ঐরূপ উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে করিতে কিছু-কালের মধ্যেই ভাবসমাধিস্থা হইয়াছিলেন। একথা আমরা 'লীলাপ্রসঙ্গের' অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি।[১] সে যাহা হউক, ঠাকুরকে আমরা অন্য এক দিবস কয়েকজন ব্রাহ্মভক্তকে লইয়া অন্যত্র আনন্দ করিতে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলাম। সেই চিত্রই এখন পাঠকের সম্মুখে ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইব।

মণি মল্লিকের ভক্ত-পরিবার

[১] গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—১ম অধ্যায়, দেখ।

প্রথম অধ্যায়—তৃতীয় পাদ

জয়গোপাল সেনের বাটীতে ঠাকুর

সিঁদুরিয়াপটির মণিমোহনের বাটীতে ঠাকুরের কীর্ত্তনানন্দ ও ভাবাবেশ দেখিয়া আমরাই যে কেবল আধ্যাত্মিক রাজ্যে অদৃষ্টপূর্ব্ব নূতন আলোক দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম তাহা নহে, বন্ধুবর বরদা-সুন্দরও ঐরূপ অনুভব করিয়াছিলেন এবং আবার কবে কোথায় আসিয়া ঠাকুর ঐরূপে আনন্দ করিবেন, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ঐরূপ চেষ্টা ফলবতী হইতে বিলম্ব হয় নাই। কারণ উহার দুই দিবস পরে ১৩ই অগ্রহায়ণ, ইংরাজী ২৮শে নভেম্বর, বুধবার প্রাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি বলিলেন, "আজ অপরাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কমল-কুটীরে কেশব বাবুকে দেখিতে আসিবেন এবং পরে সন্ধ্যাকালে মাথাঘসা পল্লীর জয়গোপাল সেনের বাটীতে আগমন করিবেন, দেখিতে যাইবে কি?" শ্রীযুত কেশব তখন বিশেষ অসুস্থ, এ কথা আমাদিগের জানা ছিল। সুতরাং আমাদিগের ন্যায় অপরিচিত ব্যক্তি কমলকুটীরে গমন করিলে বিরক্তির কারণ হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া আমরা সন্ধ্যায় শ্রীযুত জয়গোপালের বাটীতেই ঠাকুরকে দেখিতে যাইবার কথা স্থির করিলাম।

মাথাঘসা পল্লী বড়বাজারের কোন অংশের নাম হইবে ভাবিয়া আমরা সেখানেই প্রথমে উপস্থিত হইলাম এবং জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া ক্রমে শ্রীযুত জয়গোপালের ভবনে পৌঁছিলাম।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। মণিমোহনের বাটীতে উৎসবের দিনের ন্যায় আজও বৈকালে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। কারণ বেশ মনে আছে, রাস্তায় কাদা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়াছিলাম। এ কথাও স্মরণ হয় যে, মণিমোহনের বাটীর ন্যায় জয়গোপাল বাবুর ভবনও পশ্চিমদ্বারী ছিল এবং পূর্ব্বমুখী হইয়া আমরা উক্ত বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলাম। প্রবেশ করিয়াই এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া আমরা ঠাকুর আসিয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম এবং তিনিও তাহাতে আমাদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়া দক্ষিণের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া পূর্ব্বের উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত প্রশস্ত বৈঠকখানায় যাইতে বলিয়াছিলেন। দ্বিতলে উক্ত ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ঘরখানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সজ্জিত; বসিবার জন্য মেজেতে ঢালাও বিছানা বিস্তৃত রহিয়াছে এবং উহারই একাংশে ঠাকুর কয়েকজন ব্রাহ্ম ভক্ত-পরিবৃত হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। নববিধান সমাজের আচার্য্যদ্বয় শ্রীযুত চিরঞ্জীব শর্ম্মা ও শ্রীযুত অমৃতলাল বসু যে তাঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন, এ কথা স্মরণ হয়। তদ্ভিন্ন গৃহস্বামী শ্রীযুত জয়গোপাল ও তাঁহার ভ্রাতা, পল্লীবাসী তাঁহার বন্ধু দুই-তিন জন এবং ঠাকুরের সহিত সমাগত তাঁহার দুই-একটি ভক্তও তথায় উপস্থিত ছিলেন। মনে হয়, 'হুটকো' বলিয়া ঠাকুর যাহাকে নির্দ্দেশ করিতেন সেই 'ছোটগোপাল' নামক যুবক ভক্তটিকেও সে দিন তথায় দেখিতে পাইয়াছিলাম। ঐরূপে দশ-বারোজন মাত্র ব্যক্তিকে ঠাকুরের নিকটে সে দিন উপস্থিত থাকিতে দেখিয়া আমরা বুঝিয়াছিলাম,

জয়গোপাল সেনের বাটী

অদ্যকার সম্মিলন সাধারণের জন্য নহে এবং এখানে আমাদিগের এইরূপে আসাটা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। সেজন্য সকলকে আহার করিতে ডাকিবার কিছু পূর্ব্বে আমরা এখান হইতে সরিয়া পড়িব, এইরূপ পরামর্শ যে আমরা স্থির করিয়াছিলাম, একথা স্মরণ হয়।

গৃহে প্রবেশ করিয়াই আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে প্রণাম করিলাম এবং "তোমরা এখানে কেমন করিয়া আসিলে"—তাঁহার এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম, "সংবাদ পাইয়াছিলাম আপনি আজ এখানে আসিবেন, তাই আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি।" তিনি ঐরূপ উত্তরশ্রবণে প্রসন্ন হইলেন বলিয়া বোধ হইল এবং আমাদিগকে বসিতে বলিলেন। তখন নিশ্চিন্তমনে উপবিষ্ট হইয়া আমরা সকলকে লক্ষ্য করিতে এবং তাঁহার উপদেশ-গর্ভ কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলাম।

ঠাকুরের পুণ্যদর্শন ইতিপূর্ব্বে অল্পকালমাত্র লাভ করিলেও তাঁহার অমৃতময়ী বাণীর অপূর্ব্ব আকর্ষণ আমরা প্রথম দিন হইতেই উপলব্ধি করিয়াছিলাম। উহার কারণ তখন হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও এখন বুঝিতে পারি, তাঁহার উপদেশ দিবার প্রণালী কতদূর স্বতন্ত্র ছিল। উহাতে আড়ম্বর ছিল না, তর্কযুক্তির ছটা, অথবা বাছা বাছা বাক্য-বিন্যাস ছিল না, স্বল্পভাবকে ভাষার সাহায্যে ফেনাইয়া অধিক দেখাইবার প্রয়াস ছিল না, কিংবা দার্শনিক সূত্রকারদিগের ন্যায় স্বল্পাক্ষরে যতদূর সাধ্য অধিক ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টাও ছিল না। ভাবময় ঠাকুর ভাষার দিকে আদৌ লক্ষ্য রাখিতেন কি না বলিতে

ঠাকুরের উপদেশ দিবার প্রণালী

পারি না, তবে যিনি তাঁহার কথা একদিনও শুনিয়াছেন, তিনিই লক্ষ্য করিয়াছেন অন্তরের ভাব শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে প্রবেশ করাইবার জন্য তিনি কিরূপে তাঁহাদিগের জীবনে নিত্য পরিচিত পদার্থ ও ঘটনাসকলকে উপমাস্বরূপে অবলম্বন করিয়া চিত্রের পর চিত্র আনিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে ধারণ করিতেন। শ্রোতৃবর্গও উহাতে তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা যেন তাহাদিগের চক্ষের সমক্ষে অভিনীত প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার কথার সত্যতায় এককালে নিঃসন্দেহ ও পরিতৃপ্ত হইয়া যাইত। ঐ সকল চিত্র তাঁহার মনে তখনি তখনি কিরূপে উদিত হইত, এই বিষয় অনুধাবন করিতে যাইয়া আমরা তাঁহার অপূর্ব্ব স্মৃতিকে, অদ্ভুত মেধাকে, তীক্ষ্ণ দর্শনশক্তিকে অথবা অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রত্যুৎপন্নমতিত্বকে কারণস্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। ঠাকুর কিন্তু একমাত্র মা-র (শ্রীশ্রীজগদম্বার) কৃপাকেই উহার কারণ বলিয়া সর্ব্বদা নির্দ্দেশ করিতেন; বলিতেন, "মা-র উপরে যে একান্ত নির্ভর করে, মা তাহার অন্তরে বসিয়া যাহা বলিতে হইবে, তাহা অভ্রান্ত ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলাইয়া থাকেন; এবং স্বয়ং তিনি (শ্রীশ্রীজগদম্বা) ঐরূপ করেন বলিয়াই তাহার জ্ঞানভাণ্ডার কখনও শূন্য হইয়া যায় না। মা তাহার অন্তরে জ্ঞানের রাশি ঠেলিয়া দিয়া সর্ব্বদা পূর্ণ করিয়া রাখেন; সে যতই কেন ব্যয় করুক না, উহা কখনও শূন্য হইয়া যায় না।" ঐ বিষয়টি বুঝাইতে যাইয়া তিনি একদিন নিম্নলিখিত ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছিলেন—

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর উত্তর পার্শ্বেই ইংরেজ-রাজের বারুদ-গুদাম বিদ্যমান আছে। কতকগুলি সিপাহী তথায় নিয়ত পাহারা দিবার জন্য থাকে। উহারা সকলে ঠাকুরকে নিরতিশয় ভক্তি করিত

এবং কখন কখন তাঁহাকে তাহাদিগের বাসায় লইয়া যাইয়া ধর্ম্ম-বিষয়ক নানা প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লইত। ঠাকুর বলিতেন, "একদিন তাহারা প্রশ্ন করিল, 'সংসারে মানব কিভাবে থাকিলে তাহার ধর্ম্মলাভ হইবে?' অমনি দেখিতেছি কি, কোথা হইতে সহসা একটি ঢেঁকির চিত্র সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত! ঢেঁকিতে শস্য কুটা হইতেছে এবং একজন সন্তর্পণে উহার গড়ে শস্যগুলি ঠেলিয়া দিতেছে। দেখিয়াই বুঝিলাম, মা বুঝাইয়া দিতেছেন, ঐরূপে সতর্কভাবে সংসারে থাকিতে হইবে। ঢেঁকির গড়ের সম্মুখে বসিয়া যে শস্য ঠেলিয়া দিতেছে, তাহার যেমন সর্ব্বদা দৃষ্টি আছে, যাহাতে তাহার হাতের উপর ঢেঁকির মুষলটি না পড়ে, সেইরূপ সংসারের প্রত্যেক কাজ করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে, ইহা আমার সংসার বা আমার কাজ নহে, তবেই বন্ধনে পড়িয়া আহত ও বিনষ্ট হইবে না। ঢেঁকির ছবি দেখিবামাত্র, মা মনে ঐ কথার উদয় করিয়া দিলেন এবং উহাই তাহাদিগকে বলিলাম। তাহারাও উহা শুনিয়া পরম পরিতুষ্ট হইল। লোকের সহিত কথা বলিবার কালে ঐরূপ ছবিসকল সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়।"

তাঁহার উপদেশ-প্রণালীর অন্য বিশেষত্ব

ঠাকুরের উপদেশ দিবার প্রণালীতে অন্য বিশেষত্ব যাহা লক্ষিত হইত, তাহা ইহাই—তিনি বাজে বকিয়া কখনও শ্রোতার মন গুলাইয়া দিতেন না। জিজ্ঞাসু ব্যক্তির প্রশ্নের বিষয় ও উদ্দেশ্য ধরিয়া কয়েকটি সিদ্ধান্ত-বাক্যে উহার উত্তর প্রদান করিতেন এবং উহা তাহার হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য পূর্ব্বোক্তভাবে উপমাস্বরূপে চিত্রসকল তাহার সম্মুখে ধারণ করিতেন। উপদেশ-প্রণালীর এই

বিশেষত্বকে আমরা সিদ্ধান্ত-বাক্যের প্রয়োগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি, কারণ প্রশ্নোক্ত বিষয়সম্বন্ধে তিনি যাহা মনে জ্ঞানে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই কেবলমাত্র বলিতেন এবং ঐ বিষয়ের অপর কোনরূপ মীমাংসা যে হইতে পারে না, এ কথা তিনি মুখে না বলিলেও তাঁহার অসঙ্কোচ বিশ্বাসে উহা শ্রোতার মনে দৃঢ় মুদ্রিত হইয়া যাইত। পূর্ব্ব শিক্ষা ও সংস্কারবশতঃ যদি কোন শ্রোতা তাঁহার সাধনালব্ধ মীমাংসাগুলি গ্রহণ না করিয়া বিরুদ্ধ তর্কযুক্তির অবতারণা করিত, তাহা হইলে অনেকস্থলে তিনি "আমি যাহা হয় বলিয়া যাইলাম, তোমরা উহার ল্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়া নাও না" বলিয়া নিরস্ত হইতেন। ঐরূপে কখনও তিনি শ্রোতার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপপূর্ব্বক তাহার ভাবভঙ্গে উদ্যত হইতেন না। ভগবদিচ্ছায় শ্রোতা উন্নত অবস্থান্তরে যতদিন না পৌঁছিতেছে, ততদিন প্রশ্নোক্ত বিষয়ের যথার্থ সমাধান তাঁহার দ্বারা হইতে পারে না, ইহা ভাবিয়াই কি তিনি নিবৃত্ত হইতেন ?—বোধ হয়।

আবার, তাঁহার সিদ্ধান্ত-বাক্যসকল হৃদয়ঙ্গম করাইতে ঠাকুর পূর্ব্বোক্তভাবে কেবলমাত্র উপমা ও চিত্রসকলের উত্থাপন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না, কিন্তু প্রশ্নোক্ত বিষয়ের তিনি যে মীমাংসা প্রদান করিতেছেন, অন্যান্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাধকেরাও তৎসম্বন্ধে ঐরূপ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, এ কথা তাঁহাদের রচিত সঙ্গীতাদি গাহিয়া এবং কখন কখন শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্তসকল শ্রোতাকে শুনাইয়া দিতেন। বলা বাহুল্য, উহাতে উক্ত মীমাংসা সম্বন্ধে তাহার মনে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিত না এবং উহার দৃঢ় ধারণাপূর্ব্বক সে তদনুসারে নিজ জীবন পরিচালিত করিতে প্রবৃত্ত হইত।

উপলব্ধি-রহিত বাক্যচ্ছটায় ঠাকুরের বিরক্তি

আর একটি কথাও এখানে বলা প্রয়োজন। ভক্তি ও জ্ঞান উভয় মার্গের চরমেই সাধক উপাস্যের সহিত নিজ অভেদত্ব উপলব্ধি করিয়া অদ্বৈতবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়, এ কথা ঠাকুর বারংবার আমাদিগকে বলিয়া গিয়াছেন। "শুদ্ধ জ্ঞান এক (পদার্থ)", "সেখানে (চরম অবস্থায়) সব শিয়ালের এক রা (একই প্রকারের উপলব্ধির কথা বলা)"—ইত্যাদি তাঁহার উক্তিসকল ঐ বিষয়ে প্রমাণস্বরূপে উপস্থাপিত হইতে পারে। ঐরূপে অদ্বৈতবিজ্ঞানকে চরম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও তিনি রূপরসাদি বিষয়ভোগে নিরন্তর ব্যস্ত সংসারী মানব-সাধারণকে বিশিষ্টাদ্বৈত-তত্ত্বের কথাই সর্ব্বদা উপদেশ করিতেন এবং কখন কখন দ্বৈতভাবে ঈশ্বরে ভক্তি করিবার কথাও বলিতে ছাড়িতেন না। ভিতরে ঈশ্বরে তাদৃশ অনুরাগ এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থাসকলের উপলব্ধি নাই, অথচ মুখে অদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈতের উচ্চ উচ্চ কথাসকল উচ্চারণ করিয়া তর্কবিতর্ক করিতেছে, এরূপ ব্যক্তিকে দেখিলে তাঁহার বিষম বিরক্তি উপস্থিত হইত এবং কখন কখন অতি কঠোর বাক্যে তাহাদিগের ঐরূপ কার্য্যকে নিন্দা করিতে তিনি সঙ্কুচিত হইতেন না। আমাদিগের বন্ধু বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালকে তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "পঞ্চদশী-টশী পড়েছ ?" বৈকুণ্ঠ তাহাতে উত্তর করেন, "সে কার নাম, মহাশয়, আমি জানি না।" শুনিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন, "বাঁচলুম, কতকগুলো জ্যাঠা ছেলে ঐ সব পড়ে আসে; কিছু করবে না, অথচ আমার হাড় জালায়।"

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিবার প্রয়োজন, অদ্য শ্রীযুত জয়গোপালের

বাটীতে ঠাকুরকে এক ব্যক্তি 'সংসারে আমরা কিরূপে থাকিলে ঈশ্বর-কৃপার অধিকারী হইতে পারিব'—এইরূপ প্রশ্নবিশেষ করিয়াছিলেন। তিনি উহাতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর মত তাহাকে উপদেশ করিয়াছিলেন এবং তিন-চারিটি শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত মধ্যে মধ্যে গাহিয়া ঐ কথার উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। ঠাকুরের কথার সারসংক্ষেপ আমরা নিম্নে প্রদান করিতেছি।

সংসারে থাকিয়া ঈশ্বর-সাধনা সম্বন্ধে ঠাকুরের উপদেশ

মানব যতদিন সংসারটাকে 'আমার' বলিয়া দেখিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে, ততদিন উহাকে অনিত্য বলিয়া বোধ করিলেও সে উহাতে আবদ্ধ হইয়া কষ্ট ভোগ করিতে থাকে এবং ইচ্ছা করিলেও উহা হইতে নিষ্কৃতির পথ দেখিতে পায় না। ঐরূপ বলিয়াই ঠাকুর গাহিয়াছিলেন, "এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে; ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য, জীবে কি তা জান্‌তে পারে" ইত্যাদি। অতএব এই অনিত্য সংসারকে ভগবানের সহিত যোগ করিয়া লইয়া প্রত্যেক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে—এক হাতে তাঁহার পাদপদ্ম ধরিয়া থাকিয়া অপর হাতে কাজ করিয়া যাইবে এবং সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, সংসারের সকল বস্তু ও ব্যক্তি তাঁহার (ঈশ্বরের), আমার নহে। ঐরূপ করিলে মায়া-মমতাদিতে কষ্ট পাইতে হইবে না এবং যাহা কিছু করিতেছি, তাঁহার কর্ম্মই করিতেছি, এইরূপ ধারণার উদয় হইয়া মন তাঁহার দিকেই অগ্রসর হইবে। পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বুঝাইতে ঠাকুর গাহিলেন, "মন রে, কৃষিকাজ জান না" ইত্যাদি। গীত সাঙ্গ হইলে আবার বলিতে লাগিলেন, "ঐরূপে ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া সংসার করিলে ক্রমে

ধারণা হইবে, সংসারের সকল বস্তু ও ব্যক্তি তাঁহারই (ঈশ্বরের) অংশ। তখন সাধক পিতা-মাতাকে ঈশ্বর-ঈশ্বরীজ্ঞানে সেবা করিবে, পুত্র-কন্যার ভিতর বালগোপাল ও শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রকাশ দেখিবে, অপর সকলকে নারায়ণের অংশ জ্ঞান করিয়া শ্রদ্ধাভক্তির সহিত ব্যবহার করিবে। ঐরূপ ভাব লইয়া যিনি সংসার করেন তিনিই আদর্শ-সংসারী এবং তাঁহার মন হইতে মৃত্যুভয় এককালে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ঐরূপ ব্যক্তি বিরল হইলেও একেবারে যে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা নহে।" পরে ঐরূপ আদর্শে উপনীত হইবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া ঠাকুর বলিলেন, "বিবেক-বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয় এবং মাঝে মাঝে সংসারের কোলাহল হইতে দূরে যাইয়া সংযতচিত্তে সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হয়; তবেই মানব পূর্ব্বোক্ত আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে পারে।"[১] ঐরূপে উপায় নির্দ্দেশ করিয়া ঠাকুর নিম্নলিখিত রামপ্রসাদী গীতটি গাহিয়াছিলেন, "আয় মন বেড়াতে যাবি, কালীকল্পতরুমূলে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।' আবার, 'বিবেক-বুদ্ধি' কথাটি প্রয়োগ করিয়াই ঠাকুর উহা কাহাকে বলে, সে কথা বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন যে, ঐরূপ বুদ্ধির সহায়ে সাধক ঈশ্বরকে নিত্য ও সারবস্তু বলিয়া গ্রহণ করে এবং রূপরসাদির সমষ্টিভূত জগৎকে অনিত্য ও অসার জানিয়া পরিত্যাগ করে। ঐরূপে নিত্য বস্তু ঈশ্বরকে জানিবার পরে কিন্তু ঐ বুদ্ধিই তাহাকে বুঝাইয়া দেয় যে, যিনি নিত্য তিনিই

---

১ ঠাকুরের অদ্যকার কথার সারসংক্ষেপের কিয়দংশের জন্য আমরা শ্রদ্ধাস্পদ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-কারের নিকট ঋণী রহিলাম।

লীলায় জীব ও জগৎ-রূপ নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন এবং ঐরূপ বুঝিয়াই সাধক চরমে ঈশ্বরকে নিত্য ও লীলাময় উভয় ভাবে দেখিতে সমর্থ হয়।

অনন্তর আচার্য্য চিরঞ্জীব একতারা-সহায়ে "আমায় দে মা পাগল করে" সঙ্গীতটি গাহিতে লাগিলেন এবং সকলে তাঁহার অনুসারী হইয়া উহার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ঐরূপে কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তখন অন্য সকলেও ঠাকুরকে ঘিরিয়া দণ্ডায়মান হইয়া কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে ঐ গানটি সাঙ্গ করিয়া শ্রীযুত চিরঞ্জীব "চিদাকাশে হ'ল পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় রে" গানটি আরম্ভ করিলেন এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উক্ত গীতটি গাহিতে গাহিতে নৃত্য করিবার পরে ঈশ্বর ও তাঁহার ভক্তবৃন্দকে প্রণাম করিয়া সেদিনকার কীর্ত্তন শান্ত হইল ও সকলে ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। এই দিনেও ঠাকুর মধুরভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীযুত মণিমোহনের বাটীতে তাঁহার যেরূপ বহুকালব্যাপী গভীর ভাবাবেশ দেখিয়াছিলাম, অদ্য এখানে ততটা হয় নাই। কীর্ত্তনান্তে উপবেশন করিয়া ঠাকুর শ্রীযুত চিরঞ্জীবকে বলিয়াছিলেন, "তোমার এই গানটি ('চিদাকাশে হ'ল ইত্যাদি)[১] যখন প্রথম শুনিয়াছিলাম, তখন কেহ উহা গাহিবামাত্র

কীর্ত্তনানন্দ

---

১ চিদাকাশে হ'ল পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় রে।
(জয় দয়াময়! জয় দয়াময়! জয় দয়াময়!)
উথলিল প্রেমসিন্ধু, কি আনন্দময়।
(আহা) চারিদিকে ঝলমল, করে ভক্ত-গ্রহদল,
ভক্তসঙ্গে ভক্তসখা লীলারসময়। (হরি)

(ভাবাবিষ্ট হইয়া) দেখিতাম, এত বড় জীবন্ত পূর্ণিমার চাঁদের উদয় হইতেছে।”

অনন্তর শ্রীযুত কেশবের ব্যাধি সম্বন্ধে শ্রীযুত জয়গোপাল ও চিরঞ্জীবের মধ্যে পরস্পর কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। আমাদের স্মরণ আছে, শ্রীযুত রাখালের[১] শরীর সম্প্রতি খারাপ হইয়াছে, এই কথা ঠাকুর এই সময়ে এক ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন। শ্রীযুত জয়গোপাল আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন কি না বলিতে পারি না, কিন্তু ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্রকে যে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন এবং ব্রাহ্মসঙ্ঘের সকলের প্রতি বিশেষ প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন, এ কথা নিঃসন্দেহ। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বেলঘরিয়া নামক স্থানে ইঁহার উদ্যানে শ্রীযুত কেশব কখন কখন সদলবলে যাইয়া সাধনভজনে কালাতিপাত করিতেন এবং ঐ উদ্যানে ঐরূপ এক সময়ে ঠাকুরের সহিত প্রথম সম্মিলিত হইয়াই তাঁহার জীবনে আধ্যাত্মিকতা ক্রমে

স্বর্গের দুয়ার খুলি, আনন্দ-লহরী তুলি,
নব-বিধান বসন্ত-সমীরণ বয় ;
(কিবা) ছুটে তাহে মন্দ মন্দ, লীলারস-প্রেমগন্ধ,
ঘ্রাণে যোগিবৃন্দ যোগানন্দে মত্ত হয়।
ভবসিন্ধু জলে, 'বিধান'-কমলে,
আনন্দময়ী বিরাজে ;
(কিবা) আবেশে আকুল, ভক্ত-অলিকুল,
পিয়ে সুধা তার মাঝে।
দেখ দেখ মায়ের প্রসন্ন বদন, ভুবনমোহন চিত্তবিনোদন,
পদতলে দলে দলে সাধুগণ, নাচে গায় প্রেমে হইয়া মগন ;
(কিবা) অপরূপ আহা মরি মরি, জুড়াইল প্রাণ দরশন করি,
প্রেমদাসে বলে সবে পায়ে ধরি, গাও ভাই মায়ের জয়। (রে)

১ স্বামী শ্রীব্রহ্মানন্দ নামে এখন যিনি শ্রীরামকৃষ্ণভক্তসঙ্ঘে পরিচিত আছেন।

গভীরভাব ধারণ করিয়া উহাতে নববিধানরূপ সুরভি কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। জয়গোপালও ঐদিন হইতে ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং কখন দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকট গমন করিয়া কখন বা নিজ বাটীতে তাঁহাকে আনয়ন করিয়া ধর্ম্মালাপে পরম আনন্দ অনুভব করিতেন। আমরা শুনিয়াছি, ঠাকুরের কলিকাতায় আসিবার গাড়ীভাড়ার অনেকাংশ শ্রীযুক্ত জয়গোপাল এক সময়ে বহন করিতেন। তাঁহার পরিবারস্থ সকলেও ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন।

অনন্তর রাত্রি ক্রমে অধিক হইতেছে দেখিয়া আমরা ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ঐদিন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্ব্ব-পরিদৃষ্ট ভক্তগণের ঠাকুরের নিকটে আগমনারম্ভ

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য কেশবচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া বিজয়কৃষ্ণ, প্রতাপচন্দ্র, শিবনাথ, চিরঞ্জীব, অমৃতলাল, গৌরগোবিন্দ প্রভৃতি নেতাসকল ঠাকুরের পুণ্যদর্শন ও সঙ্গলাভে স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও ঈশ্বরার্থে সর্ব্বস্বত্যাগরূপ আদর্শের মহত্ত্ব বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া কতদূর উপকৃত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা পাঠককে ইতি-পূর্ব্বে অনেকটা বলিয়াছি। এখন প্রশ্ন হইতেছে, কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্মগণের সংসর্গে আসিয়া অপরোক্ষ-বিজ্ঞানসম্পন্ন, ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুর কি কিছু শিক্ষা করিয়াছিলেন? শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তবৃন্দের অনেকে ঐ কথায় 'না' শব্দ উচ্চারণ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিবেন না। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, সংসারে সর্ব্বত্র আদানপ্রদানের নিয়ম চির-বর্ত্তমান। একান্ত অনভিজ্ঞ তরলমতি বালককে শিক্ষা প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়া কোন্ ভাবে উপদেশ দিলে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি উপদিষ্ট বিষয় শীঘ্র ধারণা করিতে পারিবে, তাহার পূর্ব্বসংস্কারসমূহ ঐ বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিবার পথে কতদূর সহায় বা অন্তরায় হইয়া দণ্ডায়মান এবং তৎসমুদয়ের অপনোদনই বা কিরূপে হওয়া সম্ভব ইত্যাদি নানা বিষয় আমরা শিক্ষা করিয়া থাকি। অতএব পাশ্চাত্যভাব ও শিক্ষারূপ ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসিয়া ঠাকুর যে কিছুই শিক্ষা করেন নাই,

ব্রাহ্মসমাজের নিকট হইতে ঠাকুরও কিছু শিখিয়াছিলেন

এ কথা বলা নিঃসংশয় যুক্তিসঙ্গত নহে। আমাদিগের ধারণা সেজন্ত সম্পূর্ণ অন্তরূপ। আমরা বলি, ব্রাহ্মসমাজ ও সঙ্ঘকে নিজ অলৌকিক সাধনলব্ধ ভাব ও আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষসমূহ প্রদান করিতে যাইয়া ঠাকুর অনেক কথা স্বয়ং শিক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব উহার ফলে তিনি কোন্ কোন্ বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা এখানে কর্ত্তব্য।

পাশ্চাত্য ভাবসহায়ে ভারতবাসীর জীবন কতদূর পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহার পরিচয়প্রাপ্তি

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্মদিগের সংসর্গে আসিবার পূর্ব্বে ঠাকুর পাশ্চাত্যভাব ও শিক্ষার প্রভাব হইতে বহুদূরে নিজ জীবন যাপন করিতেছিলেন। পুণ্যবতী রাণী রাসমণির জামাতা মথুরানাথের কথা ছাড়িয়া দিলে তাঁহার নিকটে এ পর্য্যন্ত যত লোক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদিগের প্রত্যেককেই তিনি সকাম প্রবৃত্তিমার্গে অথবা ভারতের সনাতন 'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ'-রূপ আদর্শ অবলম্বনে জীবন পরিচালিত করিতে যথাসাধ্য সচেষ্ট দেখিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষিত মথুরানাথকে কিঞ্চিৎ বিভিন্নপ্রকৃতিসম্পন্ন দেখিতে পাইলেও উক্ত ভাবে শিক্ষিত প্রত্যেক ভারতবাসীর জীবনই যে ঐরূপ বিপরীত বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, এ কথা ধারণা করিবার তাঁহার অবসর হয় নাই। কারণ তাঁহার পুণ্য-সঙ্গলাভে মথুরানাথের প্রকৃতি স্বল্পকালেই পরিবর্ত্তিত হওয়ায় ঐ বিষয়ে চিন্তা করিবার তাঁহার আবশ্যকতাই হয় নাই। অতএব ব্রাহ্মদিগের সংসর্গে আসিয়া, এবং ধর্ম্মলাভে সচেষ্ট হইলেও ভারতের প্রাচীন ত্যাগাদর্শ হইতে তাঁহাদিগকে বিচ্যুত দেখিয়াই তাঁহার মন উহার

কারণ অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছিল এবং পাশ্চাত্যের শিক্ষা-দীক্ষা বর্ত্তমান ভারতবাসীর জীবনে কিরূপ বিপরীত ভাবরাশি আনয়ন করিতেছে, তদ্বিষয়ে পরিচয় প্রথম প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ঠাকুর বোধ হয় প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার জীবন্ত ও সাক্ষাৎ-উপলব্ধ ধর্ম্মভাবসকলের পরিচয় পাইয়া কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্মগণ স্বল্পকালেই ঐসকল সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু দিনের পর যতই দিন যাইতে লাগিল এবং তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াও যখন তাঁহারা পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাব ছাড়াইয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষসকলে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হইতে পারিলেন না, তখন তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল উক্ত প্রভাব তাঁহাদিগের মনে কতদূর বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। তখনই তিনি বুঝিতে পারিলেন, পাশ্চাত্যের চিন্তাশীল মনীষিগণ ইহাদের অন্তরে গুরুর স্থান চিরকালের নিমিত্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের ভাব ও কথার সহিত না মিলাইয়া ইহারা ভারতের আপ্তকাম ঋষিদিগের প্রত্যক্ষসকল কখনও গ্রহণ করিতে পারিবেন না। তজ্জন্যই ঠাকুর ইঁহাদিগকে উপদেশ দিবার পরেই বলিতেন, "আমি যাহা হয় বলিয়া যাইলাম, তোমরা উহার ল্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়ে গ্রহণ কর।" ইঁহাদিগের ভাবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইয়া তিনি ইঁহাদিগকে ঐরূপে স্বাধীনতাপ্রদান করাতেই ইঁহারা তাঁহার ভাব ও প্রত্যক্ষসকল যথাসম্ভব গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, একথা বলা বাহুল্য।

পাশ্চাত্য মনীষিগণের শিক্ষার সহিত না মিলাইয়া ইহারা ভারতের ঋষিদিগের প্রত্যক্ষসকল গ্রহণ করিবে না

ভারতের ঋষিদিগের সমষ্টিভূত ভাবঘনমূর্ত্তি ঠাকুর কিন্তু পূর্ব্বোক্ত

ঘটনায় কিছুমাত্র বিচলিত হয়েন নাই। কারণ শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছাকেই যিনি জগতের সর্ব্ববিধ ঘটনার হেতু বলিয়া প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন এবং সকল বিষয়ে তাঁহার আদেশ গ্রহণপূর্ব্বক যিনি আপনাকে সর্ব্বাবস্থায় পরিচালিত করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, সংসারের কোন ঘটনা তাঁহাকে কখনও বিচলিত করিতে সক্ষম হয় না। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ঐশী শক্তি মায়া নিজ স্বরূপ দেখাইয়া বুঝাইয়া চিরকালের নিমিত্ত তাঁহাকে অচল অটল শান্তির অধিকারী করিয়াছেন। অতএব শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছাতেই ভারতে পাশ্চাত্য ভাব প্রবেশ এবং তাঁহার ইচ্ছাতেই ব্রাহ্মপ্রমুখ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পাশ্চাত্যভাবের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলীস্বরূপ হওয়ার কথা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ঠাকুর তাঁহাদিগের ঐরূপ দুর্ব্বলতায় বিরক্তি প্রকাশ অথবা তাঁহাদিগকে নিজ অপার স্নেহ-ভালবাসা হইতে বঞ্চিত করিবেন কিরূপে? সুতরাং ঋষিদিগের প্রত্যক্ষ-বিজ্ঞানের ইঁহারা যতটা পারেন লউন, কালে শ্রীশ্রীজগদম্বা এমন লোক আনয়ন করিবেন, যিনি উক্ত বিজ্ঞান সম্পূর্ণ গ্রহণ করিবেন, এ কথা ভাবিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান করিয়াছিলেন।

জগদম্বার ইচ্ছায় ঐরূপ হইয়াছে জানিয়া ঠাকুরের নিশ্চিন্ত ভাব

আবার, ব্রাহ্মগণ তাঁহার সকল কথা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না দেখিয়া তিনি তাঁহাদিগকে নিজ আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষসকলের অংশমাত্র বলিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই। কিন্তু ঈশ্বরার্থে সর্ব্বস্ব ত্যাগ না করিলে তাঁহার পুণ্যদর্শন কখনই লাভ হইবে না—যত মত তত পথ—প্রত্যেক পথের চরমেই উপাস্যের সহিত উপাসকের অভেদত্বপ্রাপ্তি—মন মুখ এক করাই সাধন—এবং ঈশ্বরের প্রতি

একান্ত বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া সদসৎ বিচারপূর্ব্বক সর্ব্বথা ফলকামনারহিত হইয়া সংসারে কর্ত্তব্যকর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করাই তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার পথ ইত্যাদি আধ্যাত্মিক জগতের সকল গূঢ় তত্ত্বই তিনি তাহাদিগের নিকটে সর্ব্বদা নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করিতেন। কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মচর্য্য পালন না করিলে দেহের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হওয়া এবং আধ্যাত্মিক রাজ্যের উচ্চ উপলব্ধিসকল প্রত্যক্ষ করা কখনও সম্ভবে না, এ কথা কেশবপ্রমুখ কাহাকেও কাহাকেও বুঝাইয়া তিনি তাঁহাদিগকে তৎকরণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐরূপে সকল কথা বারংবার বলিবার বুঝাইবার পরেও অনেকের ঐ সকল ধারণা হইতেছে না দেখিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া যাইলে হৃদয়ে নূতন ভাব গ্রহণ করা একপ্রকার অসম্ভব—"কাঁটি উঠিবার পরে পাখীকে 'রাধাকৃষ্ণ' নাম শিখাইতে প্রয়াস করিলে প্রায়ই উহা ব্যর্থ হয়", এবং পাশ্চাত্যের ইহকালসর্ব্বস্ব জড়বাদের প্রভাবেই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, রূপরসাদিভোগের ভাব যাহাদিগের মনে একবার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, ভারতের সনাতন ত্যাগাদর্শ গ্রহণপূর্ব্বক তাহারা কখনও উহা জীবনে সম্যক্ পরিণত করিতে পারিবে না। সেইজন্যই তাঁহার প্রাণে এখন ব্যাকুল-প্রার্থনার উদয় হইয়াছিল, 'মা, তোর ত্যাগী ভক্তদিগকে আনিয়া দে, যাহাদিগের সহিত প্রাণ খুলিয়া তোর কথা বলিয়া আনন্দ করিতে পারি।' অতএব দৃঢ়সংস্কারবিহীন বালকদিগের মনই তাঁহার ভাব ও কথা সম্পূর্ণ গ্রহণপূর্ব্বক উহাদিগের সত্যতা উপলব্ধি

ব্রহ্মবিজ্ঞানের সমগ্র গ্রহণে ব্রাহ্মগণ অশক্ত বুঝিয়া ঠাকুর কি করিয়াছিলেন

করিতে নিঃসঙ্কোচে অগ্রসর হইবে, এ কথা ঠাকুর এখন হইতে বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিলে যুক্তিবিরুদ্ধ হইবে না।

ব্রাহ্মগণের দ্বারা কলিকাতাবাসীর মন ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ; রাম ও মনোমোহনের আগমন ও আশ্রয়লাভ

সে যাহা হউক, কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্মনেতৃগণ ঠাকুরের অভিনব আধ্যাত্মিক ভাব যতদূর গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন এবং উহার ফলে তাঁহাদিগের ভিতর যে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করিতে কলিকাতার জনসাধারণের বিলম্ব হয় নাই। আবার, কেশবপ্রমুখ ব্যক্তিগণ যখন ব্রাহ্মমণ্ডলীপরিচালিত সংবাদপত্রসকলে ঠাকুরের আধ্যাত্মিক মতের অলৌকিকত্ব এবং তাঁহার অমৃতময়ী বাণীসকলের কিছু কিছু প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন কলিকাতার জনসাধারণ তাঁহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পুণ্যদর্শনলাভের জন্য দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইতে লাগিল। ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তসকলে ঐরূপেই দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, শ্রীযুত কেশবের সহিত ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাতের প্রায় চারি বৎসর পরে সন ১২৮৫ সালের, ইংরাজী ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে শ্রীযুত রামচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুত মনোমোহন মিত্র নামক ঠাকুরের গৃহস্থ ভক্তদ্বয় কেশব-পরিচালিত সংবাদপত্রে তাঁহার কথা পাঠ করিয়া তাঁহার সমীপে আগমন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে ইঁহাদিগের জীবনে কিরূপ যুগান্তর ধীরে ধীরে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা শ্রীযুত রামচন্দ্র তৎকৃত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত'শীর্ষক পুস্তকে স্বয়ং প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখানে সংক্ষেপে এ কথা

বলিলেই চলিবে যে, ঈশ্বরার্থে কাম-কাঞ্চন-ত্যাগরূপ ঠাকুরের জীবনাদর্শ সম্যক্ গ্রহণ করিতে না পারিলেও ইঁহারা তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধাপ্রভাবে ত্যাগের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে দুঃখোপার্জ্জিত অর্থের অকাতর ব্যয় দেখিয়াই গৃহী ব্যক্তির ভক্তিবিশ্বাসের তারতম্য অনেকাংশে নিরূপণ করিতে পারা যায়। প্রথমে গুরু এবং পরে ইষ্টস্থানে ঠাকুরকে বসাইয়া শ্রীযুত রামচন্দ্র তাঁহাকে ও তদ্ভক্তসকলকে কলিকাতার সিমলা নামক পল্লীস্থ নিজ-ভবনে পুনঃ পুনঃ আনয়ন-পূর্ব্বক উৎসবাদিতে যেরূপ অকাতরে ব্যয় করিতেন, তাহা হইতে বুঝা যাইত তাঁহার বিশ্বাস-ভক্তি ক্রমে কত গভীরভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে কখনও কখনও বলিতেন, "রামকে এখন এত মুক্তহস্ত দেখিতেছ, যখন প্রথম আসিয়াছিল তখন এমন কৃপণ ছিল যে, বলিবার নহে; এলাচ আনিতে বলিয়াছিলাম, তাহাতে একদিন এক পয়সার শুকনো এলাচ আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিয়াছিল! রামের স্বভাবের কতদূর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা ইহা হইতে বুঝ।"

ঠাকুরের অদ্ভুত দর্শন ও রাখালচন্দ্রের আগমন

ঠাকুর যখন আপনার জ্ঞানে রাম ও মনোমোহনকে নিজ অভয় আশ্রয়ে চিরকালের নিমিত্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার অহেতুকী করুণায় অধিকারী হইয়া তাঁহারা আপনাদিগকে কতদূর কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার নহে। সংসারে ঐরূপ আশ্রয় যে কখনও পাওয়া সম্ভব, এ কথা তাঁহাদিগের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। সুতরাং তাঁহারা যে এখন নিজ আত্মীয়-

কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব সকলকে উক্ত আশ্রয় গ্রহণ করাইতে প্রয়াসী হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? দেখিতেও পাওয়া যায়, ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাতের বৎসরকাল মধ্যেই তাঁহারা নিজ নিজ আত্মীয়-পরিজনবর্গকে ক্রমে ক্রমে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার শ্রীপদপ্রান্তে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। ঐরূপে সন ১২৮৮ সালের শেষভাগ ইংরাজী ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ হইতে ঠাকুরের লীলাসহচর ত্যাগী ভক্তবৃন্দেরা একে একে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘে সুপরিচিত স্বামী ব্রহ্মানন্দই ঠাকুরের নিকটে প্রথম উপস্থিত হইয়াছিলেন।[১] পূর্ব্বজীবনে ইঁহার নাম শ্রীরাখালচন্দ্র ছিল, শ্রীযুত মনোমোহনের ভগ্নীর সহিত ইনি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং উক্ত বিবাহের স্বল্পকাল পরেই ঠাকুরের নাম শুনিয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "রাখাল আসিবার কয়েকদিন পূর্ব্বে দেখিতেছি, মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা) একটি বালককে আনিয়া সহসা আমার ক্রোড়ে বসাইয়া দিয়া বলিতেছেন, 'এইটি তোমার পুত্র!' —শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম,—'সে কি?—আমার আবার ছেলে কি?' তিনি তাহাতে হাসিয়া বুঝাইয়া দিলেন, 'সাধারণ সংসারিভাবে ছেলে নহে, ত্যাগী মানসপুত্র।' তখন আশ্বস্ত হই। ঐ দর্শনের পরেই রাখাল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বুঝিলাম এই সেই বালক!"

১ ত্যাগী ভক্তদের কেহ কেহ পূর্ব্বেও আসিয়াছিলেন—'কথামৃত', ১ম ভাগ, ৩ পৃঃ; 'লীলাপ্রসঙ্গ—সাধকভাব', পরিশিষ্ট, ২২ পৃঃ; 'ঐ গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ', ২৯ পৃঃ; 'ভক্ত মনোমোহন', ৩২ পৃঃ; স্বামী তুরীয়ানন্দের ১৯।৯।১৭ তাং-এর পত্র দ্রষ্টব্য।—প্রঃ

শ্রীযুত রাখালের সম্বন্ধে অন্য এক সময়ে ঠাকুর আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "তখন তখন রাখালের এমন ভাব ছিল—ঠিক যেন তিন-চারি বৎসরের ছেলে! আমাকে ঠিক মাতার ন্যায় দেখিত। থাকিত, থাকিত, সহসা দৌড়িয়া আসিয়া ক্রোড়ে বসিয়া পড়িত এবং মনের আনন্দে নিঃসঙ্কোচে স্তনপান করিত! বাড়ী ত দূরের কথা, এখান হইতে কোথাও এক পা নড়িতে চাহিত না! তাহার বাপ পাছে এখানে না আসিতে দেয়, সেজন্য কত বলিয়া বুঝাইয়া এক একবার বাড়ীতে পাঠাইতাম। বাপ জমিদার, অগাধ পয়সা, কিন্তু বড় কৃপণ ছিল; প্রথম প্রথম নানারূপে চেষ্টা করিয়াছিল—যাহাতে ছেলে এখানে আর না আসে; পরে যখন দেখিল, এখানে ধনী, বিদ্বান্ লোক সব আসে, তখন আর ছেলের আসায় আপত্তি করিত না। ছেলের জন্য কখন কখন এখানে আসিয়াও উপস্থিত হইয়াছিল। তখন রাখালের জন্য তাহাকে বিশেষ আদর-যত্ন করিয়া সন্তুষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম।

রাখালের বালকভাব

"শ্বশুর-বাড়ীর তরফ হইতে কিন্তু রাখালের এখানে আসা সম্বন্ধে কখনও আপত্তি উঠে নাই। কারণ মনোমোহনের মা, স্ত্রী, ভগ্নীরা, সকলের এখানে আসা যাওয়া ছিল। রাখাল আসিবার কিছুকাল পরে যেদিন মনোমোহনের মাতা রাখালের বালিকা বধূকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিল, সেদিন মনে হইল বধূর সংসর্গে আমার রাখালের ঈশ্বরভক্তির হানি হইবে না ত?—ভাবিয়া, তাহাকে কাছে আনাইয়া পা হইতে মাথার কেশ পর্য্যন্ত শারীরিক গঠনভঙ্গী তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম

রাখালের পত্নী

রাখাল

স্বামী ব্রহ্মানন্দ)

এবং বুঝিলাম ভয়ের কারণ নাই, দেবীশক্তি, স্বামীর ধর্ম্মপথের অন্তরায় কখনও হইবে না। তখন সন্তুষ্ট হইয়া নহবতে (শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে) বলিয়া পাঠাইলাম, টাকা দিয়া যেন পুত্রবধূর মুখ দেখে।

"আমাকে পাইলে আত্মহারা হইয়া রাখালের ভিতর যে কিরূপ বালকভাবের আবেশ হইত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। তখন যে-ই তাহাকে ঐরূপ দেখিত, সে-ই অবাক হইয়া যাইত। আমিও ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহাকে ক্ষীর-ননী খাওয়াইতাম, খেলা দিতাম। কত সময় কাঁধেও উঠাইয়াছি! তাহাতেও তাহার মনে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচের ভাব আসিত না! তখনি কিন্তু বলিয়াছিলাম বড় হইয়া স্ত্রীর সহিত একত্র বাস করিলে তাহার এই বালকের ন্যায় ভাবটি আর থাকিবে না।

রাখালের বালক-ভাবের হানি

"অন্যায় করিলে তাহাকে শাসনও করিতাম। একদিন কালী-ঘর হইতে প্রসাদী মাখম আসিলে সে ক্ষুধিত হইয়া আপনিই উহা লইয়া খাইয়াছিল। তাহাতে বলিয়াছিলাম, 'তুই ত ভারি লোভী, এখানে আসিয়া কোথায় লোভত্যাগে যত্ন করিবি, তাহা না হইয়া আপনি মাখম লইয়া খাইলি?' সে ভয়ে জড়সড় হইয়া গিয়াছিল ও আর কখনও ঐরূপ করে নাই।

রাখালকে শাসন

"রাখালের মনে তখন বালকের ন্যায় হিংসাও ছিল। তাহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও আমি ভালবাসিলে সে সহ্য করিতে পারিত না। অভিমানে তাহার মন পূর্ণ হইয়া উঠিত। তাহাতে আমার কখন কখন তাহার নিমিত্ত ভয় হইত। কারণ মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা) যাহাদের

রাখালের মনে হিংসা ও ঠাকুরের ভয়

এখানে আনিতেছেন, তাহাদের উপর হিংসা করিয়া পাছে তাহার অকল্যাণ হয়।

"এখানে আসিবার প্রায় তিন বৎসর পরে রাখালের শরীর অসুস্থ হওয়ায় সে বলরামের সহিত শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিল। উহার কিছু পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, মা যেন তাহাকে এখান হইতে সরাইয়া দিতেছেন। তখন ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম, 'মা, ও (রাখাল) ছেলে-মানুষ, বুঝে না, তাই কখন কখন অভিমান করে, যদি তোর কাজের জন্য ওকে এখান হইতে কিছুদিনের জন্য সরাইয়া দিস্, তাহা হইলে ভাল জায়গায় মনের আনন্দে রাখিস্।' উহার অল্পকাল পরেই তাহার বৃন্দাবনে যাওয়া হয়।

রাখালের শ্রীবৃন্দাবনে গমন

"বৃন্দাবনে থাকিবার কালে রাখালের অসুখ হইয়াছে শুনিয়া কত ভাবনা হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। কারণ ইতিপূর্ব্বে মা দেখাইয়াছিলেন, রাখাল সত্যসত্যই ব্রজের রাখাল! যেখান হইতে যে আসিয়া শরীর ধারণ করিয়াছে, সেখানে যাইলে প্রায়ই তাহার পূর্ব্বকথা স্মরণ হইয়া সে শরীর ত্যাগ করে। সেইজন্য ভয় হইয়াছিল, পাছে শ্রীবৃন্দাবনে রাখালের শরীর যায়। তখন মা-র নিকট কাতর হইয়া কত প্রার্থনা করি এবং মা অভয়দানে আশ্বস্ত করেন। ঐরূপে রাখালের সম্বন্ধে মা কত কি দেখাইয়াছেন। তাহার অনেক কথা বলিতে নিষেধ আছে।"[১]

রাখালের অসুস্থতায় ঠাকুরের ভয়

[১] শ্রীযুত রাখালের সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কথাসকল ঠাকুর একসময়ে আমাদিগের নিকট না বলিলেও পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য আমরা ঐ সকল এখানে ধারাবাহিক-ভাবে সাজাইয়া দিলাম।

ঐরূপে ঠাকুর তাঁহার প্রথমলব্ধ বালকভক্ত-সম্বন্ধে কত সময় কত বলিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। মা তাঁহাকে তাহার সম্বন্ধে যাহা দেখাইয়াছিলেন তাহা বর্ণে বর্ণে সফল হইয়াছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালক ধীর গম্ভীর সাধক-শ্রেণীভুক্ত হইয়া ক্রমে ঈশ্বরার্থে সংসারের সর্ব্বস্ব ত্যাগপূর্ব্বক শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল।

রাখালের ভবিষ্যৎ জীবন

শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ স্বামীর দক্ষিণেশ্বরে প্রথমাগমনের তিন-চারি মাস পরেই পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুরের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার কথাই এখন আমরা পাঠককে বলিতে প্রবৃত্ত হইব।

নরেন্দ্রনাথের আগমন

তৃতীয় অধ্যায়

নরেন্দ্রনাথের প্রথম আগমন ও পরিচয়

বেদপ্রমুখ শাস্ত্র, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ হয়েন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—ব্রহ্মবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের এই কালের আচরণ দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবাক্য ধ্রুবসত্য বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। কারণ, দেখা যায়, তিনি যে এখন কেবলমাত্র ব্রহ্মের সগুণ-নির্গুণ উভয় ভাবের এবং ব্রহ্মশক্তি মায়ার সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরিচিত হইয়া সকল প্রকার সংশয় ও মলিনতার পরপারে গমনপূর্ব্বক স্বয়ং সদানন্দে অবস্থান করিতেছেন, তাহা নহে; কিন্তু ভাবমুখে সর্ব্বদা অবস্থানপূর্ব্বক মায়ার রাজ্যের যে গূঢ় রহস্য যখনই জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন তখনই তাহা জানিতে পারিতেছেন। তাঁহার সুসূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন মনের সম্মুখে উহা আর নিজস্বরূপ গোপন করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। ঐরূপ হইবারই কথা। কারণ, ভাবমুখ ও মায়াধীশ ঈশ্বরের বিরাট মন—যাহাতে বিশ্বরূপ-কল্পনা কখন প্রকাশিত এবং কখন বিলুপ্তভাবে অবস্থান করে—উভয় একই পদার্থ; এবং যিনি আপনার ক্ষুদ্র আমিত্বের গণ্ডি অতিক্রমপূর্ব্বক উহার সহিত একীভূত হইয়া অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছেন, বিরাট মনে উদিত সমুদয় কল্পনাই তাঁহার সম্মুখে প্রতিভাত হয়। উক্ত অবস্থায় পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ঠাকুর তাঁহার ভক্তদিগের আগমনের পূর্ব্বেই নিজ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মসকলের কথা

দিব্যভাবারূঢ় ঠাকুরের মানসিক অবস্থার আলোচনা

জানিয়া লইয়াছিলেন। বিরাট মনের কোন্ বিশেষ লীলাপ্রকাশের জন্য তাঁহার বর্ত্তমান শরীরধারণ তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। উক্ত লীলার পুষ্টির জন্য কতকগুলি উচ্চশ্রেণীর সাধক ব্যক্তি ঈশ্বরেচ্ছায় জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, এ কথা জ্ঞাত হইয়াছিলেন। উঁহাদিগের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি সেই লীলাপ্রকাশে তাঁহাকে অল্পাধিক সহায়তা করিবেন এবং কাহারাই বা তাহার ফলভোগী মাত্র হইয়া কৃতার্থ হইবেন তাহা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং ঐ সকল ভক্তের আগমন-কাল সন্নিকট জানিয়া তাহাদিগের নিমিত্ত সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। মায়ার রাজ্যের অন্তরে থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত গূঢ় রহস্যসকল যিনি জানিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

স্বরেন্দ্রের বাটীতে ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের পরস্পরকে প্রথম দর্শন

নিজ চিহ্নিত ভক্তসকলের আগমন-কাল সন্নিকট জানিয়া দিব্যভাবারূঢ় ঠাকুর এইকালে তাহাদিগের জন্য কিরূপ আগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীস্বামী বিবেকানন্দের তাঁহার নিকটে প্রথমাগমনের কথা অনুধাবন করিয়া বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেন, ঠাকুরের নিকটে তাঁহার আগমনের প্রায় সমসমান কালে কলিকাতার সিমলা নামক পল্লী-নিবাসী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। প্রথম দর্শনের দিন হইতেই শ্রীযুত সুরেন্দ্র ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং স্বল্পকালেই তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজালয়ে লইয়া যাইয়া আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। সুকণ্ঠ-

গায়কের অভাব হওয়ায় সুরেন্দ্রনাথ ঐ দিবসে নিজ প্রতিবেশী শ্রীযুত বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথকে ঠাকুরের নিকটে ভজন গাহিবার জন্য নিজালয়ে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। ঠাকুর ও তাঁহার প্রধান লীলাসহায়ক স্বামী বিবেকানন্দের পরস্পর পরস্পরকে প্রথম দর্শন করা ঐরূপে সংঘটিত হইয়াছিল। তখন সন ১২৮৮ সালের হেমন্তের শেষভাগ—ইং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর হইবে; এবং অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক নরেন্দ্রনাথ ঐ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ্.এ. পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

নরেন্দ্রকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে ঠাকুরের আমন্ত্রণ

স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেন, নরেন্দ্রনাথকে সেদিন দেখিবামাত্র ঠাকুর যে তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। কারণ প্রথমে সুরেন্দ্রনাথকে এবং পরে রামচন্দ্রকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক সুগায়ক যুবকের পরিচয় যতদূর সম্ভব জানিয়া লয়েন এবং একদিবস তাহাকে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার সকাশে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। আবার ভজন সাঙ্গ হইলে স্বয়ং যুবকের নিকট আগমনপূর্ব্বক তাহার অঙ্গলক্ষণসকল বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাহার সহিত দুই-একটি কথা কহিয়া অবিলম্বে একদিবস দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ্.এ. পরীক্ষা হইয়া গেল এবং নরেন্দ্রনাথের পিতা সহরের কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার কন্যার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শুনা যায়,

পাত্রী শ্যামবর্ণা ছিল বলিয়া তাঁহার পিতা উক্ত বিবাহে দশ সহস্র মুদ্রা দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র দত্ত-প্রমুখ নরেন্দ্রনাথের আত্মীয়বর্গ তাঁহার পিতার প্রেরণায় তাঁহাকে উক্ত বিবাহে সম্মত করাইবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নরেন্দ্র-নাথের বিষম আপত্তিতে উক্ত বিবাহ সম্পন্ন হয় নাই। রামচন্দ্র নরেন্দ্রনাথের পিতার সংসারে প্রতিপালিত হইয়া ক্রমে চিকিৎসক হইয়াছিলেন এবং তাঁহার দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ছিলেন। ধর্ম্মভাবের প্রেরণা হইতেই নরেন্দ্র বিবাহ করিলেন না, একথা বুঝিতে পারিয়া তিনি তখন তাঁহাকে এক দিবস বলিয়া-ছিলেন, "যদি ধর্ম্মলাভ করিতেই তোমার যথার্থ বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি স্থলে ঘুরিয়া না বেড়াইয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে চল।" প্রতিবেশী সুরেন্দ্রনাথও তাঁহাকে এই সময়ে এক দিবস তাঁহার সহিত গাড়ী করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইতে নিমন্ত্রণ করেন। নরেন্দ্রনাথ উহাতে সম্মত হইয়া দুই-তিন জন বয়স্য সমভিব্যাহারে সুরেন্দ্রনাথের সহিত দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

নরেন্দ্রের বিবাহ করিতে অসম্মতি ও দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন

নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া ঐ দিবস ঠাকুরের যাহা মনে হইয়াছিল, কথাপ্রসঙ্গে তাহা তিনি একদিন সংক্ষেপে আমাদিগকে এইরূপে বলিয়াছিলেন—

"পশ্চিমের (গঙ্গার দিকের) দরজা দিয়া নরেন্দ্র প্রথম দিন এই ঘরে ঢুকিয়াছিল। দেখিলাম, নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য নাই, মাথার চুল ও বেশভূষার কোনরূপ পারিপাট্য নাই, বাহিরের কোন

পদার্থেই ইতরসাধারণের মত একটা আঁট নাই, সবই যেন তার আল্‌গা এবং চক্ষু দেখিয়া মনে হইল তাহার মনের অনেকটা ভিতরের দিকে কে যেন সর্ব্বদা জোর করিয়া টানিয়া রাখিয়াছে! দেখিয়া মনে হইল, বিষয়ী লোকের আবাস কলিকাতায় এত বড় সত্ত্বগুণী আধার থাকাও সম্ভবে!

নরেন্দ্রকে ঠাকুরের যাহা মনে হইয়াছিল

"মেজেতে মাদুর পাতা ছিল, বসিতে বলিলাম। যেখানে গঙ্গাজলের জালাটি রহিয়াছে তাহার নিকটেই বসিল। তাহার সঙ্গে সেদিন দুই-চারি জন আলাপী ছোক্‌রাও আসিয়াছিল। বুঝিলাম, তাহাদিগের স্বভাব সম্পূর্ণ বিপরীত—সাধারণ বিষয়ী লোকের যেমন হয়; ভোগের দিকেই দৃষ্টি।

"গান গাহিবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বাঙ্গালা গান সে দুই-চারিটি মাত্র তখন শিখিয়াছে। তাহাই গাহিতে বলিলাম, তাহাতে সে ব্রাহ্মসমাজের 'মন চল নিজ নিকেতনে'[১] গানটি ধরিল ও ষোলআনা মনপ্রাণ ঢালিয়া ধ্যানস্থ হইয়া যেন উহা গাহিতে লাগিল—শুনিয়া আর সামলাইতে পারিলাম না, ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম।

নরেন্দ্রের গান

১ মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে।
বিষয়পঞ্চক আর ভূতগণ,
সব তোর পর, কেহ নয় আপন,
পরপ্রেমে কেন হয়ে অচেতন
ভুলিছ আপন জনে।

"পরে সে চলিয়া যাইলে, তাহাকে দেখিবার জন্য প্রাণের ভিতরটা চব্বিশ ঘণ্টা এমন ব্যাকুল হইয়া রহিল যে, বলিবার নহে। সময়ে সময়ে এমন যন্ত্রণা হইত যে, মনে হইত বুকের ভিতরটা যেন কে গামছা-নিংড়াইবার মত জোর করিয়া নিংড়াইতেছে! তখন আপনাকে আর সামলাইতে পারিতাম না, ছুটিয়া বাগানের উত্তরাংশের ঝাউ-তলায়, যেখানে কেহ বড় একটা যায় না, যাইয়া 'ওরে তুই আয়রে, তোকে না দেখে আর থাক্‌তে পার্‌চি না'

নরেন্দ্রকে দেখিবার জন্য ঠাকুরের ব্যাকুলতা

সত্যপথে মন কর আরোহণ,
প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল লহ ভক্তিধন
গোপনে অতি যতনে।
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ,
পথিকের করে সর্ব্বস্ব শোষণ,
তাই বলি মন রেখরে প্রহরী
শম দম দুই জনে।
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম,
শ্রান্ত হলে তথায় করিও বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হলে সুধাইও পথ
সে পান্থনিবাসিগণে।
যদি দেখ পথে ভয়েরি আকার,
প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ
শমন ডরে যাঁর শাসনে।

বলিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতাম ! খানিকটা এইরূপে কাঁদিয়া তবে আপনাকে সামলাইতে পারিতাম ! ক্রমান্বয়ে ছয় মাস ঐরূপ হইয়াছিল ! আর সব ছেলেরা যারা এখানে আসিয়াছে, তাদের কাহারও কাহারও জন্য কখন কখন মন কেমন করিয়াছে, কিন্তু নরেন্দ্রের জন্য যেমন হইয়াছিল তাহার তুলনায় সে কিছুই নয় বলিলে চলে !”

নরেন্দ্রনাথকে প্রথম দিন দক্ষিণেশ্বরে দেখিয়া ঠাকুরের মনে যে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহার অনেকটা ঢাকিয়া যে তিনি ঐরূপে আমাদিগের নিকটে বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা পরে বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি। শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ একদিন উক্ত দিবসের কথাপ্রসঙ্গে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—

ঠাকুরের ঐ দিবসের কথা ও ব্যবহার-সম্বন্ধে নরেন্দ্রের বিবরণ

“গান ত গাহিলাম, তাহার পরেই ঠাকুর সহসা উঠিয়া আমার হাত ধরিয়া তাঁহার ঘরের উত্তরে যে বারাণ্ডা আছে, তথায় লইয়া যাইলেন। তখন শীতকাল, উত্তরে-হাওয়া নিবারণের জন্য উক্ত বারাণ্ডার থামের অন্তরালগুলি ঝাঁপ দিয়া ঘেরা ছিল ; সুতরাং উহার ভিতরে ঢুকিয়া ঘরের দরজাটি বন্ধ করিয়া দিলে ঘরের ভিতরের বা বাহিরের কোন লোককে দেখা যাইত না। বারাণ্ডায় প্রবিষ্ট হইয়াই ঠাকুর ঘরের দরজাটি বন্ধ করায় ভাবিলাম, আমাকে বুঝি নির্জ্জনে কিছু উপদেশ দিবেন। কিন্তু যাহা বলিলেন ও করিলেন তাহা একেবারে কল্পনাতীত। সহসা আমার হাত ধরিয়া দরদরিতধারে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং পূর্ব্বপরিচিতের ন্যায় আমাকে পরম স্নেহে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, ‘এতদিন

পরে আসিতে হয়? আমি তোমার জন্য কিরূপে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি তাহা একবার ভাবিতে নাই? বিষয়ী লোকের বাজে প্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে আমার কান ঝলসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে; প্রাণের কথা কাহাকেও বলিতে না পাইয়া আমার পেট ফুলিয়া রহিয়াছে!' —ইত্যাদি কত কথা বলেন ও রোদন করেন! পরক্ষণেই আবার আমার সম্মুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া দেবতার মত আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, 'জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীরধারণ করিয়াছ' ইত্যাদি!

"আমি ত তাঁহার ঐরূপ আচরণে একেবারে নির্ব্বাক্—স্তম্ভিত! মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম এ কাহাকে দেখিতে আসিয়াছি, এ ত একবারে উন্মাদ—না হইলে বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র আমি, আমাকে এই সব কথা বলে? যাহা হউক, চুপ করিয়া রহিলাম, অদ্ভুত পাগল যাহা ইচ্ছা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। পরক্ষণে আমাকে তথায় থাকিতে বলিয়া তিনি গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং মাখম, মিছরি ও কতকগুলি সন্দেশ আনিয়া আমাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। আমি যত বলিতে লাগিলাম, 'আমাকে খাবারগুলি দিন। আমি সঙ্গীদের সহিত ভাগ করিয়া খাইগে,' তিনি তাহা কিছুতেই শুনিলেন না। বলিলেন, 'উহারা খাইবে এখন, তুমি খাও।' —বলিয়া সকলগুলি আমাকে খাওয়াইয়া তবে নিরস্ত হইলেন। পরে হাত ধরিয়া বলিলেন, 'বল, তুমি শীঘ্র একদিন

নরেন্দ্রের পুনরায় আসিবার প্রতিশ্রুতি

এখানে আমার নিকটে একাকী আসিবে ?' তাঁহার ঐরূপ একান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা 'আসিব' বলিলাম এবং তাঁহার সহিত গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সঙ্গীদিগের নিকটে উপবিষ্ট হইলাম।

"বসিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম ও ভাবিতে লাগিলাম। দেখিলাম তাঁহার চালচলনে, কথাবার্ত্তায়, অপর সকলের সহিত আচরণে উন্মাদের মত কিছুই নাই। তাঁহার সদালাপ ও ভাবসমাধি দেখিয়া মনে হইল সত্য-সত্যই ইনি ঈশ্বরার্থে সর্ব্বস্বত্যাগী এবং যাহা বলিতেছেন তাহা স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়াছেন। 'তোমাদিগকে যেমন দেখিতেছি, তোমাদিগের সহিত যেমন কথা কহিতেছি, এইরূপে ঈশ্বরকে দেখা যায় ও তাঁহার সহিত কথা কহা যায়, কিন্তু ঐরূপ করিতে চাহে কে? লোকে স্ত্রীপুত্রের শোকে ঘটি ঘটি চক্ষের জল ফেলে, বিষয় বা টাকার জন্য ঐরূপ করে, কিন্তু ঈশ্বরকে পাইলাম না বলিয়া ঐরূপ কে করে বল? তাঁহাকে পাইলাম না বলিয়া যদি ঐরূপ ব্যাকুল হইয়া কেহ তাঁহাকে ডাকে তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় তাহাকে দেখা দেন'—তাঁহার মুখে ঐ সকল কথা শুনিয়া মনে হইল তিনি অপর ধর্ম্মপ্রচারকসকলের ন্যায় কল্পনা বা রূপকের সহায়তা লইয়া ঐরূপ বলিতেছেন না, সত্যসত্যই সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া এবং সম্পূর্ণ মনে ঈশ্বরকে ডাকিয়া যাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন। তখন তাঁহার ইতিপূর্ব্বের আচরণের সহিত ঐ সকল কথার সামঞ্জস্য করিতে যাইয়া এবারক্রুম্বি-

প্রথম দর্শনে ঠাকুরের সম্বন্ধে নরেন্দ্রের ধারণা—ইনি অর্দ্ধোন্মাদ কিন্তু ঈশ্বরার্থে যথার্থ ই সর্ব্বস্বত্যাগী

প্রমুখ ইংরাজ দার্শনিকগণ তাঁহাদিগের গ্রন্থমধ্যে যে সকল অর্দ্ধোন্মাদের (monomaniac) উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সকল দৃষ্টান্ত মনে উদিত হইল এবং দৃঢ়নিশ্চয় করিলাম ইনিও ঐরূপ হইয়াছেন। ঐরূপ নিশ্চয় করিয়াও কিন্তু ইঁহার ঈশ্বরার্থে অদ্ভুত ত্যাগের মহিমা ভুলিতে পারিলাম না। নির্ব্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, উন্মাদ হইলেও ঈশ্বরের জন্য ঐরূপ ত্যাগ জগতে বিরল ব্যক্তিই করিতে সক্ষম ; উন্মাদ হইলেও এ ব্যক্তি মহাপবিত্র, মহাত্যাগী এবং ঐ জন্য মানবহৃদয়ের শ্রদ্ধা, পূজা ও সম্মান পাইবার যথার্থ অধিকারী ! ঐরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেদিন তাঁহার চরণবন্দনা ও তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।”

যাঁহাকে দেখিয়াই ঠাকুরের মনে ঐরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল তাঁহার পূর্ব্বকথা পাঠকের জানিবার স্বতঃই কৌতূহল হইবে, এজন্য আমরা এখন সংক্ষেপে উহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

নরেন্দ্রের এই কালের ধর্ম্মানুষ্ঠান

শ্রীযুত নরেন্দ্র তখন কেবলমাত্র বিদ্যার্জ্জনে এবং সঙ্গীতশিক্ষায় কালযাপন করিতেছিলেন না—কিন্তু ধর্ম্মভাবের তীব্র প্রেরণায় অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যপালনে ও কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিরামিষভোজী হইয়া ভূমি অথবা কম্বলশয্যায় রাত্রিযাপন করিতেছিলেন। তাঁহার পিত্রালয়ের সন্নিকটে তদীয় মাতামহীর একখানি ভাড়াটিয়া বাটী ছিল ; প্রবেশিকা পরীক্ষার পর হইতে উহার বহির্ভাগের দ্বিতলের একটি ঘরেই তিনি প্রধানতঃ বাস

করিতেন। যখন কোন কারণে সেখানে থাকার অসুবিধা হইত তখন উক্ত বাটীর নিকটে একখানি ঘর ভাড়া করিয়া আত্মীয়স্বজন ও পরিবারবর্গ হইতে দূরে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থানপূর্ব্বক তিনি নিজ উদ্দেশ্যসাধনে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার সদাশয় পিতা ও বাটীর অন্যান্য সকলে জানিত, বাটীতে বহুপরিবারের নানা গণ্ডগোলে পাঠাভ্যাসের সুবিধা হয় না বলিয়াই তিনি পৃথক্ অবস্থান করেন।

ব্রাহ্মসমাজে গমনাগমন

শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ তখন ব্রাহ্মসমাজেও গমনাগমন করিতেছিলেন এবং নিরাকার সগুণ-ব্রহ্মের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হইয়া তাঁহার ধ্যানে অনেক কাল অতিবাহিত করিতেন। তর্কযুক্তি-সহায়ে নিরাকার ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠামাত্র করিয়াই তিনি ইতরসাধারণের ন্যায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। পূর্ব্ব পুণ্যসংস্কারসমূহের প্রেরণায় তাঁহার প্রাণ তাঁহাকে নিরন্তর বলিতেছিল—যদি ভগবান সত্যসত্যই থাকেন তাহা হইলে মানব-হৃদয়ের ব্যাকুল আহ্বানে তিনি কখন নিজস্বরূপ গোপন করিয়া রাখিবেন না, তাঁহাকে লাভ করিবার পথ তিনি নিশ্চয়ই করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাঁহাকে লাভ করা ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে জীবনধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। আমাদিগের স্মরণ আছে একসময়ে তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—

"যৌবনে পদার্পণ করিয়া পর্য্যন্ত প্রতিরাত্রে শয়ন করিলেই দুইটি কল্পনা আমার চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিত। একটিতে দেখিতাম যেন আমার অশেষ ধনজন সম্পদ ঐশ্বর্য্যাদি লাভ হইয়াছে, সংসারে যাহাদের বড় লোক বলে তাহাদিগের শীর্ষস্থানে

যেন আরূঢ় হইয়া রহিয়াছি, মনে হইত ঐরূপ হইবার শক্তি আমাতে সত্যসত্যই রহিয়াছে। আবার পরক্ষণে দেখিতাম, আমি যেন পৃথিবীর সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া একমাত্র ঈশ্বরেচ্ছায় নির্ভরপূর্ব্বক কৌপীনধারণ, যদৃচ্ছালব্ধ ভোজন এবং বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন করিয়া কাল কাটাইতেছি। মনে হইত ইচ্ছা করিলে আমি ঐভাবে ঋষিমুনিদের ন্যায় জীবন-যাপনে সমর্থ। ঐরূপে দুই প্রকারে জীবন নিয়মিত করিবার ছবি কল্পনায় উদিত হইয়া পরিশেষে শেষোক্তটিই হৃদয় অধিকার করিয়া বসিত। ভাবিতাম ঐরূপেই মানব পরমানন্দ লাভ করিতে পারে, আমি ঐরূপই করিব। তখন ঐপ্রকার জীবনের সুখ ভাবিতে ভাবিতে ঈশ্বরচিন্তায় মন নিমগ্ন হইত এবং ঘুমাইয়া পড়িতাম। আশ্চর্য্যের বিষয় প্রত্যহ অনেক দিন পর্য্যন্ত ঐরূপ হইয়াছিল!"

নরেন্দ্রের অদ্ভুত কল্পনাদ্বয়

ধ্যানকেই নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বরলাভের একমাত্র প্রশস্ত পথরূপে এই বয়সেই স্বতঃ ধারণা করিয়াছিলেন। উহা তাঁহার পূর্ব্বসংস্কারজ জ্ঞান বলিয়া বেশ বুঝা যায়। তাঁহার বয়স যখন চারি-পাঁচ বৎসর হইবে তখন সীতারাম, মহাদেব প্রভৃতি দেবদেবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃণ্ময়মূর্ত্তিসকল বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনয়নপূর্ব্বক পুষ্পাভরণে সজ্জিত করিয়া উহাদিগের সম্মুখে ধ্যানের ভানে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিস্পন্দ-ভাবে বসিয়া থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে চাহিয়া দেখিতেন, ইতিমধ্যে তাঁহার মাথায় সুদীর্ঘ জটা লম্বিত হইয়া বৃক্ষাদির মূলের ন্যায় মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল কি না—কারণ বাটীর বৃদ্ধা

নরেন্দ্রের স্বাভাবিক ধ্যানানুরাগ

স্ত্রীলোকদিগের নিকটে তিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন, ধ্যান করিতে করিতে মুনিঋষিদের মাথায় জটা হয় এবং উহা ঐপ্রকারে মাটির ভিতর নামিয়া যায়। তাঁহার পূজনীয়া মাতা বলিতেন, ঐ সময়ে এক দিবস নরেন্দ্রনাথ হরি নামক এক প্রতিবেশী বালকের সহিত সকলের অজ্ঞাতে বাটীর এক নিভৃত প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া এত অধিককাল ঐরূপ ধ্যানের ভানে বসিয়াছিলেন যে, সকলে বালকের অন্বেষণে চারিদিকে ধাবিত হইয়াছিল এবং ভাবিয়াছিল পথ হারাইয়া বালক কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পরে বাটীর ঐ অংশ অর্গলবদ্ধ দেখিয়া একজন উহা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়া দেখে—বালক তখন নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিয়াছে। বাল্য-কল্পনা হইলেও উহা হইতে বুঝা যায় শ্রীযুত নরেন্দ্র কিরূপ অদ্ভুত সংস্কার লইয়া সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে তাঁহার আত্মীয়বর্গের প্রায় কেহই জানিতেন না যে, তিনি নিত্য ধ্যানাভ্যাস করিয়া থাকেন। কারণ রাত্রিতে সকলে শয়ন করিবার পরে গৃহ অর্গলবদ্ধ করিয়া তিনি ধ্যান করিতে বসিতেন এবং কখন কখন উহাতে এতদূর নিমগ্ন হইতেন যে, সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইবার পরে তাঁহার ঐ বিষয়ের জ্ঞান হইত।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপদেশে ঐ অনুরাগবৃদ্ধি

এইকালের কিছু পূর্ব্বের একটি ঘটনায় শ্রীযুত নরেন্দ্রের ধ্যান করিবার প্রবৃত্তি বিশেষ উৎসাহলাভ করিয়াছিল। বয়স্যবর্গের সহিত তিনি একদিন আদি ব্রাহ্মসমাজের পূজ্যপাদ আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। মহর্ষি যুবকগণকে সেদিন সাদরে

নিকটে বসাইয়া অনেক সদুপদেশ প্রদানপূর্ব্বক নিত্য ঈশ্বরের ধ্যানাভ্যাস করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া তিনি সেদিন বলিয়াছিলেন, তোমাতে যোগীর লক্ষণসকল প্রকাশিত রহিয়াছে, তুমি ধ্যানাভ্যাস করিলে যোগশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ফলসকল শীঘ্রই প্রত্যক্ষ করিবে। মহর্ষির পুণ্য চরিত্রের জন্য নরেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতি পূর্ব্ব হইতেই শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার ঐরূপ কথায় তিনি যে এখন হইতে ধ্যানাভ্যাসে অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

নরেন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভা

বাল্যকাল হইতেই নানাবিষয়ে নরেন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইত। পঞ্চমবর্ষ অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে তিনি মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণের সমগ্র সূত্রগুলি আবৃত্তি করিতে পারিতেন। এক বৃদ্ধ আত্মীয় প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে ক্রোড়ে বসাইয়া পিতৃপুরুষের নামাবলী, দেবদেবীস্তোত্রসমূহ এবং উক্ত ব্যাকরণের সূত্রগুলি শিখাইয়াছিলেন। ছয় বৎসর বয়সকালে তিনি রামায়ণের সমগ্র পালা কণ্ঠস্থ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং পাড়ার কোন স্থানে রামায়ণ-গান হইতেছে শুনিলেই তথায় উপস্থিত হইতেন। শুনা যায় তাঁহার বাটীর নিকটে এক স্থলে এক রামায়ণ-গায়ক এক দিবস পালাবিশেষ গাহিতে গাহিতে উহার কোন অংশ স্মরণ করিতে পারিতেছিল না, নরেন্দ্রনাথ তাহাকে উহা তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিয়া তাহার নিকট বিশেষ সমাদর ও কিছু মিষ্টান্ন লাভ করিয়াছিলেন। রামায়ণ শুনিতে উপস্থিত হইয়া নরেন্দ্রনাথ তখন মধ্যে মধ্যে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেন, শ্রীরামচন্দ্রের দাস মহাবীর হনুমান্ তাঁহার প্রতিশ্রুতি মত

গান শুনিতে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন কি না। শ্রুতিধরের ন্যায় নরেন্দ্রনাথের প্রবল স্মৃতিশক্তির বিকাশ ছিল। কোন বিষয় একবার শুনিলেই উহা তাঁহার আয়ত্ত হইয়া যাইত। আবার ঐরূপে একবার কোন বিষয় আয়ত্ত হইলে তাঁহার স্মৃতি হইতে উহা কখনও অপসারিত হইত না। সেজন্য শৈশব হইতেই তাঁহার পাঠাভ্যাসের রীতি ইতরসাধারণ বালকের ন্যায় ছিল না। বাল্যে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার পরে দৈনিক পাঠাভ্যাস করাইয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ বলিতেন, "তিনি বাটীতে আসিলে আমি ইংরাজী, বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তকগুলি তাঁহার নিকটে আনয়ন করিয়া কোন্ পুস্তকের কোথা হইতে কতদূর পর্য্যন্ত সে দিন আয়ত্ত করিতে হইবে তাহা তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়া যদৃচ্ছা শয়ন বা উপবেশন করিয়া থাকিতাম। মাষ্টার মহাশয় যেন নিজে পাঠাভ্যাস করিতেছেন এইরূপভাবে পুস্তকগুলির ঐ সকল স্থানের বানান, উচ্চারণ ও অর্থাদি দুই-তিন বার আবৃত্তি করিয়া চলিয়া যাইতেন। উহাতেই ঐ সকল আমার আয়ত্ত হইয়া যাইত।" বড় হইয়া তিনি পরীক্ষার দুই-তিন মাস মাত্র থাকিবার কালে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকসকল আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিতেন ; অন্য সময়ে আপন অভিরুচি মত অন্য পুস্তকসকল পড়িয়া কাল কাটাইতেন। ঐরূপে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে তিনি ইংরাজী ও বাঙ্গালার সমগ্র সাহিত্য ও অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। ঐরূপ করিবার ফলে কিন্তু পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহাকে কখন কখন অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইত। আমাদিগের স্মরণ আছে, একদিন তিনি পূর্ব্বোক্ত কথাপ্রসঙ্গে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন

"প্রবেশিকা পরীক্ষার আরম্ভের দুই-তিন দিন মাত্র থাকিতে দেখি জ্যামিতি কিছুমাত্র আয়ত্ত হয় নাই; তখন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া উহা পাঠ করিতে লাগিলাম এবং চব্বিশ ঘণ্টায় উহার চারিখানি পুস্তক আয়ত্ত করিয়া পরীক্ষা দিয়া আসিলাম!" ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি দৃঢ় শরীর ও অপূর্ব্ব মেধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই ঐরূপ করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা বলা বাহুল্য।

অন্য পুস্তকসকল পড়িয়া নরেন্দ্রনাথ কাল কাটাইতেন শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন, তিনি নভেল-নাটকাদি পড়িয়াই সময় নষ্ট করিতেন। এক এক সময়ে এক এক বিষয়ের পুস্তকপাঠে তাঁহার একটা প্রবল আগ্রহ আসিয়া উপস্থিত হইত। তখন ঐ বিষয়ক যত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারিতেন, সকল আয়ত্ত করিয়া লইতেন। যেমন ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার বৎসরের আরম্ভ হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাসসমূহ পড়িবার তাঁহার বিশেষ আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল এবং মার্শম্যান, এলফিন্‌ষ্টোন-প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থসকল পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন,—এফ্.এ. পড়িবার কালে ন্যায়শাস্ত্রের যত প্রকারের ইংরাজী গ্রন্থ ছিল যথা, হোয়েটলি, জেভন্‌স, মিল-প্রমুখ গ্রন্থকারগণের পুস্তকসকল একে একে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। বি.এ. পড়িবার কালে ইংলণ্ডের ও ইউরোপের সকল প্রদেশের প্রাচীন ও বর্ত্তমান ইতিহাস ও ইংরাজী দর্শনশাস্ত্রসমূহ আয়ত্ত করিবার তাঁহার একান্ত বাসনা হইয়াছিল—এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিতে হইবে।

নরেন্দ্রের পড়িবার ঝোঁক

এইরূপে বহু গ্রন্থপাঠের ফলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার কাল

হইতে শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথের দ্রুত পাঠের শক্তি বিশেষ বিকশিত হইয়াছিল। তিনি বলিতেন, "এখন হইতে কোন পুস্তক পাঠ করিতে বসিলে উহার প্রতি ছত্র পর পর পড়িয়া গ্রন্থকারের বক্তব্য বুঝিবার আমার আবশ্যক হইত না। প্রতি প্যারার প্রথম ও শেষ ছত্র পাঠ করিলেই উহার ভিতর কি বলা হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিতাম। ক্রমে ঐ শক্তি পরিণত হইয়া প্রতি প্যারাও আর পড়িবার আবশ্যক হইত না। প্রতি পৃষ্ঠার প্রথম ও শেষ চরণ পড়িয়াই বুঝিয়া ফেলিতাম; আবার পুস্তকের যেখানে গ্রন্থকার কোন বিষয় তর্ক-যুক্তির দ্বারা বুঝাইতেছেন সেখানে প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা যুক্তিবিশেষ বুঝাইতে যদি চারি-পাঁচ বা ততোধিক পৃষ্ঠা লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত যুক্তির প্রারম্ভ মাত্র পড়িয়াই ঐ পৃষ্ঠাসকল বুঝিতে পারিতাম।"

দ্রুত পাঠ করিবার শক্তি

বহু পাঠ ও গভীর চিন্তার ফলে শ্রীযুত নরেন্দ্র এই কালে বিষম তর্কপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি মিথ্যা তর্ক কখন করিতেন না, মনে জ্ঞানে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তর্কের দ্বারা সর্ব্বত্র তাহারই সমর্থন করিতেন। কিন্তু তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহার বিপরীত কোনপ্রকার ভাব বা মত কেহ তাঁহার সমক্ষে প্রকাশ করিলে তিনি চুপ করিয়া উহা কখনও শুনিয়া যাইতে পারিতেন না। কঠোর যুক্তি ও প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা বিরুদ্ধ পক্ষের মত খণ্ডন করিয়া বাদীকে নিরস্ত করিতেন। বিরল ব্যক্তিই তাঁহার যুক্তিসকলের নিকট মস্তক অবনত করিত না। আবার তর্কে পরাজিত হইয়া অনেকে যে তাঁহাকে সুনয়নে দেখিত না, এ

নরেন্দ্রের তর্কশক্তি

কথা বলা বাহুল্য। তর্ককালে বাদীর দুই-চারিটি কথা শুনিয়াই তিনি বুঝিতে পারিতেন, সে কিরূপ যুক্তিসহায়ে নিজ পক্ষ সমর্থন করিবে এবং উহার উত্তর তাঁহার মনে পূর্ব্ব হইতেই যোগাইয়া থাকিত। তর্ককালে বাদীকে নিরস্ত করিতে ঐরূপ তীক্ষ্ণ যুক্তি-প্রয়োগ তাঁহার মনে কিরূপে উদিত হয় এই কথা জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীতে কয়টা নূতন চিন্তাই বা আছে! সেই কয়টা জানা থাকিলে এবং তাহাদিগের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে কয়টা যুক্তি এপর্য্যন্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই কয়টা আয়ত্ত থাকিলে বাদীকে ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর দিবার প্রয়োজন থাকে না। কারণ বাদী যে কথা যেভাবেই সমর্থন করুক না, উহা ঐ সকলের মধ্যে পড়িবেই পড়িবে। জগৎকে কোন বিষয়ে নূতন ভাব ও চিন্তা প্রদান করিতে সমর্থ এমন ব্যক্তি বিরল জন্মগ্রহণ করেন।"

সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অদৃষ্টপূর্ব্ব মেধা ও গভীর চিন্তাশক্তি লইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ সকল বিষয় স্বল্পকালে আয়ত্ত করিয়া ফেলিতেন। সেজন্য পাঠ্যাবস্থায় তাঁহার স্বচ্ছন্দ বিহার ও বয়স্যবর্গের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিবার অবকাশের অভাব হইত না। লোকে তাঁহাকে ঐরূপে অনেককাল কাটাইতে দেখিয়া ভাবিত, তাঁহার লেখা-পড়ায় আদৌ মন নাই। ইতরসাধারণ অনেক বালক তাঁহার দেখাদেখি আমোদ-প্রমোদে কাল কাটাইতে যাইয়া কখন কখন আপনাদিগের পাঠাভ্যাসের ক্ষতি করিয়া বসিত।

জ্ঞানার্জ্জনের ন্যায় ব্যায়াম-অভ্যাসেও নরেন্দ্রনাথের বাল্যকাল হইতে অশেষ অনুরাগ ছিল। পিতা তাঁহাকে শৈশবে একটি ঘোটক কিনিয়া দিয়াছিলেন। ফলে বয়োবৃদ্ধির সহিত তিনি অশ্বচালনায়

সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন জিম্‌ন্যাষ্টিক, কুস্তি, মুদ্গরহেলন, যষ্টিক্রীড়া, অসিচালনা, সন্তরণ প্রভৃতি যে-সকল বিদ্যা শারীরিক বলের ও শক্তিপ্রয়োগকৌশলের উৎকর্ষসাধন করে, প্রায় সেই সকলেই তিনি অল্পবিস্তর পারদর্শী হইয়াছিলেন। শ্রীযুত নবগোপাল মিত্র-প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমেলায় তখন তখন পূর্ব্বোক্ত বিদ্যাসকলে প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের পারদর্শিতার পরীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক পারিতোষিক প্রদান করা হইত। আমরা শুনিয়াছি, নরেন্দ্রনাথ কখন কখন উক্ত পরীক্ষা-প্রদানেও অগ্রসর হইয়াছিলেন।

নরেন্দ্রের ব্যায়াম-অভ্যাসে অনুরাগ

বাল্যকাল হইতে নরেন্দ্রনাথের জীবনে বয়স্যপ্রীতি ও অসীম সাহসের পরিচয় পাওয়া যাইত। ছাত্রজীবনে এবং পরে তাঁহাকে দলপতি ও নেতৃত্বপদে আরূঢ় করাইতে ঐ গুণদ্বয় বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। সাত-আট বৎসর বয়সকালে একদিন বয়স্যবর্গের সহিত মিলিত হইয়া কলিকাতার দক্ষিণে মেটেবুরুজ নামক স্থলে লক্ষ্ণৌ প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব নবাব ওয়াজিদ্ আলি সাহেবের পশুশালা-সন্দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। বালকগণ আপনাদিগের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া চাঁদপাল ঘাট হইতে একখানি টাপুরে ডিঙ্গী যাতায়াতের জন্য ভাড়া করিয়াছিল। ফিরিবার কালে তাহাদিগের একজন অসুস্থ হইয়া নৌকামধ্যে বমন করিয়া ফেলিল। মুসলমান মাঝি তাহাতে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া চাঁদপাল ঘাটে নৌকা লাগাইবার পরে তাহাদিগকে বলিল, নৌকা পরিষ্কার করিয়া না দিলে তাহাদিগের কাহাকেও নামিতে দিবে না। বালকেরা তাহাকে অপরের দ্বারা উহা পরিষ্কার

বয়স্যপ্রীতি ও সাহস

করাইয়া লইতে বলিয়া উহার নিমিত্ত পারিশ্রমিক প্রদান করিতে চাহিলেও সে উহাতে সম্মত হইল না। তখন বচসা উপস্থিত হইয়া ক্রমে উভয় পক্ষে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হওয়ায়, ঘাটে যত নৌকার মাঝি ছিল সকলে মিলিত হইয়া বালকদিগকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। বালকগণ উহাতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। নরেন্দ্রনাথ তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। মাঝিদিগের সহিত বচসার গোলযোগে তিনি পাশ কাটাইয়া নৌকা হইতে নামিয়া পড়িলেন। নিতান্ত বালক দেখিয়া মাঝিরা তাঁহার ঐ কার্য্যে বাধা দিল না। তীরে দাঁড়াইয়া ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হইতেছে দেখিয়া তিনি এখন বয়স্যবর্গকে রক্ষা করিবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, দুইজন ইংরাজ সৈনিকপুরুষ ময়দানে বায়ুসেবনের জন্য অনতিদূরে রাস্তা দিয়া গমন করিতেছেন। নরেন্দ্রনাথ দ্রুতপদে তাঁহাদিগের নিকট গমন ও অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের হস্তধারণ করিলেন এবং ইংরাজী ভাষায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ হইলেও, দুই-চারিটি কথায় ও ইঙ্গিতে তাঁহাদিগকে ব্যাপারটা যথাসম্ভব বুঝাইতে বুঝাইতে ঘটনাস্থলে লইয়া যাইবার জন্য আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রিয়দর্শন অল্পবয়স্ক বালকের ঐরূপ কার্য্যে সদাশয় সৈনিকদ্বয়ের হৃদয় মুগ্ধ হইল। তাঁহারা অবিলম্বে নৌকাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া সমস্ত কথা বুঝিতে পারিলেন এবং হস্তস্থিত বেত্র উঠাইয়া বালকদিগকে ছাড়িয়া দিবার জন্য মাঝিকে আদেশ করিলেন। পল্টনের গোরা দেখিয়া মাঝিরা ভয়ে যে যাহার নৌকায় সরিয়া পড়িল এবং নরেন্দ্রনাথের বয়স্যবর্গও অব্যাহতি পাইল। নরেন্দ্রনাথের ব্যবহারে সৈনিকদ্বয় সেদিন তাঁহার

উপর প্রীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের সহিত তাঁহাকে থিয়েটার দেখিতে যাইতে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ উহাতে সম্মত না হইয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ-হৃদয়ে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কৌশলে 'সিরাপিস' নামক রণতরী-দর্শনের অনুজ্ঞালাভ

বাল্যজীবনের অন্যান্য ঘটনাও নরেন্দ্রনাথের অশেষ সাহসের পরিচয় প্রদান করে। ঐরূপ দুই-একটির এখানে উল্লেখ করা প্রসঙ্গ-বিরুদ্ধ হইবে না। ভূতপূর্ব্ব ভারত-সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড যে বৎসর 'প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্স্'-রূপে ভারতপরিভ্রমণে আগমন করেন, সেই বৎসর নরেন্দ্রনাথের বয়ঃক্রম দশ-বার বৎসর ছিল। বৃটিশ-রাজের 'সিরাপিস' নামক একখানি বৃহৎ রণতরী ঐ সময়ে কলিকাতায় আসিয়াছিল এবং আদেশপত্র গ্রহণপূর্ব্বক কলিকাতার বহু ব্যক্তি ঐ তরীর অভ্যন্তর দেখিতে গিয়াছিল। বালক নরেন্দ্রনাথ বয়স্যবর্গের সহিত উহা দেখিতে অভিলাষী হইয়া আদেশপত্র পাইবার আশায় একখানি আবেদন লিখিয়া চৌরঙ্গীর আফিসগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দ্বাররক্ষক বিশেষ বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন আবেদনকারীকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিতেছে না। তখন অনতিদূরে দণ্ডায়মান হইয়া সাহেবের সহিত দেখা করিবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে তিনি, যাঁহারা ভিতরে যাইয়া আদেশপত্র লইয়া ফিরিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাঁহারা সকলেই উক্ত আফিসের ত্রিতলের এক বারাণ্ডায় গমন করিতেছেন। নরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, ঐখানেই বুঝি সাহেব আবেদন গ্রহণপূর্ব্বক আদেশপত্র দিতেছেন।

তখন ঐস্থানে গমন করিবার অন্য কোন পথ আছে কি না অনুসন্ধান করিতে করিতে তিনি দেখিতে পাইলেন, উক্ত বারাণ্ডার পশ্চাতের ঘরে সাহেবের পরিচারকদিগের যাইবার জন্য বাটীর অন্যদিকে এক-পার্শ্বে একটি অপ্রশস্ত লৌহময় সোপান রহিয়াছে। কেহ দেখিতে পাইলে লাঞ্ছিত হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়াও তিনি সাহসে নির্ভর করিয়া তদবলম্বনে ত্রিতলে উঠিয়া যাইলেন এবং সাহেবের গৃহের ভিতর দিয়া বারাণ্ডায় প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, সাহেবের চারিদিকে আবেদনকারীরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন এবং সাহেব সম্মুখস্থ টেবিলে মাথা হেঁট করিয়া ক্রমাগত আদেশপত্রসকলে সহি করিয়া যাইতেছেন। তিনি তখন সকলের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন এবং যথাকালে আদেশপত্র পাইয়া সাহেবকে অভিবাদন করিয়া অন্য সকলের ন্যায় সম্মুখের সিঁড়ি দিয়া আফিসের বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

শিমলা-পল্লীর বালকদিগকে ব্যায়ামশিক্ষা দিবার জন্য তখন কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের উপরে একটি জিম্ন্যাষ্টিকের আখড়া ছিল।

আখড়ায় ট্রাপিজ খাটাইবার কালে বিভ্রাট

হিন্দুমেলা-প্রবর্ত্তক শ্রীযুত নবগোপাল মিত্রই উহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বাটীর অতি সন্নিকটে থাকায় নরেন্দ্রনাথ বয়স্যবর্গের সহিত ঐ স্থানে নিত্য আগমনপূর্ব্বক ব্যায়াম অভ্যাস করিতেন। পাড়ার লোক নবগোপাল বাবুর সহিত পূর্ব্ব হইতে পরিচয় থাকায় তাঁহা-দিগের উপরেই তিনি আখড়ার কার্য্যভার প্রদান করিয়াছিলেন। আখড়ায় একদিন ট্রাপিজ (দোল্না) খাটাইবার জন্য বালকেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও উহার গুরুভার দারুময় ফ্রেম খাড়া করিতে

পারিতেছিল না। বালকদিগের ঐ কার্য্য দেখিতে রাস্তায় লোকের ভিড় হইয়াছিল; কিন্তু কেহই তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেছিল না। জনতার মধ্যে একজন বলবান ইংরাজ 'সেলার'-কে দণ্ডায়মান দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ সাহায্য করিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিলেন। সেও তাহাতে সানন্দে সম্মত হইয়া বালকদিগের সহিত যোগদান করিল। তখন দড়ি বাঁধিয়া বালকেরা ট্রাপিজের শীর্ষদেশ টানিয়া উত্তোলন করিতে লাগিল এবং সাহেব পদদ্বয় গর্ত্তমধ্যে ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট করাইতে সহায়তা করিতে লাগিল। ঐরূপে কার্য্য বেশ অগ্রসর হইতেছে, এমন সময় দড়ি ছিঁড়িয়া ট্রাপিজের দারুময় শরীর পুনরায় ভূতলশায়ী হইল এবং উহার এক পদ সহসা উঠিয়া পড়ায় সাহেবের কপালে বিষম আঘাত লাগিয়া সে প্রায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেল। সাহেবকে অচৈতন্য ও তাহার ক্ষতস্থান হইতে অনর্গল রুধিরস্রাব হইতেছে দেখিয়া সকলে তাহাকে মৃত স্থির করিয়া পুলিস-হাঙ্গামার ভয়ে যে যে দিকে পারিল পলায়ন করিল। কেবল নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার দুই-এক জন বিশেষ ঘনিষ্ঠ সঙ্গী মাত্রই ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায়-উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ নিজের বস্ত্র ছিন্ন ও আর্দ্র করিয়া সাহেবের ক্ষতস্থানে বাঁধিয়া দিলেন এবং তাহার মুখে জলসেচন ও ব্যজন করিয়া তাহার চৈতন্যসম্পাদনে যত্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সাহেবের চৈতন্য হইলে তাহাকে ধরাধরি করিয়া সম্মুখস্থ 'ট্রেনিং একাডেমি' নামক স্কুলগৃহের অভ্যন্তরে লইয়া যাইয়া শয়ন করাইয়া, নবগোপালবাবুকে শীঘ্র একজন ডাক্তার লইয়া আসিবার নিমিত্ত

সংবাদ প্রেরিত হইল। ডাক্তার আসিলেন এবং পরীক্ষা করিয়া বলিলেন আঘাত সাংঘাতিক নহে, এক সপ্তাহের শুশ্রূষায় সাহেব আরোগ্য হইবে। নরেন্দ্রনাথের শুশ্রূষায় এবং ঔষধ ও পথ্যাদির সহায়ে সাহেব ঐ কালের মধ্যেই সুস্থ হইল। তখন পল্লীর কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকটে চাঁদা সংগ্রহপূর্ব্বক সাহেবকে কিঞ্চিৎ পাথেয় দিয়া নরেন্দ্রনাথ বিদায় করিলেন। ঐরূপ বিপদে পড়িয়া অবিচলিত থাকা সম্বন্ধে অনেকগুলি ঘটনা আমরা নরেন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে শ্রবণ করিয়াছি।

নরেন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা

বাল্যকাল হইতেই শ্রীযুত নরেন্দ্র সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। যৌবনে পদার্পণ করিয়া তাঁহার উক্ত নিষ্ঠা বিশেষ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি বলিতেন, “মিথ্যা কথা হইবে বলিয়া ছেলেদের কখনও জুজুর ভয় দেখাই নাই, এবং বাটীতে কেহ ঐরূপ করিতেছে দেখিলে তাহাকে বিষম তিরস্কার করিতাম। ইংরাজি পড়িয়া এবং ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াতের ফলে বাচনিক সত্যনিষ্ঠা তখন এতদূর বাড়িয়া গিয়াছিল।”

নির্দ্দোষ আনন্দপ্রিয়তা

সুদৃঢ় শরীর, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অদ্ভুত মেধা ও পবিত্রতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া নরেন্দ্রনাথকে নিয়ত সদানন্দে থাকিতে দেখা যাইত। ব্যায়াম, সঙ্গীত, বাদ্য ও নৃত্যশিক্ষা, বয়স্তবর্গের সহিত নির্দ্দোষ রঙ্গ-পরিহাস প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ব্যাপারেই তিনি নিঃসঙ্কোচে অগ্রসর হইতেন। বাহিরের লোকে তাঁহার ঐরূপ আনন্দের কারণ বুঝিতে না পারিয়া অনেক সময়ে তাঁহার চরিত্রে দোষকল্পনা করিয়া বসিত। তেজস্বী নরেন্দ্রনাথ কিন্তু লোকের প্রশংসা বা নিন্দায় কখনও

ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। লোকের অযথা নিন্দাবাদকে অপ্রমাণিত করিতে তাঁহার গর্ব্বিত হৃদয় কখনও নিজ মস্তক নত করিত না।

দরিদ্রের প্রতি দয়া করা নরেন্দ্রনাথের আজীবন স্বভাবসিদ্ধ ছিল। তাঁহার শৈশবকালে বাটীতে ভিক্ষুক আসিয়া বস্ত্র, তৈজসাদি যাহা চাহিত, তিনি তাহাকে তাহাই প্রদান করিয়া বসিতেন। বাটীর লোকেরা উহা জানিতে পারিয়া বালককে তিরস্কার করিতেন এবং ভিক্ষুককে পয়সা দিয়া ঐসকল ছাড়াইয়া লইতেন। কয়েকবার ঐরূপ হওয়ায় মাতা একদিন বালক নরেন্দ্রকে বাটীর দ্বিতলে গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। জনৈক ভিক্ষুক ঐসময়ে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষার জন্য উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা জ্ঞাপন করায় বালক গবাক্ষ দিয়া তাঁহার মাতার কয়েকখানি উত্তম বস্ত্র তাহাকে প্রদান করিয়া বসিয়াছিল।

দরিদ্রের প্রতি নরেন্দ্রনাথের দয়া

মাতা বলিতেন, "শৈশবকাল হইতে নরেন্দ্রের একটা বড় দোষ ছিল। কোন কারণে যদি কখনও তাহার ক্রোধ উপস্থিত হইত, তাহা হইলে সে যেন একেবারে আত্মহারা হইয়া যাইত এবং বাটীর আসবাবপত্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তছনছ করিত। পুত্রকামনায় কাশীধামে ৺বীরেশ্বরের নিকট বিশেষ মানত করিয়াছিলাম। ৺বীরেশ্বর বোধ হয় তাঁহার একটা ভূতকে পাঠাইয়া দিয়াছেন! না হইলে ক্রোধ হইলে সে অমন ভূতের মত অশান্ত ব্যবহার করে কেন?" বালকের ঐরূপ ক্রোধের তিনি চমৎকার ঔষধও বাহির করিয়াছিলেন। যখন দেখিতেন, তাহাকে কোনমতে শান্ত করিতে পারিতেছেন না, তখন ৺বীরেশ্বরকে স্মরণ করিয়া শীতল জল দুই-এক ঘড়া তাহার মাথায়

নরেন্দ্রের ক্রোধ

ঢালিয়া দিতেন। বালকের ক্রোধ উহাতে এককালে প্রশমিত হইত। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সহিত মিলিত হইবার কিছুকাল পরে নরেন্দ্রনাথ একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিতে আসিয়া আর কিছু না হউক, ক্রোধটা তাঁহার (ঈশ্বরের) কৃপায় আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি। পূর্ব্বে ক্রুদ্ধ হইলে একেবারে আত্মহারা হইয়া যাইতাম এবং পরে উহার জন্য অনুতাপে দগ্ধ হইতাম। এখন কেহ নিষ্কারণে প্রহার করিলে অথবা নিতান্ত অপকার করিলেও তাহার উপর পূর্ব্বের ন্যায় বিষম ক্রোধ উপস্থিত হয় না।"

নরেন্দ্রের মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সমসমান উৎকর্ষ

মস্তিষ্ক ও হৃদয় উভয়ের সমসমান উৎকর্ষপ্রাপ্তি সংসারে বিরল লোকের দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহাদের ঐরূপ হয় তাঁহারাই মনুষ্য-সমাজে কোন না কোন বিষয়ে নিজ মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। আবার আধ্যাত্মিক জগতে যাঁহারা নিজ অসাধারণত্ব সপ্রমাণ করিয়া যান, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সহিত কল্পনাশক্তির প্রবৃদ্ধিও বাল্যকাল হইতে তাঁহাদিগের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। নরেন্দ্রনাথের জীবনালোচনায় পূর্ব্বোক্ত কথা সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। ঐ বিষয়ের একটি দৃষ্টান্তের এখানে উল্লেখ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

নরেন্দ্রনাথের পিতা এক সময়ে বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের রায়পুর নামক স্থানে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। অধিককাল তথায় থাকিতে হইবে বুঝিয়া নিজ পরিবারবর্গকে তিনি কিছুকাল পরে ঐ স্থানে আনাইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার ভার ঐকালে নরেন্দ্রনাথের উপরই অর্পিত হইয়াছিল।

নরেন্দ্রের বয়স তখন চৌদ্দ-পনর বৎসর মাত্র ছিল। ভারতের মধ্যপ্রদেশে তখন রেল হয় নাই, সুতরাং রায়পুরে যাইতে হইলে শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়া একপক্ষেরও অধিককাল গো-যানে করিয়া যাইতে হইত। ঐরূপে অশেষ শারীরিক কষ্টভোগ করিতে হইলেও নরেন্দ্রনাথ বলিতেন, বনস্থলীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-দর্শনে উক্ত কষ্টকে কষ্ট বলিয়াই তাঁহার মনে হয় নাই এবং অযাচিত হইয়াও যিনি ধরিত্রীকে ঐরূপ অনুপম বেশভূষায় সাজাইয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার অসীম শক্তি ও অনন্ত প্রেমের সাক্ষাৎ পরিচয় প্রথম প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার হৃদয় মুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি বলিতেন, "বনমধ্যগত পথ দিয়া যাইতে যাইতে ঐ কালে যাহা দেখিয়াছি ও অনুভব করিয়াছি, তাহা স্মৃতি-পত্রে চিরকালের জন্য দৃঢ়মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ একদিনের কথা। উন্নতশীর্ষ বিন্ধ্যগিরির পাদদেশ দিয়া সেদিন আমাদিগকে যাইতে হইয়াছিল। পথের দুই পার্শ্বেই গিরিশৃঙ্গসকল গগনস্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান; নানাজাতীয় বৃক্ষ-লতা ফল-পুষ্প-সম্ভারে অবনত হইয়া পর্ব্বত-পৃষ্ঠের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়া রহিয়াছে; মধুর কাকলিতে দিক্ পূর্ণ করিয়া নানাবর্ণের বিহগকুল কুঞ্জ হইতে কুঞ্জান্তরে গমন, অথবা আহার-অন্বেষণে কখন কখন ভূমিতে অবতরণ করিতেছে—ঐ সকল বিষয় দেখিতে দেখিতে মনে একটা অপূর্ব্ব শান্তি অনুভব করিতেছিলাম। ধীর-মন্থর গতিতে চলিতে চলিতে গো-যানসকল ক্রমে ক্রমে এমন একস্থলে উপস্থিত হইল যেখানে পর্ব্বতশৃঙ্গদ্বয় যেন প্রেমে অগ্রসর হইয়া বনপথকে

নরেন্দ্রের প্রথম ধ্যানতন্ময়তা—রায়পুর যাইবার পথে

এককালে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। তখন তাহাদিগের পৃষ্ঠদেশ বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া দেখি, এক পার্শ্বের পর্ব্বতগাত্রে মস্তক হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি সুবৃহৎ ফাট রহিয়াছে এবং ঐ অন্তরালকে পূর্ণ করিয়া মক্ষিকাকুলের যুগযুগান্তর পরিশ্রমের নিদর্শন-স্বরূপ একখানি প্রকাণ্ড মধুচক্র লম্বিত রহিয়াছে! তখন বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া সেই মক্ষিকা-রাজ্যের আদি-অন্তের কথা ভাবিতে ভাবিতে মন ত্রিজগৎ-নিয়ন্তা ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির উপলব্ধিতে এমন ভাবে তলাইয়া গেল যে, কিছুকালের নিমিত্ত বাহ্যসংজ্ঞার এককালে লোপ হইল। কতক্ষণ ঐ ভাবে গো-যানে পড়িয়াছিলাম, স্মরণ হয় না। যখন পুনরায় চেতনা হইল তখন দেখিলাম, উক্ত স্থান অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। গো-যানে একাকী ছিলাম বলিয়া ঐ কথা কেহ জানিতে পারে নাই। প্রবল কল্পনাসহায়ে ধ্যানের রাজ্যে আরূঢ় হইয়া এককালে তন্ময় হইয়া যাওয়া নরেন্দ্রনাথের জীবনে বোধ হয় ইহাই প্রথম।

নরেন্দ্রনাথের পিতৃপরিচয় সংক্ষেপে প্রদানপূর্ব্বক আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বহুশাখায় বিভক্ত শিমলার দত্ত-পরিবারেরা কলিকাতার প্রাচীন বংশসকলের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ধনে, মানে এবং বিদ্যাগৌরবে এই বংশ মধ্যবিত্ত কায়স্থ-গৃহস্থদিগের অগ্রণী ছিল।

নরেন্দ্রের সন্ন্যাসী পিতামহ

নরেন্দ্রনাথের প্রপিতামহ শ্রীযুক্ত রামমোহন দত্ত ওকালতী করিয়া বেশ উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছিলেন এবং বহুগোষ্ঠীপরিবৃত হইয়া শিমলার গৌরমোহন মুখার্জ্জির লেনস্থ নিজ ভবনে সসম্মানে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র দুর্গাচরণ পিতার বিপুল সম্পত্তির

অধিকারী হইয়াও স্বল্পবয়সে সংসারে বীতরাগ হইয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। শুনা যায়, বাল্যকাল হইতেই শ্রীযুত দুর্গাচরণ সাধু-সন্ন্যাসি-ভক্ত ছিলেন। যৌবনে পদার্পণ করিয়া অবধি পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তি তাঁহাকে শাস্ত্র-অধ্যয়নে নিযুক্ত রাখিয়া স্বল্পকালে সুপণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল। বিবাহ করিলেও দুর্গাচরণের সংসারে আসক্তি ছিল না। নিজ উদ্যানে সাধুসঙ্গেই তাঁহার অনেক কাল অতিবাহিত হইত। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, তাঁহার পিতামহ শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষাপূর্ব্বক পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিবার স্বল্পকাল পরেই চিরদিনের মত গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। সংসার পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেও বিধাতার নির্ব্বন্ধে শ্রীযুত দুর্গাচরণ নিজ সহধর্ম্মিণী ও আত্মীয়বর্গের সহিত দুইবার স্বল্পকালের জন্য মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বিশ্বনাথ যখন দুই-তিন বৎসরের হইবে, তখন তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও আত্মীয়বর্গ বোধ হয় তাঁহারই অন্বেষণে ৺কাশীধামে গমনপূর্ব্বক কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। রেলপথ না থাকায় সম্ভ্রান্তবংশীয়েরা তখন নৌকাযোগেই কাশীতে আসিতেন। দুর্গাচরণের সহধর্ম্মিণীও ঐরূপ করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে শিশু বিশ্বনাথ এক স্থানে নৌকা হইতে জলে পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার মাতাই উহা সর্ব্বাগ্রে দর্শন করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে ঝম্ফপ্রদান করিয়াছিলেন। অশেষ চেষ্টার পরে সংজ্ঞাশূন্য মাতাকে জলগর্ভ হইতে নৌকায় উঠাইতে যাইয়া দেখা গেল, তিনি নিজ সন্তানের হস্ত তখনও দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ঐরূপে মাতার অপার স্নেহই সেইবার বিশ্বনাথের প্রাণ-রক্ষার হেতু হইয়াছিল।

কাশী পৌছিবার পরে শ্রীযুত দুর্গাচরণের সহধর্ম্মিণী নিত্য

৺বিশ্বনাথ-দর্শনে গমন করিতেন। বৃষ্টি হইয়া পথ পিচ্ছিল হওয়ায় একদিন শ্রীমন্দিরের সম্মুখে তিনি সহসা পড়িয়া যাইলেন। ঐ স্থান দিয়া গমন করিতে করিতে জনৈক সন্ন্যাসী উহা দেখিতে পাইয়া দ্রুতপদে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং সযত্নে উত্তোলন-পূর্ব্বক তাঁহাকে মন্দিরের সোপানে বসাইয়া শরীরের কোন স্থানে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে কি না পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু চারি চক্ষের মিলন হইবামাত্র দুর্গাচরণ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিলেন এবং সন্ন্যাসী দুর্গাচরণ দ্বিতীয়বার তাঁহার দিকে না দেখিয়া দ্রুতপদে তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

শাস্ত্রে বিধি আছে, প্রব্রজ্যাগ্রহণের দ্বাদশ বৎসর পরে সন্ন্যাসী ব্যক্তি 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' নিজ জন্মভূমি সন্দর্শন করিবেন। শ্রীযুত দুর্গাচরণ ঐ জন্য দ্বাদশ বৎসর পরে একবার কলিকাতায় আগমন-পূর্ব্বক জনৈক পূর্ব্ববন্ধুর ভবনে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন—যাহাতে তাঁহার আগমনবার্ত্তা তাঁহার আত্মীয়বর্গের মধ্যে প্রচারিত না হয়। সংসারী বন্ধু সন্ন্যাসী দুর্গাচরণের ঐ অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া গোপনে তাঁহার আত্মীয়দিগকে ঐ সংবাদ প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহারা সদলবলে আসিয়া একপ্রকার জোর করিয়া শ্রীযুত দুর্গাচরণকে বাটীতে লইয়া যাইলেন। দুর্গাচরণ ঐরূপে বাটীতে যাইলেন বটে, কিন্তু কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক স্থাণুর ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া চক্ষু নিমীলিত করিয়া গৃহমধ্যে এক কোণে বসিয়া রহিলেন। শুনা যায়, একাদিক্রমে তিন অহোরাত্র তিনি

ঐরূপে একাসনে বসিয়াছিলেন। তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করিবেন ভাবিয়া তাঁহার আত্মীয়বর্গ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং গৃহদ্বার পূর্ব্বের ন্যায় রুদ্ধ না রাখিয়া উন্মুক্ত করিয়া রাখিলেন। পরদিন দেখা গেল, সন্ন্যাসী দুর্গাচরণ সকলের অলক্ষ্যে গৃহত্যাগ করিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছেন।

নরেন্দ্রের পিতা বিশ্বনাথ

শ্রীযুত দুর্গাচরণের পুত্র বিশ্বনাথ বয়োবৃদ্ধির সহিত ফার্সি ও ইংরাজীতে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভপূর্ব্বক কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণি হইয়াছিলেন। তিনি দানশীল ও বন্ধুবৎসল ছিলেন এবং বেশ উপার্জ্জন করিলেও কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। পিতৃধর্ম্ম পুত্রে অনুগত হইয়াই বোধ হয় তাঁহাকে সঞ্চয়ী ও মিতব্যয়ী হইতে দেয় নাই। বাস্তবিক, অনেক বিষয়েই বিশ্বনাথের স্বভাব সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় ছিল না। তিনি কল্যকার ভাবনায় কখন ব্যস্ত হইতেন না, পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়াই সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেন, স্নেহপরায়ণ হইলেও বিদেশে দূরে অবস্থানকালে অনেকদিন পর্য্যন্ত আত্মীয়-পরিজনের কিছুমাত্র সংবাদ না লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন—ঐরূপ অনেক বিষয় তাঁহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে।

বিশ্বনাথের সঙ্গীত-প্রিয়তা

শ্রীযুত বিশ্বনাথ বুদ্ধিমান্ ও মেধাবী ছিলেন। সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, তাঁহার পিতা সুকণ্ঠ ছিলেন এবং রীতিমত শিক্ষা না করিয়াও নিধুবাবুর টপ্পা প্রভৃতি সুন্দর গাহিতে পারিতেন। সঙ্গীতচর্চ্চাকে নির্দ্দোষ আমোদ বলিয়া ধারণা ছিল বলিয়াই তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্রনাথকে

বিদ্যার্জ্জনের সহিত সঙ্গীত শিখিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী ভুবনেশ্বরীও বৈষ্ণব ভিক্ষুক ও রাতভিখারীসকলের ভজনগান একবারমাত্র শ্রবণ করিয়াই সুর-তাল-লয়ের সহিত সম্যক্ আয়ত্ত করিতে পারিতেন।

খৃষ্টান-পুরাণ বাইবেলপাঠে এবং ফার্সি-কবি হাফেজের বয়েৎ-সকল আবৃত্তি করিতে শ্রীযুত বিশ্বনাথের বিশেষ প্রীতি ছিল।

বিশ্বনাথের মুসলমানী আচার-ব্যবহার

মহামহিম ঈশার পুণ্যচরিতের দুই-এক অধ্যায় তাঁহার নিতপাঠ্য ছিল এবং উহার ও হাফেজের প্রেমগর্ভ কবিতাসকলের কিছু কিছু তিনি নিজ স্ত্রীপুত্রদিগকে কখন কখন শ্রবণ করাইতেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লক্ষ্ণৌ, লাহোর প্রভৃতি মুসলমান-প্রধান স্থানসকলে কিছুকাল বাস করিয়া তিনি মুসলমানদিগের আচার-ব্যবহারের কিছু-কিছুর প্রতি অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিলেন। নিত্য পলান্নভোজন করার প্রথা বোধ হয় ঐরূপেই তাঁহার পরিবার-মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিল।

বিশ্বনাথের রঙ্গরস-প্রিয়তা

শ্রীযুত বিশ্বনাথ একদিকে যেমন ধীর গম্ভীর ছিলেন, আবার তেমনি রঙ্গপ্রিয় ছিলেন। পুত্রকন্যার মধ্যে কেহ কখন অন্যায় আচরণ করিলে তিনি তাহাকে কঠোর বাক্যে শাসন না করিয়া তাহার ঐরূপ আচরণের কথা তাহার বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট এমনভাবে প্রচার করাইয়া দিতেন, যাহাতে সে আপনিই লজ্জিত হইয়া আর কখনও ঐরূপ করিত না। দৃষ্টান্তস্বরূপে একটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্রনাথ একদিন

কোন বিষয় লইয়া মাতার সহিত বচসা করিয়া তাঁহাকে দুই-একটি কটু কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীযুত বিশ্বনাথ তাঁহাকে ঐজন্য কিছুমাত্র তিরস্কার না করিয়া যে গৃহে নরেন্দ্র তাঁহার বয়স্যবর্গের সহিত উঠা-বসা করিতেন, তাহার দ্বারের উপরিভাগে একখণ্ড কয়লা দ্বারা বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছিলেন—'নরেনবাবু তাঁহার মাতাকে অদ্য এই সকল কথা বলিয়াছেন।' নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার বয়স্যবর্গ ঐ গৃহে প্রবেশ করিতে যাইলেই ঐ কথাগুলি তাঁহাদের চক্ষে পড়িত এবং নরেন্দ্র উহাতে অনেকদিন পর্য্যন্ত নিজ অপরাধের জন্য বিষম সঙ্কোচ অনুভব করিতেন।

শ্রীযুত বিশ্বনাথ বহু আত্মীয়কে প্রতিপালন করিতেন। অন্নদানে তিনি সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। দূরসম্পর্কীয় কেহ কেহ তাঁহার অন্নে জীবনধারণ করিয়া আলস্যে কাল কাটাইত, কেহ কেহ আবার নেশা-ভাঙ্গ খাইয়া জীবনের অবসাদ দূর করিত। নরেন্দ্রনাথ বড় হইয়া ঐ সকল অযোগ্য ব্যক্তিকে দানের জন্য পিতাকে অনেক সময় অনুযোগ করিতেন। শ্রীযুত বিশ্বনাথ তাহাতে বলিতেন, "মনুষ্যজীবন যে কতদূর দুঃখময় তাহা তুই এখন কি বুঝিবি? যখন বুঝিতে পারিবি, তখন ঐ দুঃখের হস্ত হইতে ক্ষণিক মুক্তির জন্য যাহারা নেশা-ভাঙ্গ করে, তাহাদিগকে পর্য্যন্ত দয়ার চক্ষে দেখিতে পারিবি!"

বিশ্বনাথের দানশীলতা

বিশ্বনাথের অনেকগুলি পুত্র-কন্যা হইয়াছিল। তাহারা সকলেই অশেষ সদ্‌গুণসম্পন্ন ছিল। কন্যাগুলির অনেকেই কিন্তু দীর্ঘজীবন লাভ করে নাই। তিন-চারি কন্যার পরে নরেন্দ্রনাথের জন্ম হওয়ায় তিনি পিতামাতার বিশেষ প্রিয়

বিশ্বনাথের মৃত্যু

হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের শীতকালে নরেন্দ্রনাথ যখন বি.এ. পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন তাঁহার পিতা সহসা হৃদ্‌রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।[১] তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার স্ত্রীপুত্রেরা এককালে নিঃস্ব অবস্থায় পতিত হইয়াছিল।

নরেন্দ্রের মাতা

নরেন্দ্রনাথের মাতা শ্রীমতী ভুবনেশ্বরীর মহত্ত্ব-সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি কেবলমাত্র সুরূপা এবং দেবভক্তি-পরায়ণা ছিলেন না, কিন্তু বিশেষ বুদ্ধিমতী এবং কার্য্যকুশলা ছিলেন। তাঁহার পতির সুবৃহৎ সংসারের সমস্ত কার্য্যের ভার তাঁহার উপরেই ন্যস্ত ছিল। শুনা যায়, তিনি অবলীলাক্রমে উহার সুচারু বন্দোবস্ত করিয়া বয়নাদি শিল্পকার্য্য সম্পন্ন করিবার মত অবসর করিয়া লইতেন। রামায়ণ-মহাভারতাদি ধর্ম্মগ্রন্থ-পাঠ ভিন্ন তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা অধিকদূর অগ্রসর না হইলেও, নিজ স্বামী ও পুত্রাদির নিকট হইতে তিনি অনেক বিষয় মুখে মুখে এমন শিখিয়া লইয়াছিলেন যে, তাঁহার সহিত কথা কহিলে তাঁহাকে শিক্ষিতা বলিয়া মনে হইত। তাঁহার স্মৃতি ও ধারণাশক্তি বিশেষ প্রবল ছিল। একবার মাত্র শুনিয়াই তিনি কোন বিষয় আবৃত্তি করিতে পারিতেন এবং বহুপূর্ব্বের কথা ও বিষয়সকল তাঁহার কল্য-সংঘটিত ব্যাপারসকলের ন্যায় স্মরণ থাকিত। স্বামীর মৃত্যুর পরে দারিদ্র্যে পতিতা হইয়া তাঁহার ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণরাজি বিশেষ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল! সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া যিনি প্রতিমাসে সংসার পরিচালনা করিতেন, সেই তাঁহাকে তখন মাসিক ত্রিশ টাকায় আপনার ও নিজ পুত্রগণের ভরণপোষণ

---

১ পিতার মৃত্যু বি.এ. পরীক্ষার পরে হয়। অষ্টম অধ্যায়ের ৭ম প্যারা দ্রঃ।

নির্ব্বাহ করিতে হইত। কিন্তু তাহাতেও তাঁহাকে একদিনের নিমিত্ত বিষণ্ণ দেখা যাইত না। ঐ অল্প আয়েই তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারের সকল বন্দোবস্ত এমনভাবে সম্পন্ন করিতেন যে, লোকে দেখিয়া তাঁহার মাসিক ব্যয় অনেক অধিক বলিয়া মনে করিত। বাস্তবিক, পতির সহসা মৃত্যুতে শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী তখন কিরূপ ভীষণ অবস্থায় পতিতা হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে হৃদয় অবসন্ন হয়। সংসার-নির্ব্বাহের কোনরূপ নিশ্চিত আয় নাই—অথচ তাঁহার সুখপালিতা বৃদ্ধা মাতা ও পুত্রসকলের ভরণপোষণ এবং বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত কোনরূপে নির্ব্বাহ করিতে হইবে—তাঁহার পতির সহায়ে যে-সকল আত্মীয়গণ বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতেছিলেন তাঁহারা সাহায্য করা দূরে থাকুক, সময় পাইয়া তাঁহার ন্যায্য অধিকারসকলেরও লোপসাধনে কৃতসঙ্কল্প—তাঁহার অশেষসদ্‌গুণসম্পন্ন জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্র-নাথ নানাপ্রকারে চেষ্টা করিয়াও অর্থকর কোনরূপ কাজকর্ম্মের সন্ধান পাইতেছেন না এবং সংসারের উপর বীতরাগ হইয়া চিরকালের নিমিত্ত উহা ত্যাগের দিকে অগ্রসর হইতেছেন—ঐরূপ ভীষণ অবস্থায় পতিতা হইয়াও শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী যেরূপ ধীরস্থির-ভাবে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া তাঁহার উপর ভক্তি-শ্রদ্ধার স্বতঃই উদয় হয়। ঠাকুরের সহিত নরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের আলোচনায় আমাদিগকে পরে পাঠকের সম্মুখে তাঁহার এইকালের পারিবারিক অভাব প্রভৃতির কথার উত্থাপন করিতে হইবে। সেজন্য এখানে ঐ বিষয় বিবৃত করিতে আর অধিকদূর অগ্রসর না হইয়া আমরা তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে দ্বিতীয়বার আগমনের কথা এখন পাঠককে বলিতে প্রবৃত্ত হই।

চতুর্থ অধ্যায়

নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আগমন

যথার্থপুরুষকারসম্পন্ন স্থিরলক্ষ্যবিশিষ্ট পুরুষসকলে অপরের মহত্ত্বের পরিচয় পাইলে মুক্তকণ্ঠে উহা স্বীকারপূর্ব্বক প্রাণে অপূর্ব্ব উল্লাস অনুভব করিতে থাকেন। আবার সেই মহত্ত্ব যদি কখন কাহারও মধ্যে অদৃষ্টপূর্ব্ব অভাবনীয়রূপে প্রকাশিত দেখেন তবে তচ্চিন্তায় মগ্ন হইয়া তাঁহাদিগের মন কিছুকালের জন্য মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। ঐরূপ হইলেও কিন্তু ঐ ঘটনা তাঁহাদিগকে নিজ গন্তব্যপথ হইতে বিচলিত করিয়া ঐ পুরুষের অনুকরণে কখন প্রবৃত্ত করে না। অথবা বহুকালব্যাপী সঙ্গ, সাহচর্য্য ও প্রেমবন্ধন ব্যতীত তাঁহাদিগের জীবনের কার্য্যকলাপ ঐ পুরুষের বর্ণে সহসা রঞ্জিত হইয়া উঠে না।

যথার্থ ঈশ্বর-প্রেমিক বলিয়া ধারণা করিয়াও নরেন্দ্রের দ্বিতীয়বার ঠাকুরের নিকটে আসিতে বিলম্ব করিবার কারণ

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের প্রথম দর্শনলাভ করিয়া নরেন্দ্রনাথেরও ঠিক ঐরূপ অবস্থা হইয়াছিল। ঠাকুরের অপূর্ব্ব ত্যাগ এবং মন ও মুখের একান্ত ঐক্যদর্শনে মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট হইলেও নরেন্দ্রের হৃদয় জীবনের আদর্শরূপে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে সহসা সম্মত হয় নাই। সুতরাং বাটীতে ফিরিবার পরে তাঁহার মনে ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ব চরিত্র ও আচরণ কয়েকদিন ধরিয়া পুনঃ পুনঃ উদিত হইলেও নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিতে তাঁহার নিকটে পুনরায় গমনের কথা তিনি দূর ভবিষ্যতের গর্ভে ঠেলিয়া রাখিয়া আপন কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ করিয়া-

ছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ঠাকুরকে অর্দ্ধোন্মাদ বলিয়া ধারণা করাই যে তাঁহাকে ঐ বিষয়ে অনেকটা সহায়তা করিয়াছিল, একথা বুঝিতে পারা যায়। আবার, ধ্যানাভ্যাস এবং কলেজে পাঠ ব্যতীত নরেন্দ্র তখন নিত্য সঙ্গীত ও ব্যায়াম-চর্চ্চায় নিযুক্ত ছিলেন—তদুপরি বয়স্যবর্গের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে তাঁহাদিগকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজের অনুসরণে কলিকাতায় নানাস্থানে প্রার্থনা ও আলোচনা-সমিতিসকল গঠন করিতেছিলেন। সুতরাং সহস্রকর্ম্মে রত নরেন্দ্রনাথের মনে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার কথা কয়েক পক্ষ চাপা পড়িয়া থাকিবে, ইহাতে বিচিত্র কি? কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা ও দৈনন্দিন কর্ম্ম তাঁহাকে ঐরূপে ভুলাইয়া রাখিলেও তাঁহার স্মৃতি ও সত্যনিষ্ঠা অবসর পাইলেই তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে একাকী গমনপূর্ব্বক নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে উত্তেজিত করিতেছিল। সেইজন্যই প্রথম দর্শনের প্রায় মাসাবধিকাল পরে আমরা শ্রীযুত নরেন্দ্রকে একদিবস একাকী পদব্রজে পুনরায় দক্ষিণেশ্বরাভিমুখে গমন করিতে দেখিতে পাইয়া থাকি। উক্ত দিবসের কথা তিনি পরে এক সময়ে আমাদিগকে যেভাবে বলিয়াছিলেন, আমরা সেইভাবেই উহা এখানে পাঠককে বলিতেছি—

"দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী যে কলিকাতা হইতে এত অধিক দূরে তাহা ইতিপূর্ব্বে গাড়ী করিয়া একবারমাত্র যাইয়া বুঝিতে পারি নাই। বরাহনগরে দাশরথি সান্ন্যাল, সাতকড়ি লাহিড়ী প্রভৃতি বন্ধুদিগের নিকটে পূর্ব্ব হইতে যাতায়াত ছিল। ভাবিয়াছিলাম রাসমণির বাগান তাহাদের বাটীর নিকটেই হইবে, কিন্তু যত যাই পথ যেন আর ফুরাইতে চাহে না! যাহা হউক, জিজ্ঞাসা করিতে

করিতে কোনরূপে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিলাম এবং একেবারে ঠাকুরের গৃহে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, তিনি পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার শয্যাপার্শ্বে অবস্থিত ছোট তক্তাপোষখানির উপর একাকী আপন মনে বসিয়া আছেন—নিকটে কেহই নাই। আমাকে দেখিবামাত্র সাহ্লাদে নিকটে ডাকিয়া উহারই একপ্রান্তে বসাইলেন। বসিবার পরেই কিন্তু দেখিতে পাইলাম, তিনি যেন কেমন একপ্রকার ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন এবং অস্পষ্টস্বরে আপনা-আপনি কি বলিতে বলিতে স্থির দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে আমার দিকে সরিয়া আসিতেছেন। ভাবিলাম, পাগল বুঝি পূর্ব্ব দিনের ন্যায় আবার কোনরূপ পাগলামি করিবে। ঐরূপ ভাবিতে না ভাবিতে তিনি সহসা নিকটে আসিয়া নিজ দক্ষিণপদ আমার অঙ্গে সংস্থাপন করিলেন এবং উহার স্পর্শে মুহূর্ত্তমধ্যে আমার এক অপূর্ব্ব উপলব্ধি উপস্থিত হইল। চক্ষু চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, দেওয়ালগুলির সহিত গৃহের সমস্ত বস্তু বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় লীন হইয়া যাইতেছে এবং সমগ্র বিশ্বের সহিত আমার আমিত্ব যেন এক সর্ব্বগ্রাসী মহাশূন্যে একাকার হইতে ছুটিয়া চলিয়াছে! তখন দারুণ আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িলাম, মনে হইল—আমিত্বের নাশেই মরণ, সেই মরণ সম্মুখে—অতি নিকটে! সাম্‌লাইতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, 'ওগো, তুমি আমায় একি করলে, আমার যে বাপ-মা আছেন!' অদ্ভুত পাগল আমার ঐ কথা শুনিয়া খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং হস্তদ্বারা আমার বক্ষ

নরেন্দ্রের দ্বিতীয়বার আগমন ও ঠাকুরের প্রভাবে সহসা অদ্ভুত প্রত্যক্ষানুভূতি

স্পর্শ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 'তবে এখন থাক্, একেবারে কাজ নাই, কালে হইবে!' আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি ঐরূপে স্পর্শ করিয়া ঐ কথা বলিবামাত্র আমার সেই অপূর্ব্ব প্রত্যক্ষ এককালে অপনীত হইল; প্রকৃতিস্থ হইলাম এবং ঘরের ভিতরের ও বাহিরের পদার্থসকলকে পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থিত দেখিতে পাইলাম।

"বলিতে এত বিলম্ব হইলেও ঘটনাটি অতি অল্প সময়ের মধ্যে হইয়া গেল এবং উহার দ্বারা মনে এক যুগান্তর উপস্থিত হইল। স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এটা কি হইল? দেখিলাম ত উহা এই অদ্ভুত পুরুষের প্রভাবে সহসা উপস্থিত হইয়া সহসা লয় হইল। পুস্তকে Mesmerism (মোহিনী ইচ্ছাশক্তি-সঞ্চারণ) ও Hypnotism (সম্মোহনবিদ্যা) সম্বন্ধে পড়িয়াছিলাম। ভাবিতে লাগিলাম, উহা কি ঐরূপ কিছু একটা? কিন্তু ঐরূপ সিদ্ধান্তে প্রাণ সায় দিল না। কারণ দুর্ব্বল মনের উপরেই প্রভাব বিস্তার করিয়া প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ঐসকল অবস্থা আনয়ন করেন; কিন্তু আমি ত ঐরূপ নহি, বরং এতকাল পর্য্যন্ত বিশেষ বুদ্ধিমান ও মানসিক-বল-সম্পন্ন বলিয়া অহঙ্কার করিয়া আসিতেছি। বিশিষ্ট গুণশালী পুরুষের সঙ্গলাভপূর্ব্বক ইতরসাধারণে যেমন মোহিত এবং তাঁহার হস্তের ক্রীড়াপুত্তলিস্বরূপ হইয়া পড়ে, আমি ত ইঁহাকে দেখিয়া সেইরূপ হই নাই, বরং প্রথম হইতেই ইঁহাকে অর্দ্ধোন্মাদ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছি। তবে আমার সহসা ঐরূপ হইবার কারণ কি? ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না;

ঐরূপ প্রত্যক্ষের কারণান্বেষণে ও ভবিষ্যতে পুনরায় ঐরূপে অভিভূত না হইয়া পড়িবার জন্য নরেন্দ্রের চেষ্টা

প্রাণের ভিতর একটা বিষম গোল বাঁধিয়া রহিল। মহাকবির কথা মনে পড়িল—পৃথিবীতে ও স্বর্গে এমন অনেক তত্ত্ব আছে, মানব-বুদ্ধি-প্রসূত দর্শনশাস্ত্র যাহাদিগের স্বপ্নেও রহস্যভেদের কল্পনা করিতে পারে না। মনে করিলাম, উহাও ঐরূপ একটা; ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম, উহার কথা বুঝিতে পারা যাইবে না। সুতরাং দৃঢ় সংকল্প করিলাম, অদ্ভুত পাগল নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া আর যেন কখনও ভবিষ্যতে আমার মনের উপর আধিপত্য লাভপূর্ব্বক ঐরূপ ভাবান্তর উপস্থিত করিতে না পারে।

ঠাকুরের সম্বন্ধে নরেন্দ্রের নানা জল্পনা ও তাঁহাকে বুঝিবার সংকল্প

"আবার ভাবিতে লাগিলাম, ইচ্ছামাত্রেই এই পুরুষ যদি আমার ন্যায় প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মনের দৃঢ়সংস্কারময় গঠন ঐরূপে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া কাদার তালের মত করিয়া উহাকে আপন ভাবে ভাবিত করিতে পারেন, তবে ইঁহাকে পাগলই বা বলি কিরূপে? কিন্তু প্রথম দর্শনকালে আমাকে একান্তে লইয়া যাইয়া যেরূপে সম্বোধন করিয়াছিলেন এবং যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন সেই-সকলকে ইঁহার পাগলামির খেয়াল ভিন্ন সত্য বলিয়া কিরূপে মনে করিতে পারি? সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অদ্ভুত উপলব্ধির কারণ যেমন খুঁজিয়া পাইতাম না, শিশুর ন্যায় পবিত্র ও সরল এই পুরুষের সম্বন্ধেও কিছু একটা স্থিরনিশ্চয় করিতে পারিলাম না। বুদ্ধির উন্মেষ হওয়া পর্য্যন্ত দর্শন, অনুসন্ধান ও যুক্তিতর্কসহায়ে প্রত্যেক বস্তু ও ব্যক্তি সম্বন্ধে একটা মতামত স্থির না করিয়া কখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারি নাই, অদ্য সেই স্বভাবে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া প্রাণে একটা যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। ফলে মনে পুনরায় প্রবল

সংকল্পের উদয় হইল, যেরূপে পারি এই অদ্ভুত পুরুষের স্বভাব ও শক্তির কথা যথাযথভাবে বুঝিতে হইবেই হইবে।

"ঐরূপে নানা চিন্তা ও সংকল্পে সেদিন আমার সময় কাটিতে লাগিল। ঠাকুর কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরে যেন এক ভিন্ন ব্যক্তি হইয়া গেলেন এবং পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় নানাভাবে আমাকে আদর-যত্ন করিয়া খাওয়াইতে ও সকল বিষয়ে বহুকালের পরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। অতি প্রিয় আত্মীয় বা সখাকে বহুকাল পরে নিকটে পাইলে লোকের যেরূপ হইয়া থাকে, আমার সহিত তিনি ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। খাওয়াইয়া, কথা কহিয়া, আদর এবং রঙ্গ-পরিহাস করিয়া তাঁহার যেন আর আশ মিটিতেছিল না। তাঁহার ঐরূপ ভালবাসা ও ব্যবহারও আমার স্বল্প চিন্তার কারণ হয় নাই। ক্রমে অপরাহ্ন অতীতপ্রায় দেখিয়া আমি তাঁহার নিকটে সেদিনকার মত বিদায় যাচ্ঞা করিলাম। তিনি যেন তাহাতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়া 'আবার শীঘ্র আসিবে, বল' বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ধরিয়া বসিলেন। সুতরাং সেদিনও আমাকে পূর্ব্বের ন্যায় আসিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে বাটীতে ফিরিতে হইয়াছিল।"

নরেন্দ্রের সহিত ঠাকুরের পরিচিতের ন্যায় ব্যবহার

উহার কতদিন পরে নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে পুনরায় আগমন করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের জানা নাই। তবে ঠাকুরের ভিতরে পূর্ব্বোক্তরূপ অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইবার পরে তাঁহাকে জানিবার-বুঝিবার জন্য তাঁহার মনে প্রবল বাসনার উদয় দেখিয়া মনে হয়, এবার দক্ষিণেশ্বরে আসিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই।

উক্ত আগ্রহই তাঁহাকে যত শীঘ্র সম্ভব ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে উপস্থিত করিয়াছিল, তবে কলেজের অনুরোধে উহা সপ্তাহকাল বিলম্বে হওয়াই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কোন বিষয় অনুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি মনে একবার জাগিয়া উঠিলে নরেন্দ্রনাথের আহার-বিহার ও বিশ্রামাদির দিকে লক্ষ্য থাকিত না এবং যতক্ষণ না ঐ বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিতেন ততক্ষণ তাঁহার প্রাণে শান্তি হইত না। অতএব ঠাকুরকে জানিবার সম্বন্ধে তাঁহার মন যে এখন ঐরূপ হইবে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। আবার পাছে তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় ভাবান্তর আসিয়া উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় শ্রীযুত নরেন্দ্র যে নিজ মনকে বিশেষভাবে দৃঢ় ও সতর্ক করিয়া তৃতীয় দিবসে ঠাকুরের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন এ-কথাও বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ঘটনা কিন্তু তথাপি অভাবনীয় হইয়াছিল। ঠাকুরের ও শ্রীযুত নরেন্দ্রের নিকটে তৎসম্বন্ধে আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহাই এখন পাঠককে বলিতেছি।

নরেন্দ্রনাথের তৃতীয়বার আগমন

দক্ষিণেশ্বরে সেদিন জনতা ছিল বলিয়াই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, ঠাকুর ঐদিন নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার সহিত শ্রীযুত যদুলাল মল্লিকের পার্শ্ববর্ত্তী উদ্যানে বেড়াইতে যাইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। যদুলালের মাতা ও তিনি স্বয়ং ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি-সম্পন্ন ছিলেন এবং উদ্যানের প্রধান কর্ম্মচারীর প্রতি তাঁহাদিগের আদেশ ছিল যে, তাঁহারা উপস্থিত না থাকিলেও ঠাকুর যখনই উদ্যানে বেড়াইতে আসিবেন তখনই গঙ্গার ধারের

সমাধিস্থ ঠাকুরের স্পর্শে নরেন্দ্রের বাহ্যসংজ্ঞার লোপ

বৈঠকখানা-ঘর তাঁহার বসিবার নিমিত্ত খুলিয়া দিবে। ঐ দিবসেও ঠাকুর নরেন্দ্রের সহিত উদ্যানে ও গঙ্গাতীরে কিছুক্ষণ পরিভ্রমণ করিয়া নানা কথা কহিতে কহিতে ঐ ঘরে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। নরেন্দ্র অনতিদূরে বসিয়া ঠাকুরের উক্ত অবস্থা স্থিরভাবে লক্ষ্য করিতে-ছিলেন, এমন সময় ঠাকুর পূর্ব্বদিনের ন্যায় সহসা আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। নরেন্দ্র পূর্ব্ব হইতে সতর্ক থাকিয়াও ঐ শক্তিপূর্ণ স্পর্শে এককালে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্ব দিনের মত না হইয়া উহাতে তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা এককালে লুপ্ত হইল! কিছুক্ষণ পরে যখন তাঁহার পুনরায় চৈতন্য হইল তখন দেখিলেন, ঠাকুর তাঁহার বক্ষে হাত বুলাইয়া দিতেছেন এবং তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া মৃদুমধুর হাস্য করিতেছেন!

বাহ্যসংজ্ঞা লুপ্ত হইবার পরে শ্রীযুত নরেন্দ্রের ভিতরে সেদিন কিরূপ অনুভব উপস্থিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে তিনি আমাদিগকে কোন কথা বলেন নাই। আমরা ভাবিয়াছিলাম, বিশেষ রহস্যের কথা বলিয়া তিনি উহা আমাদিগের নিকটে প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর এক দিবস ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হইতে বুঝিতে পারিয়া-ছিলাম, নরেন্দ্রের উহা স্মরণ না থাকিবারই কথা। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—

"বাহ্যসংজ্ঞার লোপ হইলে নরেন্দ্রকে সেদিন নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—কে সে, কোথা হইতে আসিয়াছে, কেন আসিয়াছে (জন্মগ্রহণ করিয়াছে), কতদিন এখানে (পৃথিবীতে)

থাকিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেও তদবস্থায় নিজের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ঐসকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছিলাম ও ভাবিয়াছিলাম তাহার ঐ কালের উত্তরসকল তাহাই সপ্রমাণ করিয়াছিল। সে-সকল কথা বলিতে নিষেধ আছে। উহা হইতেই কিন্তু জানিয়াছি, সে (নরেন্দ্র) যেদিন জানিতে পারিবে সে কে, সেদিন আর ইহলোকে থাকিবে না, দৃঢ়সংকল্পসহায়ে যোগমার্গে তৎক্ষণাৎ শরীর পরিত্যাগ করিবে! নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ।”

ঐরূপ অবস্থা-প্রাপ্ত নরেন্দ্রকে ঠাকুরের নানা প্রশ্ন

নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে ঠাকুরের ইতিপূর্ব্বে যে-সকল দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল তাহার কিছু কিছু তিনি পরে এক সময়ে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। পাঠকের সুবিধার জন্য উহা আমরা এখানেই বলিতেছি। কারণ ঠাকুরের নিকট উক্ত দর্শনের কথা শুনিয়া মনে হইয়াছিল, নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পূর্ব্বেই তাঁহার ঐ দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল! ঠাকুর বলিয়াছিলেন—

“একদিন দেখিতেছি—মন সমাধিপথে জ্যোতির্ম্ময় বর্ত্মে উচ্চে উঠিয়া যাইতেছে। চন্দ্র-সূর্য্য-তারকামণ্ডিত স্থূলজগৎ সহজে অতিক্রম করিয়া উহা প্রথমে সূক্ষ্ম ভাবজগতে প্রবিষ্ট হইল। ঐ রাজ্যের উচ্চ উচ্চতর স্তরসমূহে উহা যতই আরোহণ করিতে লাগিল, ততই নানা দেবদেবীর ভাবঘন বিচিত্র মূর্ত্তিসমূহ পথের দুই পার্শ্বে অবস্থিত দেখিতে পাইলাম। ক্রমে উক্ত রাজ্যের চরম সীমায় উহা আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে দেখিলাম এক জ্যোতির্ম্ময় ব্যবধান (বেড়া)

নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে ঠাকুরের অদ্ভুত দর্শন

প্রসারিত থাকিয়া খণ্ড ও অখণ্ডের বাজ্যকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়া ক্রমে অখণ্ডের রাজ্যে প্রবেশ করিল, দেখিলাম সেখানে মূর্ত্তিবিশিষ্ট কেহ বা কিছুই আর নাই, দিব্য-দেহধারী দেবদেবীসকলে পর্য্যন্ত যেন এখানে প্রবেশ করিতে শঙ্কিত হইয়া বহুদূর নিম্নে নিজ নিজ অধিকার বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিতে পাইলাম দিব্যজ্যোতিঃঘনতনু সাত জন প্রবীণ ঋষি সেখানে সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। বুঝিলাম, জ্ঞান ও পুণ্যে, ত্যাগ ও প্রেমে ইঁহারা মানব ত দূরের কথা দেবদেবীকে পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়াছেন। বিস্মিত হইয়া ইঁহাদিগের মহত্ত্বের বিষয় চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে দেখি সম্মুখে অবস্থিত অখণ্ডের ঘরের ভেদমাত্রবিরহিত, সমরস জ্যোতির্ম্মণ্ডলের একাংশ ঘনীভূত হইয়া দিব্য শিশুর আকারে পরিণত হইল। ঐ দেব-শিশু ইঁহাদিগের অন্যতমের নিকটে অবতরণপূর্ব্বক নিজ অপূর্ব্ব সুললিত বাহুযুগলের দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ প্রেমে ধারণ করিল; পরে বীণানিন্দিত নিজ অমৃতময়ী বাণী দ্বারা সাদরে আহ্বানপূর্ব্বক সমাধি হইতে তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিতে অশেষ প্রযত্ন করিতে লাগিল। সুকোমল প্রেমস্পর্শে ঋষি সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইলেন এবং অর্দ্ধস্তিমিত নির্নিমেষ লোচনে সেই অপূর্ব্ব বালককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখের প্রসন্নোজ্জ্বল ভাব দেখিয়া মনে হইল, বালক যেন তাঁহার বহুকালের পূর্ব্বপরিচিত হৃদয়ের ধন। অদ্ভুত দেব-শিশু তখন অসীম আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিল, 'আমি যাইতেছি, তোমাকে আমার সহিত যাইতে হইবে।' ঋষি তাঁহার ঐরূপ অনুরোধে কোন কথা না বলিলেও তাঁহার

প্রেমপূর্ণ নয়ন তাঁহার অন্তরের সম্মতি ব্যক্ত করিল। পরে ঐরূপ সপ্রেম দৃষ্টিতে বালককে কিছুক্ষণ দেখিতে দেখিতে তিনি পুনরায় সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তখন বিস্মিত হইয়া দেখি, তাঁহারই শরীরমনের একাংশ উজ্জ্বল জ্যোতির আকারে পরিণত হইয়া বিলোমমার্গে ধরাধামে অবতরণ করিতেছে! নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র বুঝিয়াছিলাম, এ সেই ব্যক্তি।”[১]

অদ্ভুত প্রত্যক্ষের ফলে নরেন্দ্রের ঠাকুরের সম্বন্ধে ধারণা

সে যাহা হউক, ঠাকুরের অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে নরেন্দ্রের মনে দ্বিতীয়বার ঐরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হওয়াতে তিনি যে এক-কালে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন একথা বলা বাহুল্য। তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন, এই দুরতিক্রমণীয় দৈব-শক্তির নিকটে তাঁহার মন ও বুদ্ধির শক্তি কতদূর অকিঞ্চিৎকর! ঠাকুরের সম্বন্ধে তাঁহার ইতিপূর্ব্বের অর্দ্ধোন্মাদ বলিয়া ধারণা পরিবর্ত্তিত হইল, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে প্রথম উপস্থিত হইবার দিবসে তিনি তাঁহাকে একান্তে যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, সে-সকলের অর্থ ও উদ্দেশ্য যে এই ঘটনায় তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ঠাকুর দৈবশক্তিসম্পন্ন অলৌকিক মহাপুরুষ। ইচ্ছামাত্রেই তাঁহার ন্যায় মানবের মনকে ফিরাইয়া তিনি উচ্চপথে চালিত করিতে পারেন;

১ ঠাকুর তাঁহার অপূর্ব্ব সরল ভাষায় উক্ত দর্শনের কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। সেই ভাষার যথাযথ প্রয়োগ আমাদের পক্ষে অসম্ভব। অগত্যা তাঁহার ভাষা যথাসাধ্য রাখিয়া আমরা উহা এখানে সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলাম। দর্শনোক্ত দেবশিশু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা অন্য এক সময়ে জানিয়াছিলাম, ঠাকুর স্বয়ং ঐ শিশুর আকার ধারণ করিয়াছিলেন।

তবে বোধ হয়, ভগবদিচ্ছার সহিত তাঁহার ইচ্ছা সম্পূর্ণ একীভূত হওয়াতেই সকলের সম্বন্ধে তাঁহার মনে ঐরূপ ইচ্ছার উদয় হয় না; এবং এই অলৌকিক পুরুষের ঐরূপ অযাচিত কৃপালাভ তাঁহার পক্ষে স্বল্প ভাগ্যের কথা নহে!

পূর্ব্বোক্ত মীমাংসায় নরেন্দ্রনাথকে বাধ্য হইয়াই আসিতে হইয়াছিল এবং ইতিপূর্ব্বের অনেকগুলি ধারণাও তাঁহাকে উহার অনুসরণে পরিবর্ত্তিত করিতে হইয়াছিল। আপনার ন্যায় দুর্ব্বল, স্বল্পশক্তি ও দৃষ্টি-সম্পন্ন মানবকে অধ্যাত্ম-জগতের পথপ্রদর্শক বা শ্রীগুরুরূপে গ্রহণ করিতে এবং নির্ব্বিচারে তাঁহার সকল কথা-অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে ইতিপূর্ব্বে তাঁহার একান্ত আপত্তি ছিল। ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ ধারণা সমধিক পুষ্টিলাভ করিয়াছিল, একথা বলিতে হইবে না। পূর্ব্বোক্ত দুই দিবসের ঘটনার ফলে তাঁহার ঐ ধারণা বিষম আঘাতপ্রাপ্ত হইল। তিনি বুঝিলেন, বিরল হইলেও সত্যসত্যই এমন মহাপুরুষসকল সংসারে জন্মপরিগ্রহ করেন যাঁহাদিগের অলৌকিক ত্যাগ, তপস্যা, প্রেম ও পবিত্রতা সাধারণ মানবের ক্ষুদ্র মন-বুদ্ধিপ্রসূত ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণাকে বহুদূরে অতিক্রম করিয়া থাকে; সুতরাং ইঁহাদিগকে গুরুরূপে গ্রহণ করিলে তাহাদিগের পরম মঙ্গল সাধিত হয়। ফলতঃ ঠাকুরকে গুরুরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেও তিনি নির্ব্বিচারে তাঁহার সকল কথা গ্রহণে এখনও সম্মত হয়েন নাই।

উহার ফলে নরেন্দ্রের গুরুবিষয়ক ধারণার পরিবর্ত্তন

ত্যাগ ভিন্ন ঈশ্বরলাভ হয় না, পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ এই ধারণা নরেন্দ্রনাথের মনে বাল্যকাল হইতেই প্রবল ছিল। তজ্জন্য ব্রাহ্ম-

সমাজে প্রবিষ্ট হইলেও তন্মধ্যগত দাম্পত্য-জীবনসংস্কার-সম্বন্ধীয় সভা-সমিতিতে যোগদানে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। সর্ব্বস্বত্যাগী ঠাকুরের পুণ্যদর্শন ও অপূর্ব্বশক্তির পরিচয়লাভে তাঁহাতে উক্ত ত্যাগের ভাব এখন হইতে বিশেষরূপে বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

ঠাকুরের সংসর্গে নরেন্দ্রের ত্যাগ-বৈরাগ্যের ভাববৃদ্ধি

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা একটি বিষয় এখন হইতে শ্রীযুত নরেন্দ্রের চিন্তার বিষয় হইল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, এরূপ শক্তিশালী মহাপুরুষের সংস্রবে আসিয়া মানব-মন অর্দ্ধপরীক্ষা, অথবা পরীক্ষা না করিয়াই তাঁহার সকল কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বসে। উহা হইতে আপনাকে বাঁচাইতে হইবে। সেজন্য পূর্ব্বোক্ত দুই দিবসের ঘটনায় ঠাকুরের প্রতি তাঁহার মনে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধার উদয় হইলেও তিনি এখন হইতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, বিশেষ পরীক্ষাপূর্ব্বক স্বয়ং অনুভব বা প্রত্যক্ষ না করিয়া তাঁহার অদ্ভুত দর্শন-সম্বন্ধীয় কোন কথা কখন গ্রহণ করিবেন না, ইহাতে তাঁহার অপ্রিয়ভাজন হইতে হয় তাহাও স্বীকার। সুতরাং আধ্যাত্মিক জগতের অভিনব অদৃষ্টপূর্ব্ব তত্ত্বসকল গ্রহণ করিবার জন্য মনকে সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিতে একদিকে তিনি যেমন যত্নশীল হইয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনি আবার ঠাকুরের প্রত্যেক অদ্ভুত দর্শন ও ব্যবহারের কঠোর বিচারে আপনাকে এখন হইতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

পরীক্ষা না করিয়া ঠাকুরের কোন কথা গ্রহণ না করিবার নরেন্দ্রের সংকল্প

নরেন্দ্রনাথের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে ইহা সহজেই প্রতিভাত হইয়াছিল যে, প্রথম দিবসের যে-সকল কথার জন্য তিনি ঠাকুরকে অর্দ্ধোন্মাদ

বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিলেই কেবলমাত্র সেই-সকল কথার অর্থবোধ হয়। কিন্তু তাঁহার সত্যানুসন্ধিৎসু যুক্তিপরায়ণ মন ঐ কথা সহসা স্বীকার করে কিরূপে? সুতরাং ঈশ্বর যদি কখন তাঁহাকে ঐসকল কথা বুঝিবার সামর্থ্য প্রদান করেন তখন উহাদিগের সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন, এইরূপ স্থির করিয়া তিনি উহাদিগের সম্বন্ধে একটা মতামত স্থির করিতে অগ্রসর না হইয়া কেমন করিয়া ঈশ্বর-দর্শন করিয়া স্বয়ং কৃতকৃতার্থ হইবেন, এখন হইতে ঠাকুরের নিকট আগমনপূর্ব্বক তদ্বিষয় শিক্ষা ও আলোচনা করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

নরেন্দ্রের অতঃপর অনুষ্ঠান

তেজস্বী মন কোনরূপ নূতনতত্ত্ব-গ্রহণকালে নিজ পূর্ব্বমতের পরিবর্ত্তন করিতে আপনার ভিতরে একটা প্রবল বাধা অনুভব করিতে থাকে। নরেন্দ্রনাথেরও এখন ঠিক ঐরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি ঠাকুরের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইয়াও তাঁহাকে সম্যক্ গ্রহণ করিতে পারিতেছিলেন না এবং আকৃষ্ট অনুভব করিয়াও তাহা হইতে দূরে দাঁড়াইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার ঐরূপ চেষ্টার ফলে কতদূর কি দাঁড়াইয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখিতে পাইব।

নরেন্দ্রের বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা

পঞ্চম অধ্যায়

ঠাকুরের অহেতুক ভালবাসা ও নরেন্দ্রনাথ

আমরা বলিয়াছি, অদ্ভুত পুণ্যসংস্কারসমূহ লইয়া শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেজন্য অপর সাধারণ হইতে ভিন্ন ভাবের প্রত্যক্ষসকল তাঁহার জীবনে নানা বিষয়ে ইতিপূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপে ঐরূপ কয়েকটির উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। নরেন্দ্র বলিতেন—"আজীবন নিদ্রা যাইব বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেই ভ্রূমধ্যভাগে এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্বিন্দু দেখিতে পাইতাম এবং একমনে উহার নানারূপ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে থাকিতাম। উহা দেখিবার সুবিধা হইবে বলিয়া লোকে যেভাবে ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করে, আমি সেইভাবে শয্যায় শয়ন করিতাম। ঐ অপূর্ব্ব বিন্দু নানাবর্ণে পরিবর্ত্তিত ও বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে বিম্বাকারে পরিণত হইত এবং পরিশেষে ফাটিয়া যাইয়া আপাদমস্তক শুভ্র-তরল জ্যোতিতে আবৃত করিয়া ফেলিত! —ঐরূপ হইবামাত্র চেতনালুপ্ত হইয়া নিদ্রাভিভূত হইতাম! আমি জানিতাম, ঐরূপেই সকলে নিদ্রা যায়। বহুকাল পর্য্যন্ত ঐরূপ ধারণা ছিল। বড় হইয়া যখন ধ্যানাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলাম তখন চক্ষু মুদ্রিত করিলেই ঐ জ্যোতির্বিন্দু প্রথমেই সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইত এবং উহাতেই চিত্ত একাগ্র করিতাম। মহর্ষি

নরেন্দ্রের পূর্ব্ব-জীবনের অসাধারণ প্রত্যক্ষসমূহ—নিদ্রার পূর্ব্বে জ্যোতিঃদর্শন

দেবেন্দ্রনাথের উপদেশে কয়েকজন বয়স্যের সহিত যখন নিত্য ধ্যানাভ্যাস করিতে লাগিলাম তখন ধ্যান করিবার কালে কাহার কিরূপ দর্শন উপলব্ধি উপস্থিত হইত, পরস্পরে তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতাম। ঐ সময়ে তাঁহাদিগের কথাতেই বুঝিয়াছিলাম, ঐরূপ জ্যোতিঃদর্শন তাহাদিগের কখনও হয় নাই এবং তাহাদিগের কেহই আমার ন্যায় পূর্ব্বোক্ত ভাবে নিদ্রা যায় না!

দেশ-কাল-পাত্র-বিশেষ-দর্শনে পূর্ব্ব স্মৃতির উদয়

"আবার বাল্যকাল হইতে সময়ে সময়ে কোন বস্তু, ব্যক্তি বা স্থানবিশেষ দেখিবামাত্র মনে হইত, উহাদিগের সহিত আমি বিশেষ পরিচিত, ইতিপূর্ব্বে কোথায় উহাদিগকে দেখিয়াছি। স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতাম, কিছুতেই মনে আসিত না—কিন্তু কোনমতে ধারণা হইত না যে উহাদিগকে ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই! প্রায়ই মধ্যে মধ্যে ঐরূপ হইত। হয়ত বয়স্যবর্গের সহিত মিলিত হইয়া কোন স্থানে নানা বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে এমন সময় তাহাদিগের মধ্যে একজন একটা কথা বলিল, অমনি সহসা মনে হইল—তাই ত এই গৃহে, এই সকল ব্যক্তির সহিত, এই বিষয় লইয়া আলাপ যে ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি এবং তখনও যে এই ব্যক্তি এইরূপ কথা বলিয়াছিল! কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুতেই স্থির করিতে পারিতাম না—কোথায়, কবে ইহাদিগের সহিত ইতিপূর্ব্বে এইরূপ আলাপ হইয়াছিল! পুনর্জ্জন্মবাদের বিষয় যখন অবগত হইলাম তখন ভাবিয়াছিলাম, তবে বুঝি জন্মান্তরে ঐসকল দেশ ও পাত্রের সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম এবং তাহারই আংশিক স্মৃতি কখন কখন আমার অন্তরে ঐরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে। পরে বুঝিয়াছি, ঐ বিষয়ের ঐরূপ মীমাংসা

যুক্তিযুক্ত নহে। এখন[১] মনে হয়, ইহজন্মে যে-সকল বিষয় ও ব্যক্তির সহিত আমাকে পরিচিত হইতে হইবে, জন্মিবার পূর্ব্বে সেইসকলকে চিত্রপরম্পরায় আমি কোনরূপে দেখিতে পাইয়াছিলাম এবং উহারই স্মৃতি জন্মিবার পরে আমার অন্তরে আজীবন সময়ে সময়ে উদিত হইয়া থাকে।"

ঠাকুরের পবিত্র জীবন এবং সমাধিস্থ হইবার কথা নানা লোকের[২] নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া শ্রীযুত নরেন্দ্র তাঁহাকে দর্শন করিতে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার কোনরূপ অবস্থান্তর বা অদ্ভুত প্রত্যক্ষ উপস্থিত হইবে, একথা তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। ঘটনা কিন্তু অন্যরূপ দাঁড়াইল। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শ্রীপদ-প্রান্তে আগমন করিয়া উপর্য্যুপরি দুই দিন তাঁহার যেরূপ অলৌকিক প্রত্যক্ষ উপস্থিত হইল তাহার তুলনায় তাঁহার পূর্ব্বপরিদৃষ্ট প্রত্যক্ষসকল নিতান্ত ম্লান ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ

ঠাকুরের দৈবী-শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া নরেন্দ্রের জল্পনা ও বিস্ময়

১ এই অদ্ভুত প্রত্যক্ষের কথা শ্রীযুত নরেন্দ্র তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার কিছুকাল পরেই আমাদিগকে বলিয়াছিলেন এবং শেষ জীবনে তিনি উহার সম্বন্ধে এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

২ আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, দক্ষিণেশ্বরে আসিবার কালে শ্রীযুত নরেন্দ্র কলিকাতার জেনারেল এসেম্ব্লিস্ ইনষ্টিটিউশন নামক বিদ্যালয় হইতে এফ্ এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। উদারচেতা সুপণ্ডিত হেষ্টী সাহেব তখন উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। সাহেবের বহুমুখী প্রতিভা, পবিত্র জীবন এবং ছাত্রদিগের সহিত সরল সপ্রেম আচরণের জন্য নরেন্দ্রনাথ ইঁহাকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। সাহিত্যের অধ্যাপক সহসা অসুস্থ হইয়া পড়ায় হেষ্টী সাহেব একদিন এফ.এ. ক্লাসের ছাত্রবৃন্দকে সাহিত্য অধ্যয়ন করাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতাবলীর আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যানুভবে উক্ত কবির ভাবসমাধি হইবার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। ছাত্রগণ সমাধির কথা বুঝিতে না পারায় তিনি

হইতে লাগিল এবং তাহার ইয়ত্তা করিতে তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি পরাভব স্বীকার করিল। সুতরাং ঠাকুরের বিষয় অনুধাবন করিতে যাইয়া তিনি এখন বিষম সমস্যায় পতিত হইয়াছিলেন। কারণ ঠাকুরের অচিন্ত্য দৈবীশক্তি-সহায়েই যে তাঁহার ঐরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রত্যক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল এ বিষয়ে সংশয় করিবার তিনি বিন্দুমাত্র কারণ অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হন নাই এবং মনে মনে ঐ বিষয়ে যতই আলোচনা করিয়াছিলেন ততই বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন।

নরেন্দ্র কতদূর উচ্চ অধিকারী ছিলেন

বাস্তবিক ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া নরেন্দ্রনাথের সহসা যেরূপ অদ্ভুত প্রত্যক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। শাস্ত্র বলেন, স্বল্পশক্তিসম্পন্ন সামান্য-অধিকারী মানবের জীবনে ঐরূপ প্রত্যক্ষ বহুকালের ত্যাগ ও তপস্যায় বিরল উপস্থিত হয় এবং কোনরূপে একবার উপস্থিত হইলে শ্রীগুরুর ভিতরে ঈশ্বর-প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া মোহিত হইয়া সে এককালে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। নরেন্দ্র যে ঐরূপ করেন নাই, ইহা স্বল্প বিস্ময়ের কথা নহে এবং উহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়

তাহাদিগকে উক্ত অবস্থার কথা যথাবিধি বুঝাইয়া পরিশেষে বলিয়াছিলেন, "চিত্তের পবিত্রতা ও বিষয়বিশেষে একাগ্রতা হইতে উক্ত অবস্থার উদয় হইয়া থাকে ; ঐ প্রকার অবস্থার অধিকারী ব্যক্তি বিরল দেখিতে পাওয়া যায় ; একমাত্র দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আজকাল ঐরূপ অবস্থা হইতে দেখিয়াছি—তাঁহার উক্ত অবস্থা একদিন দর্শন করিয়া আসিলে তোমরা এ বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।" ঐরূপে হেষ্টী সাহেবের নিকট হইতে শ্রীযুত নরেন্দ্র ঠাকুরের কথা প্রথম শ্রবণ করিবার পরে সুরেন্দ্র-নাথের আলয়ে তাঁহার প্রথম দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। আবার ব্রাহ্মসমাজে ইতিপূর্ব্বে গতিবিধি থাকায় তিনি ঠাকুরের কথা ঐস্থানেও শ্রবণ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

তিনি আধ্যাত্মিক জগতে কতদূর উচ্চ অধিকারী ছিলেন। অতি উচ্চ আধার ছিলেন বলিয়াই ঐ ঘটনায় তিনি এককালে আত্মহারা হইয়া পড়েন নাই এবং সংযত থাকিয়া ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্র ও আচরণের পরীক্ষা ও কারণ-নির্ণয়ে আপনাকে বহুকাল পর্য্যন্ত নিযুক্ত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু অভিভূত না হইলেও এবং এককালে বশ্যতা স্বীকার না করিলেও, তিনি এখন হইতে ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুর কতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন

প্রথম সাক্ষাতের দিবস হইতে ঠাকুরও অন্যপক্ষে নরেন্দ্রনাথের প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন। অপরোক্ষ-বিজ্ঞানসম্পন্ন মহানুভব গুরু সুযোগ্য শিষ্যকে দেখিবামাত্র আপনার সমুদয় জীবনপ্রত্যক্ষ তাহার অন্তরে ঢালিয়া দিবার আকুল আগ্রহে যেন এককালে অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে গভীর আগ্রহের পরিমাণ হয় না, সে স্বার্থগন্ধশূন্য অহেতুক অধৈর্য্য, পূর্ণসংযত আত্মারাম গুরুগণের হৃদয়ে কেবলমাত্র দৈব প্রেরণাতেই উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐরূপ প্রেরণাবশেই জগদ্‌গুরু মহাপুরুষগণ উত্তম অধিকারী শিষ্যকে দেখিবামাত্র অভয় ব্রহ্মজ্ঞ-পদবীতে আরূঢ় করাইয়া তাহাকে আপ্তকাম ও পূর্ণ করিয়া থাকেন।[১]

নরেন্দ্রনাথ যেদিন দক্ষিণেশ্বরে একাকী আগমন করেন, ঠাকুর

---

১ শাস্ত্রে ইহা শাম্ভবী দীক্ষা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শাম্ভবী দীক্ষার বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—৪র্থ অধ্যায়' দ্রষ্টব্য।

যে ঐদিন তাঁহাকে এককালে সমাধিস্থ করিয়া ব্রহ্মপদবীতে আরূঢ় করাইতে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, এবিষয়ে সংশয়মাত্র নাই। কারণ, উহার তিন-চারি বৎসর পরে শ্রীযুত নরেন্দ্র যখন সম্পূর্ণরূপে ঠাকুরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভের জন্য ঠাকুরের নিকট বারংবার প্রার্থনা করিতেছিলেন, তখন এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া ঠাকুর তাঁহাকে আমাদিগের সম্মুখে অনেক সময় বলিতেন, "কেন? তুই যে তখন বলিয়াছিলি তোর বাপ-মা আছে, তাদের সেবা করিতে হইবে?" আবার কখন বা বলিতেন, "দেখ্, একজন মরিয়া ভূত হইয়াছিল। অনেককাল একাকী থাকায় সঙ্গীর অভাব অনুভব করিয়া সে চারিদিকে অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কোন স্থানে মরিয়াছে শুনিলেই সে সেখানে ছুটিয়া যাইত; ভাবিত, এইবার বুঝি তার একজন সঙ্গী জুটিবে। কিন্তু দেখিত, মৃত-ব্যক্তি গাঙ্গবারি-স্পর্শে বা অন্য কোন উপায়ে উদ্ধার হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া আসিয়া সে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় একাকী কালযাপন করিত। ঐরূপে সেই ভূতের সঙ্গীর অভাব আর কিছুতেই ঘুচে নাই। আমারও ঠিক ঐরূপ দশা হইয়াছে। তোকে দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম এইবার বুঝি আমার একটি সঙ্গী জুটিল—কিন্তু তুইও বল্লি, তোর বাপ-মা আছে। কাজেই আমার আর সঙ্গী পাওয়া হইল না!" ঐরূপে ঐ দিবসের ঘটনার উল্লেখ করিয়া ঠাকুর অতঃপর নরেন্দ্রনাথের সহিত অনেক সময় রঙ্গ-পরিহাস করিতেন।

প্রথম দিবসে নরেন্দ্রকে ব্রহ্মজ্ঞ-পদবীতে আরূঢ় করাইবার ঠাকুরের চেষ্টা

সে যাহা হউক, সমাধিস্থ হইবার উপক্রমে নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে দারুণ ভয়ের সঞ্চার হইতে দেখিয়া ঠাকুর সেদিন যেরূপে নিরস্ত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। ঘটনা ঐরূপ হওয়ায় নরেন্দ্রের সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে তিনি যাহা দর্শন ও উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে ঠাকুরের সন্দিহান হওয়া বিচিত্র নহে। আমাদিগের অনুমান, সেইজন্যই তিনি, নরেন্দ্র তৃতীয় দিবস দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলে শক্তিবলে তাঁহাকে অভিভূত করিয়া তাঁহার জীবন সম্বন্ধে নানা রহস্যকথা তাঁহার নিকট হইতে জানিয়া লইয়াছিলেন এবং নিজ প্রত্যক্ষ-সকলের সহিত উহাদিগের ঐক্য দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। উক্ত অনুমান সত্য হইলে ইহাই বুঝিতে হয় যে, নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত দুই দিবসে একই প্রকারের সমাধি-অবস্থা লাভ করেন নাই। ফলেও দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত দুই দিবসে তাঁহার দুই বিভিন্ন প্রকারের উপলব্ধি উপস্থিত হইয়াছিল।

নরেন্দ্রের প্রথম ও দ্বিতীয় দিবসের অদ্ভুত প্রত্যক্ষের মধ্যে প্রভেদ

নরেন্দ্রনাথকে পূর্ব্বোক্তভাবে পরীক্ষা করিয়া ঠাকুর একভাবে নিশ্চিন্ত হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, বলিতে পারা যায় না। কারণ, তিনি দেখিয়াছিলেন, যে-সকল গুণ বা শক্তি-প্রকাশের মধ্যে একটি বা দুইটির মাত্র অধিকারী হইয়া মানব সংসারে জনসাধারণের মধ্যে বিপুল প্রতিপত্তি লাভ করে, নরেন্দ্রনাথের অন্তরে ঐরূপ আঠারটি শক্তি-প্রকাশ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান এবং ঈশ্বর, জগৎ ও মানব-জীবনের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে চরম-সত্য উপলব্ধি করিয়া শ্রীযুক্ত

নরেন্দ্রের সম্বন্ধে ঠাকুরের ভয়

নরেন্দ্র উহাদিগকে সম্যক্‌রূপে আধ্যাত্মিক পথে নিযুক্ত করিতে না পারিলে ফল বিপরীত হইয়া দাঁড়াইবে। ঠাকুর বলিতেন, ঐরূপ হইলে নরেন্দ্র অন্য সকল নেতাদিগের ন্যায় এক নবীন মত ও দলের সৃষ্টিমাত্র করিয়া জগতে খ্যাতিলাভ করিয়া যাইবে; কিন্তু বর্ত্তমান যুগপ্রয়োজন পূর্ণ করিবার জন্য যে উদার আধ্যাত্মিক তত্ত্বের উপলব্ধি ও প্রচার আবশ্যক, তাহা প্রত্যক্ষ করা এবং উহার প্রতিষ্ঠাকল্পে সহায়তা করিয়া জগতের যথার্থ কল্যাণসাধন করা তাহার দ্বারা সম্ভবপর হইবে না। সুতরাং নরেন্দ্র যাহাতে স্বেচ্ছায় সম্পূর্ণভাবে তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহার সদৃশ আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকলের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারে, সেজন্য এখন হইতে ঠাকুরের প্রাণে অসীম আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুর সর্ব্বদা বলিতেন—গেঁড়ে, ডোবা প্রভৃতি যে-সকল জলাধারে স্রোত নাই সেখানেই যেমন দল বা নানারূপ উদ্ভিজ্জ-দামের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ আধ্যাত্মিক জগতে যেখানে আংশিক সত্যমাত্রকে মানব পূর্ণ সত্য বলিয়া ধারণা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসে, সেখানেই দল বা গণ্ডি-নিবদ্ধ সঙ্ঘসকলের উদয় হইয়া থাকে। অসাধারণ মেধা ও মানসিক-গুণসম্পন্ন নরেন্দ্রনাথ বিপথে গমন করিয়া পাছে ঐরূপ করিয়া বসেন, এই ভয়ে ঠাকুর কতরূপে তাঁহাকে পূর্ণ সত্যের অধিকারী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, নরেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইবার প্রথম হইতেই ঠাকুর নানা কারণে তাঁহার প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন এবং যতদিন না তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে নরেন্দ্রের আর পূর্ব্বোক্তভাবে বিপথে গমন করিবার সম্ভাবনা

নাই, ততদিন পর্য্যন্ত উক্ত আকর্ষণ তাঁহাতে সহজ স্বাভাবিক ভাব ধারণ করে নাই। ঐসকল কারণের অনুধাবনে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়, উহাদের কতকগুলি নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে ঠাকুরের নিজ অদ্ভুত দর্শনসমূহ হইতে সম্ভূত হইয়াছিল এবং অবশিষ্টগুলি পাছে নরেন্দ্র কালধর্ম্মপ্রভাবে দারৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা প্রভৃতি কোনরূপ বন্ধনকে স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার মহৎ জীবনের চরম-লক্ষ্যসাধনে আংশিকভাবেও অসমর্থ হন, এই ভয় হইতে উত্থিত হইয়াছিল।

ঠাকুরের নরেন্দ্রের প্রতি অসাধারণ আকর্ষণের কারণ

বহুকালব্যাপী ত্যাগ ও তপস্যার ফলে ক্ষুদ্র 'অহং-মম'-বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হওয়ায় জগৎ-কারণের সহিত নিত্য অদ্বৈত-ভাবে অবস্থিত ঠাকুর, ঈশ্বরের জনকল্যাণসাধনরূপ কর্ম্মকে আপনার বলিয়া অনুক্ষণ উপলব্ধি করিতে-ছিলেন। উহারই প্রভাবে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়া-ছিল যে, বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মগ্লানি-নাশ-রূপ সুমহৎ কার্য্য তাঁহার শরীর-মনকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া সাধিত হয়, ইহাই বিরাটেচ্ছার অভিপ্রেত। আবার উহারই প্রভাবে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ক্ষুদ্র স্বার্থসুখসাধনের জন্য শ্রীযুত নরেন্দ্র জন্মপরিগ্রহ করেন নাই, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি একান্ত অনুরাগে পূর্ব্বোক্ত জনকল্যাণসাধনরূপ কর্ম্মে তাঁহাকে সহায়তা করিতেই আগমন করিয়াছেন। সুতরাং স্বার্থশূন্য নিত্যমুক্ত নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার পরমাত্মীয় বলিয়া বোধ হইবে এবং তাঁহার প্রতি তিনি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইবেন, ইহাতে বিচিত্র কি? অতএব আপাত-দৃষ্টিতে

উক্ত আকর্ষণ উপস্থিত হওয়া যেন স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী

নরেন্দ্রনাথের প্রতি ঠাকুরের আকর্ষণ দেখিয়া বিস্ময়ের উদয় হইলেও উহা যে স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী তাহা স্বল্পচিন্তার ফলেই বুঝিতে পারা যায়।

প্রথম দর্শনের দিন হইতেই ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে কতদূর নিকট-আত্মীয় জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং কিরূপ তন্ময়ভাবে ভালবাসিয়া-ছিলেন তাহার আভাস প্রদান করা একপ্রকার সাধ্যাতীত বলিয়া আমাদিগের মনে হইয়া থাকে। সংসারী মানব যে-সকল কারণে অপরকে আপনার জ্ঞান করিয়া হৃদয়ের ভালবাসা অর্পণ করিয়া থাকে, তাহার কিছুমাত্র এখানে বর্ত্তমান ছিল না; কিন্তু নরেন্দ্রের বিরহে এবং মিলনে ঠাকুরের যেরূপ ব্যাকুলতা এবং উল্লাস দর্শন করিয়াছি তাহার বিন্দুমাত্রেরও দর্শন অন্যত্র কোথাও আমাদিগের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। নিষ্কারণে একজন অপরকে যে এতদূর ভালবাসিতে পারে, ইহা আমাদিগের ইতিপূর্ব্বে জ্ঞান ছিল না। নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের অদ্ভুত প্রেম দর্শন করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি, কালে সংসারে এমন দিন আসিবে যখন মানব মানবের মধ্যে ঈশ্বরপ্রকাশ উপলব্ধি করিয়া সত্যসত্যই ঐরূপ নিষ্কারণে ভালবাসিয়া কৃতকৃতার্থ হইবে।

নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের ভালবাসা সাংসারিক ভাবের নহে

ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রের আগমনের কিছুকাল পরে স্বামী প্রেমানন্দ দক্ষিণেশ্বরে প্রথম উপস্থিত হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বে সপ্তাহ বা কিঞ্চিদধিক কাল দক্ষিণেশ্বরে আসিতে না পারায় ঠাকুর তাঁহার জন্য কিরূপ উৎকণ্ঠিতচিত্তে তখন অবস্থান করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে

উক্ত ভালবাসা সম্বন্ধে স্বামী প্রেমানন্দের কথা

বাবুরাম

স্বামী (প্রেমানন্দ)

তিনি মোহিত হইয়া ঐ বিষয় আমাদের নিকট অনেকবার কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত হাটখোলার ঘাটে নৌকায় উঠিতে যাইয়া ঐদিন রামদয়াল বাবুকে তথায় দেখিতে পাইলাম। তিনিও দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছেন জানিয়া আমরা একত্রেই এক নৌকায় উঠিলাম এবং প্রায় সন্ধ্যার সময় রাণী রাসমণির কালীবাটীতে পৌঁছিলাম। ঠাকুরের ঘরে আসিয়া শুনিলাম, তিনি মন্দিরে ৺জগদম্বাকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাদিগকে ঐস্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য মন্দিরাভিমুখে চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই তাঁহাকে অতি সন্তর্পণে ধারণ করিয়া 'এখানটায় সিঁড়ি উঠিতে হইবে—এখানটায় নামিতে হইবে' ইত্যাদি বলিতে বলিতে লইয়া আসিতেছেন, দেখিতে পাইলাম। ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার ভাববিভোর হইয়া বাহ্যসংজ্ঞা হারাইবার কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম। এজন্য ঠাকুরকে এখন ঐরূপে মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে আসিতে দেখিয়া বুঝিলাম তিনি ভাবাবেশে রহিয়াছেন। ঐরূপে গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি ছোট তক্তাপোষখানির উপর উপবেশন করিলেন এবং অল্পক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক আমার মুখ ও হস্ত-পদাদির লক্ষণ-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। কনুই হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত আমার হাতখানির ওজন পরীক্ষা করিবার জন্য কিছুক্ষণ নিজহস্তে ধারণ করিয়া বলিলেন, 'বেশ।' ঐরূপে কি বুঝিলেন, তাহা তিনিই জানেন। উহার

স্বামী প্রেমানন্দের প্রথম দিন দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও ঠাকুরকে নরেন্দ্রের জন্য উৎকণ্ঠিত দর্শন

পরে রামদয়াল বাবুকে শ্রীযুত নরেন্দ্রের শারীরিক কল্যাণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনি ভাল আছেন জানিয়া বলিলেন, 'সে অনেকদিন এখানে আসে নাই, তাহাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে, একবার আসিতে বলিও।'

"ধর্ম্মবিষয়ক নানা কথাবার্ত্তায় কয়েক ঘণ্টা বিশেষ আনন্দে কাটিল। ক্রমে দশটা বাজিবার পরে আমরা আহার করিলাম এবং ঠাকুরের ঘরের পূর্ব্বদিকে—উঠানের উত্তরে যে বারাণ্ডা আছে তথায় শয়ন করিলাম। ঠাকুর এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্য ঘরের ভিতরেই শয্যা প্রস্তুত হইল। শয়ন করিবার পরে এক ঘণ্টাকাল অতীত হইতে না হইতে ঠাকুর পরিধেয় বস্ত্রখানি বালকের ন্যায় বগলে ধারণ করিয়া ঘরের বাহিরে আমাদিগের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া রামদয়াল বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ওগো, ঘুমুলে ?' আমরা উভয়ে শশব্যস্তে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বলিলাম, 'আজ্ঞে না।' উহা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, 'দেখ, নরেন্দ্রের জন্য প্রাণের ভিতরটা যেন গামছা-নিংড়াবার মত জোরে মোচড় দিচ্চে; তাকে একবার দেখা করে যেতে বলো; সে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের আধার, সাক্ষাৎ নারায়ণ; তাকে মাঝে মাঝে না দেখলে থাকতে পারি না।' রামদয়াল বাবু কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেছিলেন, সেজন্য ঠাকুরের বালকের ন্যায় স্বভাবের কথা তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি ঠাকুরের ঐরূপ বালকের ন্যায় আচরণ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন এবং রাত্রি পোহাইলেই নরেন্দ্রের সহিত

ঠাকুরের সারারাত্র দারুণ উৎকণ্ঠাদর্শনে প্রেমানন্দের চিন্তা

দেখা করিয়া তাঁহাকে আসিতে বলিবেন ইত্যাদি নানা কথা কহিয়া ঠাকুরকে শান্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে রাত্রে ঠাকুরের সেই ভাবের কিছুমাত্র প্রশমন হইল না। আমাদিগের বিশ্রামের অভাব হইতেছে বুঝিয়া মধ্যে মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য নিজ শয্যায় যাইয়া শয়ন করিলেও পরক্ষণেই ঐকথা ভুলিয়া আমাদিগের নিকটে পুনরায় আগমনপূর্ব্বক নরেন্দ্রের গুণের কথা এবং তাহাকে না দেখিয়া তাঁহার প্রাণে যে দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সকরুণভাবে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐরূপ কাতরতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম, ইঁহার কি অদ্ভুত ভালবাসা এবং যাহার জন্য ইনি ঐরূপ করিতেছেন সে ব্যক্তি কি কঠোর! সেই রাত্রি ঐরূপে আমাদিগের অতিবাহিত হইয়াছিল। পরে রজনী প্রভাত হইলে মন্দিরে যাইয়া ৺জগদম্বাকে দর্শন করিয়া ঠাকুরের চরণে প্রণত হইয়া বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলাম।"

নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের ভালবাসা সম্বন্ধে বৈকুণ্ঠনাথের কথা

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে আমাদিগের জনৈক বন্ধু[১] দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নরেন্দ্রনাথ অনেকদিন আসেন নাই বলিয়া ঠাকুর বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি বলেন, "সেদিন ঠাকুরের মন যেন নরেন্দ্রময় হইয়া রহিয়াছে, মুখে নরেন্দ্রের গুণানুবাদ ভিন্ন অন্য কথা নাই। আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'দেখ, নরেন্দ্র শুদ্ধসত্ত্বগুণী; আমি দেখিয়াছি সে অখণ্ডের ঘরের

[১] শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল

চারিজনের একজন এবং সপ্তর্ষির একজন ; তাহার কতগুণ তাহার ইয়ত্তা হয় না’—বলিতে বলিতে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে দেখিবার জন্য এককালে অস্থির হইয়া উঠিলেন এবং পুত্রবিরহে মাতা যেরূপ কাতর হন সেইরূপ অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে কিছুতেই আপনাকে সংযত করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া এবং আমরা তাঁহার এরূপ ব্যবহারে কি ভাবিব মনে করিয়া ঘরের উত্তরদিকের বারাণ্ডায় দ্রুতপদে চলিয়া যাইলেন এবং ‘মাগো, আমি তাকে না দেখে আর থাক্‌তে পারি না’, ইত্যাদি রুদ্ধস্বরে বলিতে বলিতে বিষম ক্রন্দন করিতেছেন, শুনিতে পাইলাম। কিছুক্ষণ পরে আপনাকে কতকটা সংযত করিয়া তিনি গৃহমধ্যে আমাদিগের নিকটে আসিয়া উপবেশন করিয়া কাতর-করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন, ‘এত কাঁদলাম, কিন্তু নরেন্দ্র ত এল না ; তাকে একবার দেখ্‌বার জন্য প্রাণে বিষম যন্ত্রণা হচ্চে, বুকের ভিতরটায় যেন মোচড় দিচ্চে ; কিন্তু আমার এই টান্‌টা সে কিছু বুঝে না’—এইরূপ বলিতে বলিতে আবার অস্থির হইয়া তিনি গৃহের বাহিরে চলিয়া যাইলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিলেন, ‘বুড়ো মিন্‌সে, তার জন্য এইরূপে অস্থির হয়েচি ও কাঁদ্‌চি দেখে লোকেই বা কি বল্‌বে, বল দেখি ? তোমরা আপনার লোক, তোমাদের কাছে লজ্জা হয় না ! কিন্তু অপরে দেখে কি ভাব্‌বে, বল দেখি ? কিন্তু কিছুতেই সাম্‌লাতে পাচ্চি না।’ নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের ভালবাসা দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়া রহিলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম নিশ্চয়ই নরেন্দ্র দেবতুল্য পুরুষ হইবেন, নতুবা তাঁহার প্রতি ঠাকুরের এত টান কেন ? পরে ঠাকুরকে শান্ত করিবার জন্য বলিতে লাগিলাম, ‘তাই

ত মহাশয়, তার ভারি অন্যায়, তাকে না দেখে আপনার এত কষ্ট হয়—একথা জেনেও সে আসে না।' এই ঘটনার কিছুকাল পরে অন্য এক দিবসে ঠাকুর নরেন্দ্রের সহিত আমাকে পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। নরেন্দ্রের বিরহে ঠাকুরকে যেমন অধীর দেখিয়াছি তাঁহার সহিত মিলনে আবার তাঁহাকে তেমনি উল্লসিত হইতে দেখিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে ঠাকুরের জন্মতিথি-দিবসে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ভক্তগণ সেদিন তাঁহাকে নূতন বস্ত্র, সচন্দন-পুষ্প-মাল্যাদি পরাইয়া মনোহর সাজে সাজাইয়া-ছিল। তাঁহার ঘরের পূর্ব্বে, বাগানের দিকের বারাণ্ডায় কীর্ত্তন হইতেছিল। ঠাকুর ভক্তগণপরিবৃত হইয়া উহা শুনিতে শুনিতে কখন কিছুক্ষণের জন্য ভাবাবিষ্ট হইতেছিলেন, কখন বা এক একটি মধুর আঁখর দিয়া কীর্ত্তন জমাইয়া দিতেছিলেন ; কিন্তু নরেন্দ্র না আসায় তাঁহার আনন্দের ব্যাঘাত হইতেছিল। মধ্যে মধ্যে চারিদিকে দেখিতেছিলেন এবং আমাদিগকে বলিতেছিলেন, 'তাই ত নরেন্দ্র আসিল না!' বেলা প্রায় তুই প্রহর, এমন সময় নরেন্দ্র আসিয়া সভামধ্যে তাঁহার পদপ্রান্তে প্রণত হইল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ঠাকুর একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া তাঁহার স্কন্ধে বসিয়া গভীর ভাবাবিষ্ট হইলেন। পরে সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর নরেন্দ্রের সহিত কথায় ও তাঁহাকে আহারাদি করাইতে ব্যাপৃত হইলেন। সেদিন তাঁহার আর কীর্ত্তন শুনা হইল না।"

ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া শ্রীযুত নরেন্দ্র যে দেবতুর্লভ প্রেমের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। উহাতে অবিচলিত থাকিয়া তিনি যে যথার্থ সত্যলাভের আশয়ে

ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়া লইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, সত্যানুরাগ তাঁহার ভিতরে কতদূর প্রবল ছিল। অন্যপক্ষে ঠাকুর যে নরেন্দ্রের ঐরূপ ভাবে ক্ষুণ্ণ না হইয়া শিষ্যের কল্যাণের নিমিত্ত পরীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে আধ্যাত্মিক সকল বিষয় উপলব্ধি করাইয়া দিতে পরম আহ্লাদে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার নিরভিমানিত্ব এবং মহানুভবত্বের কথা অনুধাবন করিয়া বিস্ময়ের অবধি থাকে না। ঐরূপে নরেন্দ্রের সহিত ঠাকুরের সম্বন্ধের কথা আমরা যতই আলোচনা করিব ততই একপক্ষে পরীক্ষা করিয়া লইবার এবং অন্যপক্ষে পরীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল উপলব্ধি করাইয়া দিবার আগ্রহ দেখিয়া মুগ্ধ হইব এবং বুঝিতে পারিব, যথার্থ গুরু উচ্চ অধিকারী ব্যক্তির ভাব রক্ষা করিয়া কিরূপে শিক্ষাদানে অগ্রসর হন ও পরিণামে কিরূপে তাহার হৃদয়ে চিরকালের নিমিত্ত শ্রদ্ধা ও পূজার স্থল অধিকার করিয়া বসেন।

ঠাকুরের বিশেষ ভালবাসার পাত্র হইয়াও নরেন্দ্রের অচল থাকা তাঁহার উচ্চাধিকারিত্বের পরিচয়

ষষ্ঠ অধ্যায়—প্রথম পাদ

ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ

নরেন্দ্র ঠাকুরের পূতসঙ্গ কতকাল লাভ করিয়াছিল

দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল শ্রীযুত নরেন্দ্র ঠাকুরের পূত সহবাসলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। পাঠক হয়ত ইহাতে বুঝিবেন যে, আমরা বলিতেছি তিনি ঐ কয় বর্ষ নিরন্তর দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাহা নহে। কলিকাতাবাসী অন্য সকল ভক্তগণের ন্যায় তিনিও ঐ কয় বৎসর বাটী হইতেই ঠাকুরের নিকটে গমনাগমন করিয়াছিলেন। তবে এ কথা নিশ্চয় যে, প্রথম হইতে ঠাকুরের অশেষ ভালবাসার অধিকারী হওয়ায় ঐ কয় বৎসর তিনি ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিয়াছিলেন। প্রতি সপ্তাহে এক বা দুই দিবস তথায় গমন এবং অবসর পাইলেই দুই-চারি দিন বা ততোধিক কাল তথায় অবস্থান করা নরেন্দ্রনাথের জীবনে ক্রমে একটা প্রধান কর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল। সময়ে সময়ে ঐ নিয়মের যে ব্যতিক্রম হয় নাই, তাহা নহে। কিন্তু ঠাকুর তাঁহার প্রতি প্রথম হইতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঐ নিয়ম বড় একটা ভঙ্গ করিতে দেন নাই। কোন কারণে নরেন্দ্রনাথ এক সপ্তাহ দক্ষিণেশ্বরে না আসিতে পারিলে ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবার জন্য এককালে অধীর হইয়া উঠিতেন এবং উপর্য্যুপরি সংবাদ পাঠাইয়া তাঁহাকে নিজ-সকাশে আনয়ন করিতেন, অথবা স্বয়ং কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত কয়েক ঘণ্টা কাল অতিবাহিত করিয়া আসিতেন।

আমাদের যতদূর জানা আছে, ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার পরে প্রথম দুই বৎসর ঐরূপে নরেন্দ্রের দক্ষিণেশ্বরে নিয়মিতভাবে গমনাগমনের বড় একটা ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু বি.এ. পরীক্ষা দিবার পরে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে পিতার সহসা মৃত্যু হইয়া সংসারের সমস্ত ভার যখন তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হইল, তখন নানা কারণে কিছুদিনের জন্য তিনি পূর্ব্বোক্ত নিয়ম ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, উক্ত পাঁচ বৎসর কাল ঠাকুর যেভাবে নরেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে উহাতে পাঁচটি প্রধান বিভাগ নয়নগোচর হয়—

নরেন্দ্রের সহিত ঠাকুরের উক্ত কালের আচরণের পাঁচটি বিভাগ

১ম—দেখা যায়, ঠাকুর তাঁহার অলৌকিক অন্তর্দৃষ্টি-সহায়ে প্রথম সাক্ষাৎ হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন নরেন্দ্রনাথের ন্যায় উচ্চ অধিকারী আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিরল, এবং বহুকালসঞ্চিত গ্লানি দূরপূর্ব্বক সনাতনধর্ম্মকে যুগ-প্রয়োজনসাধনানুযায়ী করিয়া সংস্থাপনরূপ যে কার্য্যে শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন তাহাতে বিশেষ সহায়তা করিবার জন্যই শ্রীযুত নরেন্দ্র জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন।

২য়—অসীম বিশ্বাস ও ভালবাসায় তিনি নরেন্দ্রনাথকে চির-কালের নিমিত্ত আবদ্ধ করিয়াছিলেন।

৩য়—নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া তিনি বুঝিয়া লইয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি নরেন্দ্রনাথের মহত্ত্ব এবং জীবনোদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহার নিকটে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে নাই।

৪র্থ—নানাভাবে শিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক তিনি নরেন্দ্রনাথকে উক্ত সুমহান্ জীবনোদ্দেশ্য-সাধনের উপযোগী যন্ত্রস্বরূপে গঠিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

৫ম—শিক্ষার পরিসমাপ্তি হইলে অপরোক্ষ-বিজ্ঞান-সম্পন্ন নরেন্দ্রনাথকে তিনি কিরূপে ধর্ম্মসংস্থাপনকার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক পরিণামে উক্ত কার্য্যের এবং নিজ সঙ্ঘের ভার তাঁহার হস্তে নিশ্চিন্তমনে অর্পণ করিয়াছিলেন।

অদ্ভুত দর্শন হইতে ঠাকুরের নরেন্দ্রের উপর বিশ্বাস ও ভালবাসা

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণেশ্বর আগমনের স্বল্পকাল পূর্ব্বে তদীয় মহত্ত্ব-পরিচায়ক কয়েকটি অদ্ভুত দর্শন ঠাকুরের অন্তর্দৃষ্টি-সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছিল। উহাদিগের প্রভাবেই তিনি নরেন্দ্রকে প্রথম হইতে অসীম বিশ্বাস ও ভালবাসার নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। ঐ বিশ্বাস ও ভালবাসা তাঁহার হৃদয়ে আজীবন সমভাবে প্রবাহিত থাকিয়া নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার প্রেমে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। অতএব বুঝা যাইতেছে, বিশ্বাস ও ভালবাসার ভিত্তিতে সর্ব্বদা দণ্ডায়মান থাকিয়া ঠাকুর নরেন্দ্রকে শিক্ষাপ্রদান ও সময়ে সময়ে পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, যোগদৃষ্টি-সহায়ে নরেন্দ্রনাথের মহত্ত্ব এবং জীবনোদ্দেশ্য জানিতে পারিয়াও ঠাকুর তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন কেন? উত্তরে বলা যাইতে পারে, মায়ার অধিকারে প্রবিষ্ট হইয়া দেহধারণ করিলে মানবসাধারণের কা কথা—ঠাকুরের ন্যায় দেব-মানবদিগের দৃষ্টিও স্বল্পবিস্তর পরিচ্ছিন্ন

হইয়া দৃষ্ট-বিষয়ে ভ্রম-সম্ভাবনা উপস্থিত করে। সে জন্যই কখন কখন ঐরূপ পরীক্ষার আবশ্যক হইয়া থাকে। ঠাকুর আমাদিগকে ঐ বিষয় বুঝাইতে যাইয়া বলিতেন, "খাদ্ না থাকিলে গড়ন হয় না," অথবা বিশুদ্ধ স্বর্ণের সহিত অন্য ধাতু মিলিত না করিলে যেমন উহাতে অলঙ্কার গঠন করা চলে না, সেইরূপ জ্ঞানপ্রকাশক শুদ্ধ সত্ত্বগুণের সহিত রজঃ ও তমোগুণ কিঞ্চিন্মাত্র মিলিত না হইলে উহা হইতে অবতার-পুরুষদিগের ন্যায় দেহ-মনও উৎপন্ন হইতে পারে না। ঠাকুরের সাধনকালের আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপায় অদ্ভুত জ্ঞানপ্রকাশ উপস্থিত হইয়া অলৌকিক দর্শনসমূহ তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইলেও, তিনি কত সময়ে ঐসকল দর্শন সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পুনরায় পরীক্ষা করিয়া তবে উহাদিগকে নিশ্চিন্তমনে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে তাঁহার যে-সকল অদ্ভুত দর্শন এখন উপস্থিত হইয়াছিল সে-সকলকেও তিনি যে পরীক্ষাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন, ইহাতে বিচিত্র কি আছে ?

নরেন্দ্রকে পরীক্ষা করিবার কারণ

নরেন্দ্রনাথের প্রতি ঠাকুরের আচরণের পাঁচটি বিভিন্ন বিভাগ পূর্ব্বোক্তরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলেও উহাদিগের মধ্যে বিশ্বাস ও ভালবাসা, পরীক্ষা এবং শিক্ষাপ্রদানরূপ তিনটি বিভাগের কার্য্য যে প্রায় যুগপৎ আরব্ধ হইয়াছিল, এ কথা স্বীকার করিতে হয়। উক্ত তিন বিভাগের মধ্যে প্রথম বিভাগের কার্য্যের অথবা নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের অসীম বিশ্বাস ও ভালবাসার পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে

ঠাকুর নরেন্দ্রকে যেভাবে দেখিতেন

পাঠককে সংক্ষেপে দিয়াছি। ঐ বিষয়ের আরও অনেক কথা আমাদিগকে পরে বলিতে হইবে। কারণ, এখন হইতে ঠাকুরের জীবন নরেন্দ্রনাথের জীবনের সহিত যেরূপ বিশেষভাবে জড়িত হইয়াছিল, তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত অন্য কোন ভক্তের জীবনের সহিত উহা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও ঐরূপে মিলিত হয় নাই। কথিত আছে, ভগবান ঈশা তাঁহার কোন শিষ্যপ্রবরের সহিত মিলিত হইবামাত্র বলিয়াছিলেন, "পর্ব্বতসদৃশ অচল অটল শ্রদ্ধাসম্পন্ন এই পুরুষের জীবনকে ভিত্তিস্বরূপে অবলম্বন করিয়া আমি আমার আধ্যাত্মিক মন্দির গঠিত করিয়া তুলিব!" নরেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইয়া ঠাকুরের মনেও ঐরূপ ভাব দৈবপ্রেরণায় প্রথম হইতেই উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুর দেখিয়াছিলেন, নরেন্দ্র তাঁহার বালক, তাঁহার সখা, তাঁহার আদেশ পালন করিতেই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এবং তাঁহার ও তাহার জীবন পূর্ব্ব হইতে চিরকালের মত প্রণয়িযুগলের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন প্রেমবন্ধনে সম্বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে!— তবে, ঐ প্রেম উচ্চ আধ্যাত্মিক প্রেম, যাহা প্রেমাস্পদকে সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা প্রদান করিয়াও যুগে যুগে আপনার করিয়া রাখে— যাহাতে আপনার জন্য কিছু না চাহিয়া পরস্পর পরস্পরকে যথাসর্ব্বস্বদানেই কেবলমাত্র পরিতৃপ্তি লাভ করে। বাস্তবিক ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা অহেতুক প্রেমের যেরূপ অভিনয় দেখিয়াছি, সংসার ইতিপূর্ব্বে আর কখনও ঐরূপ দেখিয়াছে কিনা সন্দেহ। সেই অলৌকিক প্রেমাভিনয়ের কথা পাঠককে যথাযথভাবে বুঝাইবার আমাদিগের সামর্থ্য কোথায়? তথাপি সত্যানুরোধে উহার আভাস প্রদানের চেষ্টা মাত্র করিয়া আমরা

নরেন্দ্রের সহিত ঠাকুরের সর্ব্বপ্রকার আচরণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

ঠাকুরের একনিষ্ঠা, ত্যাগ এবং পবিত্রতা দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ যেমন তাঁহার প্রতি প্রথম দিন হইতে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, ঠাকুরও বোধ হয় তেমনি যুবক নরেন্দ্রের অসীম আত্মবিশ্বাস, তেজস্বিতা এবং সত্যপ্রিয়তা-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া প্রথমদর্শন হইতে তাঁহাকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। যোগদৃষ্টি-সহায়ে নরেন্দ্রনাথের মহত্ত্ব ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ঠাকুর যাহা দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা গণনায় না আনিয়া যদি আমরা এই দুই পুরুষপ্রবরের পরস্পরের প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণের কারণ-অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কথাই প্রতীয়মান হয়। অন্তর্দৃষ্টিশূন্য জনসাধারণ শ্রীযুত নরেন্দ্রের অদ্ভুত আত্মবিশ্বাসকে দম্ভ বলিয়া, অসীম তেজস্বিতাকে ঔদ্ধত্য বলিয়া এবং কঠোর সত্যপ্রিয়তাকে মিথ্যা ভান অথবা অপরিণত বুদ্ধির নিদর্শন বলিয়া ধারণা করিয়াছিল। লোকপ্রশংসালাভে তাঁহার একান্ত উদাসীনতা, স্পষ্টবাদিতা, সর্ব্ববিষয়ে নিঃসঙ্কোচ স্বাধীন ব্যবহার এবং সর্ব্বোপরি কোন কার্য্য কাহারও ভয়ে গোপন না করা হইতেই তাহারা যে ঐরূপ মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিল, একথা নিঃসন্দেহ। আমাদের মনে আছে, শ্রীযুত নরেন্দ্রের সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার জনৈক প্রতিবেশী তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়া একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "এই বাটীতে একটা ছেলে আছে, তাহার মত ত্রিপণ্ড ছেলে কখন দেখি নাই; বি.এ. পাশ করেছে বলে যেন ধরাকে সরা দেখে-

নরেন্দ্রের সম্বন্ধে সাধারণের ভ্রমধারণা

বাপ্ খুড়োর সামনেই তবলায় চাঁটি দিয়ে গান ধরলে, পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে দিয়েই চুরুট খেতে খেতে চল্‌লো—এইরূপ সকল বিষয়ে!" উহার স্বল্পকাল পরে ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া একদিন—বোধ হয় সেদিন আমরা দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া তাঁহার পুণ্য-দর্শনলাভে ধন্য হইয়াছিলাম—আমরা নরেন্দ্রনাথের গুণানুবাদ এইরূপে শুনিতে পাইয়াছিলাম—

রতন নামক যদুলাল মল্লিকের উদ্যানবাটীর প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত কথা কহিতে কহিতে আমাদিগকে দেখাইয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "এরা সব ছেলে মন্দ নয়, দেড়টা পাশ করিয়াছে (এফ্.এ. পাশ দিবার জন্য সেই বৎসর আমরা প্রস্তুত হইতেছিলাম), শিষ্ট, শান্ত; কিন্তু নরেন্দ্রের মত একটি ছেলেও আর দেখিতে পাইলাম না!—যেমন গাইতে-বাজাতে, তেমনি লেখাপড়ায়, তেমনি বলতে-কইতে, আবার তেমনি ধর্ম্মবিষয়ে! সে রাত-ভোর ধ্যান করে, ধ্যান করতে করতে সকাল হয়ে যায়, হুঁশ থাকে না!—আমার নরেন্দ্রের ভিতর এতটুকু মেকি নাই, বাজিয়ে দেখ—টং টং করছে। আর সব ছেলেদের দেখি, যেন চোখ-কান টিপে কোনও রকমে দু'তিনটে পাস করেছে, ব্যস্, এই পর্য্যন্ত—ঐ করতেই যেন তাদের সমস্ত শক্তি বেরিয়ে গেছে। নরেন্দ্রের কিন্তু তা নয়, হেসে খেলে সব কাজ করে, পাস করাটা যেন তার কাছে কিছুই নয়! সে ব্রাহ্মসমাজেও যায়, সেখানে ভজন গায়, কিন্তু অন্য সকল ব্রাহ্মের ন্যায় নয়—সে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী। ধ্যান করতে বসে তার জ্যোতিঃ-দর্শন হয়। সাধে নরেন্দ্রকে এত ভালবাসি?" ঐরূপ শ্রবণে মুগ্ধ

ঠাকুরের নিকট হইতে গ্রন্থকারের নরেন্দ্রের প্রশংসা-শ্রবণ

হইয়া নরেন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত হইবার মানসে আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মহাশয়, নরেন্দ্র কোথায় থাকে ?" তদুত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "নরেন্দ্র বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র, বাড়ী শিমলায়।" পরে কলিকাতায় ফিরিয়া অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলাম, আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রতিবেশীর নিকট হইতে যাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত নিন্দাবাদ শুনিয়াছিলাম সেই যুবকই ঠাকুরের বহুপ্রশংসিত নরেন্দ্রনাথ ! বিস্মিত হইয়া আমরা সেদিন ভাবিয়াছিলাম, বাহিরের কতকগুলি কার্য্যমাত্র অবলম্বন করিয়া আমরা সময়ে সময়ে অপরের সম্বন্ধে কতদূর অন্যায় সিদ্ধান্ত করিয়া বসি !

পূর্ব্বোক্ত প্রসঙ্গে আর একটি কথা এখানে বলিলে মন্দ হইবে না। ঠাকুরের শ্রীমুখে নরেন্দ্রনাথের ঐরূপ গুণানুবাদ শুনিবার কয়েক মাস পূর্ব্বে জনৈক বন্ধুর ভবনে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের দর্শনলাভ একদিন আমাদিগের ভাগ্যে উপস্থিত হইয়াছিল। সেদিন তাঁহাকে দর্শনমাত্রই করিয়াছিলাম, ভ্রমধারণাবশতঃ তাঁহার সহিত আলাপ করিতে অগ্রসর হই নাই। কিন্তু তাঁহার সেই দিনকার কথাগুলি এমন গভীরভাবে আমাদিগের স্মৃতিতে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে যে, এতকাল পরেও উহাদিগকে যেন কাল শুনিয়াছি এইরূপ মনে হইয়া থাকে। কথাগুলি বলিবার পূর্ব্বে যে অবস্থায় আমরা উহাদিগকে শ্রবণ করিয়াছিলাম, তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস পাঠককে দেওয়া কর্ত্তব্য; নতুবা শ্রীযুত নরেন্দ্রের সম্বন্ধে সেদিন আমাদিগের কেন ভ্রমধারণা উপস্থিত হইয়াছিল, সে কথা বুঝিতে পারা যাইবে না।

প্রথম দর্শনদিবসে নরেন্দ্রের সম্বন্ধে গ্রন্থকারের ভ্রমধারণা।

যে বন্ধুর আলয়ে আমরা সেদিন শ্রীযুত নরেন্দ্রকে দেখিয়াছিলাম, তিনি তখন কলিকাতার শিমলাপল্লীস্থ গৌরমোহন মুখার্জ্জির লেনে নরেন্দ্রের বাসভবনের সম্মুখেই একটি দ্বিতলবাটী ভাড়া করিয়া ছিলেন। স্কুলে পড়িবার কালে আমরা চারি-পাঁচ বৎসর সহপাঠী ছিলাম। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি বিলাত যাইবেন বলিয়া বোম্বাই পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে সমুদ্রপারে গমনে অসমর্থ হইয়া একখানি সংবাদপত্রের সম্পাদক হইয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালায় প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিয়া পুস্তকসকল প্রণয়ন করিতেছিলেন। কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন এবং ঐ ঘটনার পরে নানা লোকের মুখে শুনিতে পাইয়াছিলাম, তাঁহার স্বভাব উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে এবং নানা অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেছেন না। ঘটনা সত্য বা মিথ্যা নির্দ্ধারণ করিবার জন্যই আমরা সেদিন সহসা তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলাম।

জনৈক বন্ধুর ভবনে নরেন্দ্রকে প্রথম দেখা

ভৃত্যের দ্বারা সংবাদ পাঠাইয়া আমরা বাহিরের ঘরে উপবিষ্ট আছি, এমন সময়ে একজন যুবক সহসা সেই ঘরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং গৃহস্বামীর পরিচিতের ন্যায় নিঃসঙ্কোচে নিকটস্থ একটি তাকিয়ায় অর্দ্ধশায়িত হইয়া একটি হিন্দী গীতের একাংশ গুণ গুণ করিয়া গাহিতে লাগিলেন। যতদূর মনে আছে, গীতটি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক, কারণ 'কানাই' ও 'বাঁশরী' এই দুইটি শব্দ কর্ণে স্পষ্ট প্রবেশ করিয়াছিল। সৌখীন না হইলেও, যুবকের পরিষ্কার পরিচ্ছদ, কেশের পারিপাট্য

ঐ কালে নরেন্দ্রের বাহ্যিক আচরণ

এবং উন্মনা দৃষ্টির সহিত 'কালার বাঁশরী'র গান ও আমাদিগের উচ্ছৃঙ্খল বন্ধুর সহ ঘনিষ্ঠতার সংযোগ করিয়া লইয়া আমরা তাঁহাকে বিশেষ সুনয়নে দেখিতে পারিলাম না। গৃহমধ্যে আমরা যে বসিয়া রহিয়াছি তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, তাঁহাকে ঐরূপ নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার এবং পরে তামাকু সেবন করিতে দেখিয়া আমরা ধারণা করিয়া বসিলাম, আমাদিগের উচ্ছৃঙ্খল বন্ধুর ইনি একজন বিশ্বস্ত অনুচর এবং এইরূপ লোকের সহিত মিলিত হইয়াই তাঁহার অধঃপতন হইয়াছে। সে যাহা হউক, গৃহমধ্যে আমাদের অস্তিত্ব দেখিয়াও তিনি ঐরূপ বিষম উদাসীনতা অবলম্বন করিয়া আপন ভাবে থাকায় আমরাও তাঁহার সহিত পরিচয়ে অগ্রসর হইলাম না।

বন্ধুর সহিত নরেন্দ্রের সাহিত্য-সম্বন্ধীয় আলাপ

কিছুক্ষণ পরে আমাদিগের বাল্য-বন্ধু বাহিরে আসিলেন এবং বহুকাল পরে পরস্পরে সাক্ষাৎলাভ করিলেও আমাদিগকে দুই-একটি কথা মাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াই পূর্ব্বোক্ত যুবকের সহিত সানন্দে নানা বিষয়ের আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ঐরূপ উদাসীনতা ভাল লাগিল না। তথাপি সহসা বিদায়গ্রহণ করাটা ভদ্রোচিত নহে ভাবিয়া সাহিত্যসেবী বন্ধু যুবকের সহিত ইংরাজী ও বঙ্গ সাহিত্য সম্বন্ধে যে বাক্যালাপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, আমরা তদ্বিষয় শ্রবণ করিতে লাগিলাম। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য যথাযথ ভাব-প্রকাশক হইবে, এই বিষয়ে উভয়ে অনেকাংশে একমত হইয়া কথা আরম্ভ করিলেও মনুষ্যজীবনের যে কোন প্রকার ভাবপ্রকাশক রচনাকেই সাহিত্য বলা উচিত কি না, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। যতদূর মনে আছে, সকল প্রকার

ভাবপ্রকাশক রচনাকেই সাহিত্যশ্রেণীভুক্ত করিবার পক্ষ আমাদিগের বন্ধু অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং যুবক ঐ পক্ষ খণ্ডনপূর্ব্বক তাঁহাকে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন যে, সু বা কু যে কোন প্রকার ভাব যথাযথ প্রকাশ করিলেও রচনাবিশেষ যদি সুরুচিসম্পন্ন এবং কোন প্রকার উচ্চাদর্শের প্রতিষ্ঠাপক না হয়, তাহা হইলে উহাকে কখনই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-শ্রেণীমধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে না। আপনপক্ষ সমর্থনের জন্য যুবক তখন 'চসর' (Chaucer) হইতে আরম্ভ করিয়া যত খ্যাতনামা ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যিকের পুস্তকসকলের উল্লেখ করিয়া একে একে দেখাইতে লাগিলেন তাঁহারা সকলেই ঐরূপ করিয়া সাহিত্যজগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। উপসংহারে যুবক বলিয়াছিলেন, "সু এবং কু সকল প্রকার ভাব উপলব্ধি করিলেও, মানুষ তাহার অন্তরের আদর্শবিশেষকে প্রকাশ করিতেই সর্ব্বদা সচেষ্ট রহিয়াছে। আদর্শবিশেষের উপলব্ধি ও প্রকাশ লইয়াই মানবদিগের ভিতর যত তারতম্য বর্ত্তমান। দেখা যায়, সাধারণ মানব রূপরসাদি ভোগসকলকে নিত্য ও সত্য ভাবিয়া তল্লাভকেই সর্ব্বদা জীবনোদ্দেশ্য করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে—They idealise what is apparently real. পশুদিগের সহিত তাহাদিগের স্বল্পই প্রভেদ। তাহাদিগের দ্বারা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসৃষ্টি কখনই হইতে পারে না। আর এক শ্রেণীর মানব আছে, যাহারা আপাতনিত্য ভোগসুখাদিলাভে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া উচ্চ উচ্চতর আদর্শসকল অন্তরে অনুভব করিয়া বহিঃস্থ সকল বিষয় সেই ছাঁচে গড়িবার চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে—They want to realise the ideal. ঐরূপ মানবই যথার্থ

সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে। উহাদিগের মধ্যে আবার যাহারা সর্ব্বোচ্চ আদর্শ অবলম্বন করিয়া উহা জীবনে পরিণত করিতে ছুটে, তাহাদিগকে প্রায়ই সংসারের বাহিরে যাইয়া দাঁড়াইতে হয়। ঐরূপ আদর্শ জীবনে পূর্ণভাবে পরিণত করিতে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবকেই কেবলমাত্র দেখিয়াছি—সে জন্যই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকি।"

উহার পরে ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রের মহত্ত্বের পরিচয়লাভ

যুবকের ঐ প্রকার গভীর ভাবপূর্ণ বাক্য এবং পাণ্ডিত্যে সেদিন চমৎকৃত হইলেও, আমাদিগের বন্ধুর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিয়া তাঁহার কথায় ও কাজে মিল নাই ভাবিয়া আমরা ক্ষুন্ন হইয়াছিলাম। অনন্তর বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক আমরা সে স্থান হইতে চলিয়া আসিয়া-ছিলাম। ঐ ঘটনার কয়েক মাস পরে আমরা ঠাকুরের নিকটে শ্রীযুত নরেন্দ্রের গুণানুবাদশ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার জন্য তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইয়াছিলাম এবং পূর্ব্বপরিদৃষ্ট যুবককে ঠাকুরের বহু প্রশংসিত নরেন্দ্রনাথ বলিয়া জানিতে পারিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলাম।

প্রথম দেখা হইতে ঠাকুরের নরেন্দ্রকে বুঝিতে পারা

গতানুগতিক স্বভাবসম্পন্ন সাধারণ মানব ঐরূপে নরেন্দ্রনাথের বাহ্য আচরণসমূহ দেখিয়া তাঁহাকে দাম্ভিক, উদ্ধত এবং অনাচারী বলিয়া অনেক সময়ে ধারণা করিয়া বসিলেও, ঠাকুর কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কখনও ঐরূপ ভ্রমে পতিত হয়েন নাই। প্রথম দর্শনকাল হইতেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, নরেন্দ্রের দম্ভ ও ঔদ্ধত্য তাঁহার অন্তর্নিহিত অসাধারণ মানসিক শক্তিসমূহের ফলস্বরূপ বিশাল

আত্মবিশ্বাস হইতে সমুদিত হয়, তাঁহার নিরঙ্কুশ স্বাধীন আচরণ তাঁহার স্বাভাবিক আত্মসংযমের পরিচায়ক ভিন্ন অন্য কিছু নহে, তাঁহার লোকমান্যে উদাসীনতা তদীয় পূত স্বভাবের আত্মপ্রসাদ হইতেই সমুত্থিত হইয়া থাকে। তিনি বুঝিয়াছিলেন, কালে নরেন্দ্রের অসাধারণ স্বভাব সহস্রদল কমলের ন্যায় পূর্ণ বিকশিত হইয়া নিজ অনুপম গৌরব ও মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন তাপদগ্ধ সংসারের সংঘর্ষে আসিয়া তাঁহার ঐ দম্ভ ও ঔদ্ধত্য অসীম করুণাকারে পরিণত হইবে, তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্ব আত্মবিশ্বাস হতাশ প্রাণে বিশ্বাসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবে, তাঁহার স্বাধীন আচরণ সংযমরূপ সীমায় সর্ব্বথা অবস্থিত থাকিয়া যথার্থ স্বাধীনতালাভের উহাই একমাত্র পথ বলিয়া অপরকে নির্দ্দেশ করিবে।

সেই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথম পরিচয়ের দিন হইতেই ঠাকুর সকলের নিকটে শতমুখে নরেন্দ্রের প্রশংসা করিতেছেন।

উচ্চ আধার বুঝিয়া নরেন্দ্রকে প্রকাশ্যে প্রশংসা

প্রকাশ্যভাবে সর্ব্বদা প্রশংসালাভ করিলে দুর্ব্বল মনে অহঙ্কার প্রবৃদ্ধ হইয়া তাহাকে বিনাশের পথে অগ্রসর করে, একথা বিশেষভাবে জানিয়াও যে তিনি নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন, তাহার কারণ—তিনি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন নরেন্দ্রের হৃদয়-মন ঐরূপ দুর্ব্বলতা হইতে অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থান করিতেছে। বিষয়ক কয়েকটি দৃষ্টান্তের এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক ঐ কথা বুঝিতে পারিবেন—

মহামনস্বী শ্রীযুত কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্রাহ্মনেতৃগণ ঠাকুরের সহিত সম্মিলিত হইয়া

একদিন একত্র সমাসীন রহিয়াছেন। যুবক নরেন্দ্রও তথায় উপবিষ্ট আছে। ঠাকুর ভাবমুখে অবস্থিত হইয়া প্রসন্নমনে কেশব ও বিজয়ের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পরে নরেন্দ্রনাথের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবামাত্র তাহার ভাবী জীবনের উজ্জ্বল চিত্র তাঁহার মানসপটে সহসা অঙ্কিত হইয়া উঠিল এবং উহার সহিত কেশব-প্রমুখ ব্যক্তিদিগের পরিণত জীবনের তুলনা করিয়া তিনি পরমস্নেহে নরেন্দ্রনাথকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে সভাভঙ্গ হইলে বলিলেন, "দেখিলাম, কেশব যেরূপ একটা শক্তির বিশেষ উৎকর্ষে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে, নরেন্দ্রের ভিতর ঐরূপ আঠারটা শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান! আবার দেখিলাম, কেশব ও বিজয়ের অন্তর দীপশিখার ন্যায় জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল রহিয়াছে; পরে নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখি, তাহার ভিতরের জ্ঞান-সূর্য্য উদিত হইয়া মায়া-মোহের লেশ পর্য্যন্ত তথা হইতে দূরীভূত করিয়াছে!" অন্তর্দৃষ্টিশূন্য দুর্ব্বলচেতা মানব ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে ঐরূপ প্রশংসালাভ করিলে অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া আত্মহারা হইয়া পড়িত। নরেন্দ্রের মনে কিন্তু উহাতে সম্পূর্ণ বিপরীত ফলের উদয় হইল। তাঁহার অলৌকিক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মন উহাতে আপনার ভিতরে ডুবিয়া যাইয়া শ্রীযুত কেশব ও বিজয়ের অশেষ গুণরাজীর সহিত নিজ তাৎকালিক মানসিক অবস্থার নিরপেক্ষ তুলনায় প্রবৃত্ত হইল এবং আপনাকে ঐরূপ প্রশংসালাভের অযোগ্য দেখিয়া ঠাকুরের কথায় তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিল—"মহাশয় করেন কি? লোকে আপনার ঐরূপ কথা শুনিয়া আপনাকে উন্মাদ বলিয়া

নরেন্দ্রের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা

নিশ্চয় করিবে। কোথায় জগদ্বিখ্যাত কেশব ও মহামনা বিজয় এবং কোথায় আমার ন্যায় একটা নগণ্য স্কুলের ছোঁড়া!—আপনি তাঁহাদিগের সহিত আমার তুলনা করিয়া আর কখনও ঐরূপ কথাসকল বলিবেন না।" ঠাকুর উহাতে তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, "কি কর্‌ব রে, তুই কি ভাবিস্ আমি ঐরূপ বলিয়াছি, মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা) আমাকে ঐরূপ দেখাইলেন, তাই বলিয়াছি; মা ত আমাকে সত্য ভিন্ন মিথ্যা কখনও দেখান নাই, তাই বলিয়াছি।"

নরেন্দ্রের ঐ কথার প্রতিবাদ

'মা দেখাইয়াছেন ও বলাইয়াছেন' বলিলেই ঠাকুর যে ঐরূপ স্থলে নরেন্দ্রের হস্তে সর্ব্বদা নিষ্কৃতি পাইতেন, তাহা নহে। তাঁহার ঐরূপ দর্শনসকলের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়া স্পষ্টবাদী নির্ভীক নরেন্দ্র অনেক সময়ে বলিয়া বসিতেন, "মা দেখাইয়া থাকেন অথবা আপনার মাথার খেয়ালে ঐ সকল উপস্থিত হয়, তাহা কে বলিতে পারে? আমার ঐরূপ হইলে আমি নিশ্চয় বুঝিতাম, আমার মাথার খেয়ালে ঐরূপ দেখিতে পাইতেছি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করিয়াছে, চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়সকল আমাদিগকে অনেক স্থলে প্রতারিত করে। তদুপরি বিষয়বিশেষ-দর্শনের বাসনা যদি আমাদিগের মনে সতত জাগরিত থাকে, তাহা হইলে ত কথাই নাই, উহারা (ইন্দ্রিয়গ্রাম) আমাদিগকে পদে পদে প্রতারিত করিয়া থাকে। আপনি আমাকে স্নেহ করেন এবং সকল বিষয়ে আমাকে বড় দেখিতে ইচ্ছা করেন—সেইজন্য হয় ত আপনার ঐরূপ দর্শনসকল আসিয়া উপস্থিত হয়।"

ঐরূপ বলিয়া শ্রীযুত নরেন্দ্র পাশ্চাত্য শারীর-বিজ্ঞানে স্বসংবেদ্য দর্শনসমূহ সম্বন্ধে যে সকল অনুসন্ধান ও গবেষণা আছে এবং যেরূপে তাহাদিগকে ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া প্রমাণিত করা হইয়াছে, সেই সকল বিষয় নানা দৃষ্টান্ত সহায়ে ঠাকুরকে বুঝাইতে সময়ে সময়ে অগ্রসর হইতেন। ঠাকুরের মন যখন উচ্চ ভাবভূমিতে অবস্থান করিত, তখন নরেন্দ্রের ঐরূপ বাল-সুলভ চেষ্টাকে সত্যনিষ্ঠার পরিচায়কমাত্র ভাবিয়া তিনি তাহার উপর অধিকতর প্রসন্ন হইতেন। কিন্তু সাধারণ ভাবভূমিতে অবস্থানকালে নরেন্দ্রের তীক্ষ্ণ যুক্তিসকল ঠাকুরের বালকের ন্যায় স্বভাবসম্পন্ন সরল মনকে অভিভূত করিয়া কখন কখন বিষম ভাবাইয়া তুলিত। তখন মুগ্ধ হইয়া তিনি ভাবিতেন, "তাইত, কায়মনোবাক্যে সত্যপরায়ণ নরেন্দ্র ত মিথ্যা বলিবার লোক নহে; তাহার ন্যায় দৃঢ় সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিসকলের মনে সত্য ভিন্ন মিথ্যা সঙ্কল্পের উদয় হয় না, এ কথা শাস্ত্রেও আছে; তবে কি আমার দর্শনসমূহের ভ্রমসম্ভাবনা আছে?" আবার ভাবিতেন, "কিন্তু আমি ত ইতিপূর্ব্বে নানারূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা) আমাকে সত্য ভিন্ন মিথ্যা কখন দেখান নাই এবং তাঁহার শ্রীমুখ হইতে বারংবার আশ্বাসও পাইয়াছি, তবে সত্যপ্রাণ নরেন্দ্র আমার দর্শনসকল মাথার খেয়ালে উপস্থিত হয়, একথা বলে কেন? —কেন তাহার মন বলিবামাত্র ঐ সকলকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করে না?"

নরেন্দ্রের তর্কশক্তিতে মুগ্ধ হইয়া ঠাকুরের জগন্মাতাকে জিজ্ঞাসা

ঐরূপ ভাবনায় পতিত হইয়া মীমাংসার জন্য ঠাকুর অবশেষে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে ঐকথা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং "ওর (নরেন্দ্রের)

কথা শুনিস্ কেন? কিছুদিন পরে ও (নরেন্দ্র) সব কথা সত্য বলে মান্‌বে"—তাঁহার শ্রীমুখ হইতে এইরূপ আশ্বাস-বাণী শুনিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপে এখানে একদিনের ঘটনার উল্লেখ করিলেই পাঠকের পূর্ব্বোক্ত বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইবে—

ঐ বিষয়ক দৃষ্টান্ত—সাধারণ সমাজে ঠাকুরের নরেন্দ্রকে দেখিতে আসা

তখন কুচবিহার-বিবাহে মতভেদ লইয়া ব্রাহ্মগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়াছেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা কয়েক বৎসর হইল হইয়া গিয়াছে। নরেন্দ্রনাথ শ্রীযুত কেশবের নিকট সময়ে সময়ে গমনাগমন করিলেও সাধারণ সমাজেই নিয়মিতভাবে যোগদানপূর্ব্বক রবিবাসরীয় উপাসনাকালে তথায় ভজনাদি করিতেছেন। কোন কারণবশতঃ নরেন্দ্র এই সময়ে দুই-এক সপ্তাহ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে যাইতে পারেন নাই। ঠাকুর প্রতিদিন তাঁহার আগমন প্রতীক্ষাপূর্ব্বক নিরাশ হইয়া স্থির করিলেন স্বয়ং কলিকাতায় যাইয়া অদ্য নরেন্দ্রকে দেখিয়া আসিবেন। পরে মনে পড়িল, সেদিন রবিবার—নরেন্দ্র যদি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে কোথাও গমন করে এবং কলিকাতায় যাইয়াও তাহার দেখা না পান? তখন স্থির করিলেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সান্ধ্যোপাসনাকালে সে ভজন গাহিতে নিশ্চিত উপস্থিত হইবে, সেখানে যাইলেই তাহাকে দেখিতে পাইব। আবার ভাবিলেন, সহসা সমাজে ঐরূপে উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মভক্তগণের অসন্তোষের কারণ হইব না ত? পরক্ষণেই মনে হইল—কেন, কেশবের সমাজে ঐরূপে কয়েকবার উপস্থিত হইয়াও ত তাঁহাদিগের সন্তোষ ভিন্ন অসন্তোষ দেখি নাই এবং বিজয়,

শিবনাথ প্রভৃতি সাধারণ সমাজের নেতৃগণ দক্ষিণেশ্বরে ঐরূপে ইতিপূর্ব্বে অনেক সময় আসিয়াছেন ? ঠাকুরের সরল মন ঐরূপ মীমাংসা করিবার কালে একটি বিষয় স্মরণ করিতে বিস্মৃত হইল। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীযুত কেশব ও বিজয়ের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মতের পরিবর্ত্তন লক্ষ্যপূর্ব্বক শিবনাথ-প্রমুখ সাধারণ সমাজভুক্ত ব্রাহ্মগণের অনেকে যে তাঁহার নিকটে পূর্ব্বের ন্যায় গমনাগমন ক্রমশঃ ছাড়িয়া দিতেছেন, এ কথা ঠাকুরের মনে ক্ষণকালের জন্যও উদিত হইল না। না হইবারই কথা—কারণ ঈশ্বরের প্রতি তীব্র অনুরাগে মানব-মন উচ্চ ভাবভূমিকায় আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার পূর্ণ কৃপাসৌভাগ্যলাভে যত অগ্রসর হইবে, ততই তাঁহার ইতিপূর্ব্বের ধর্ম্মমতসকল ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইবে, এ বিষয়ের সত্যতা তিনি আজীবন প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সত্যপ্রিয় ব্রাহ্মগণ সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্যই এতকাল সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন, অতএব আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসকলের ইতি নির্দ্দেশ করিতে তাঁহারা যে এখন ভিন্ন পথে অগ্রসর হইবেন, এ কথা তিনি বুঝিবেন কিরূপে!

তাঁহার তথায় আগমনের ফল

সন্ধ্যা সমাগতা। শত ব্রাহ্মভক্তের পূত হৃদয়োচ্ছ্বাস 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি মন্ত্রসহায়ে উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মিলিত হইতে লাগিল। ক্রমে উপাসনা ও ধ্যান পরিসমাপ্ত করিয়া ঈশ্বরানুরাগ ও আধ্যাত্মিক ঐকান্তিকতা-বৃদ্ধির জন্য আচার্য্য বেদী হইতে ব্রাহ্মসঙ্ঘকে সম্বোধনপূর্ব্বক উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময়ে অর্দ্ধবাহ্য-অবস্থাপন্ন ঠাকুর ব্রাহ্মমন্দিরে

প্রবিষ্ট হইয়া বেদিকায় উপবিষ্ট আচার্য্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার সহসা আগমনের বার্ত্তা সঙ্ঘমধ্যে প্রচারিত হইতে বিলম্ব হইল না এবং ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা তাঁহাকে কখন দর্শন করেন নাই, তাঁহাদিগের কেহ বা দণ্ডায়মান হইয়া, কেহ বা বেঞ্চির উপরে উঠিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। ঐরূপে সঙ্ঘমধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে দেখিয়া আচার্য্য নিজ কার্য্য-সাধনে বিরত হইলেন এবং ভজন-মণ্ডলীমধ্যে উপবিষ্ট নরেন্দ্রনাথ, ঠাকুর যেজন্য সহসা তথায় উপস্থিত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বেদীস্থ আচার্য্য বা সমাজস্থ অন্য কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়া ঠাকুরকে সাদরাহ্বান করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে বিজয়কৃষ্ণ-প্রমুখ ব্রাহ্মগণের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত মতদ্বৈধ-আনয়নের কারণরূপে নিশ্চয় করিয়া তাঁহার প্রতি সাধারণ শিষ্টাচার-প্রদর্শনেও সেদিন উদাসীন হইয়া রহিলেন।

ঠাকুর এদিকে কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া বেদীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার উক্ত অবস্থা দেখিবার জন্য উপস্থিত জনসাধারণের আগ্রহবৃদ্ধি হওয়ায় পূর্ব্ব-বিশৃঙ্খলতার বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইল না এবং উহা নিবারণ করা অসম্ভব দেখিয়া জনতা ভাঙ্গিয়া দিবার উদ্দেশ্যে সমাজ-গৃহের প্রায় সমস্ত গ্যাসালোক নির্ব্বাপিত করা হইল। ফলে মন্দিরের বাহিরে আসিবার জন্য অন্ধকারে জনতামধ্যে বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হইল।

জনতানিবারণ জন্য গ্যাস নির্ব্বাণ করা

সমাজস্থ কেহ ঠাকুরকে সাদরে গ্রহণ করিলেন না দেখিয়া শ্রীযুত নরেন্দ্র ইতিপূর্ব্বে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। অন্ধকারে কিরূপে তাঁহাকে মন্দিরের বাহিরে আনয়ন করিবেন, তদ্বিষয়ে তিনি এখন বিষম চিন্তিত হইলেন। অতঃপর ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হইবামাত্র মন্দিরের পশ্চাতের দ্বার দিয়া তিনি তাঁহাকে কোনরূপে বাহিরে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহার সহিত গাড়ীতে উঠিয়া তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে পৌছাইয়া দিলেন। নরেন্দ্র বলিতেন, "আমার জন্য ঠাকুরকে সেদিন ঐরূপে লাঞ্ছিত হইতে দেখিয়া মনে কতদূর দুঃখ-কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলা অসম্ভব। ঐ কার্য্যের জন্য তাঁহাকে সেদিন কত না তিরস্কার করিয়াছিলাম! তিনি কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঘটনায় ক্ষুণ্ণ হওয়া বা আমার কথায় কর্ণপাত করা, কিছুই করেন নাই।

নরেন্দ্রের ঠাকুরকে কোনরূপে বাহিরে আনয়ন ও দক্ষিণেশ্বরে পৌছাইয়া দেওয়া

"আমার প্রতি ভালবাসার জন্য তিনি ঐরূপে আপনার দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখেন না দেখিয়া তাঁহার উপর বিষম কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতেও কখন কখন কুণ্ঠিত হই নাই। বলিতাম পুরাণে আছে, ভরত রাজা 'হরিণ' ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যুর পরে হরিণ হইয়াছিল, একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আপনার আমার বিষয়ে অত চিন্তা করার পরিণাম ভাবিয়া সতর্ক হওয়া উচিত! বালকের ন্যায় সরল ঠাকুর আমার ঐসকল কথা শুনিয়া বিষম চিন্তিত হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, 'ঠিক বলেছিস্; তাই ত রে, তা হলে কি হবে,

তাহাকে ভালবাসিবার জন্য নরেন্দ্রের ঠাকুরকে তিরস্কার ও তাঁহার জগন্মাতার বাণী শুনিয়া আশ্বস্ত হওয়া

আমি যে তোকে না দেখে থাকতে পারি না।' দারুণ বিমর্ষ হইয়া ঠাকুর মাকে (শ্রীশ্রীজগদম্বাকে) ঐ কথা জানাইতে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'যা শালা, আমি তোর কথা শুনব না, মা বললেন—'তুই ওকে (নরেন্দ্রকে) সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানিস্, তাই ভালবাসিস্, যেদিন ওর (নরেন্দ্রের) ভিতর নারায়ণকে না দেখতে পাবি, সেদিন ওর মুখ দেখতেও পারবি না।' ঐরূপে আমি ইতিপূর্ব্বে যত কথা বুঝাইয়াছিলাম, ঠাকুর সেই সকলকে এক কথায় সেই দিন উড়াইয়া দিয়াছিলেন।"

ষষ্ঠ অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ

নরেন্দ্রের মহত্ত্ব সম্বন্ধে ঠাকুরের বাণী

নরেন্দ্রনাথের পবিত্র হৃদয়-মন উচ্চভাবসমূহকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা কার্য্যে অগ্রসর হয়, ঠাকুরের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এ কথা প্রথম দিন হইতে ধরিতে সক্ষম হইয়াছিল। নরেন্দ্রের সহিত ঠাকুরের দৈনন্দিন আচরণসকল সেজন্যই অন্যভাবের হইতে নিত্য দেখা যাইত। ভগবদ্ভক্তির হানি হইবে বলিয়া আহার, বিহার, শয়ন, নিদ্রা, জপ, ধ্যানাদি সর্ব্ববিধ বিষয়ে যে ঠাকুর নানা নিয়ম স্বয়ং পালনপূর্ব্বক নিজ ভক্তসকলকে ঐরূপ করিতে সর্ব্বদা উৎসাহিত করিতেন, তিনিই আবার নিঃসঙ্কোচে সকলের সমক্ষে এ কথা বারম্বার স্পষ্ট বলিতেন,—নরেন্দ্র ঐ নিয়মসকলের ব্যতিক্রম করিলেও তাহার কিছুমাত্র প্রত্যবায় হইবে না! 'নরেন্দ্র নিত্যসিদ্ধ'—'নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ'—'নরেন্দ্রের ভিতরে জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বদা প্রজ্জলিত থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার আহার্য্য-দোষকে ভস্মীভূত করিয়া দিতেছে, সেজন্য যেখানে-সেখানে যাহা-তাহা ভোজন করিলেও তাহার মন কলুষিত বা বিক্ষিপ্ত হইবে না'—'জ্ঞানখড়্গ-সহায়ে সে মায়াময় সমস্ত বন্ধনকে নিত্য খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলিতেছে, মহামায়া সেজন্য তাহাকে কোন মতে নিজায়ত্তে আনিতে পারিতেছেন না,'—নরেন্দ্রের সম্বন্ধে ঐরূপ কত কথাই না আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে নিত্য শুনিতে পাইয়া তখন বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতাম!

মাড়োয়ারী আনীত আহার্য্য নরেন্দ্রকে দান

মাড়োয়ারী ভক্তগণ ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়া মিছরি, পেস্তা, বাদাম, কিস্‌মিস্‌ প্রভৃতি নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য তাঁহাকে উপহার প্রদান করিয়া যাইল। ঠাকুর ঐ সকলের কিছুমাত্র স্বয়ং গ্রহণ করিলেন না, সমীপাগত কোন ভক্তকেও দিলেন না, বলিলেন, "উহারা (মাড়োয়ারীরা) নিষ্কামভাবে দান করিতে আদৌ জানে না, সাধুকে এক খিলি পান দিবার সময়েও ষোলটা কামনা তাহার সহিত জুড়িয়া দেয়, ঐরূপ সকাম দাতার অন্ন-ভোজনে ভক্তির হানি হয়!" সুতরাং প্রশ্ন উঠিল—তাহাদের প্রদত্ত দ্রব্যসকল কি করা যাইবে? ঠাকুর বলিলেন, "যা, নরেন্দ্রকে ঐ সকল দিয়ে আয়, সে ঐ সকল খাইলেও তাহার কোন হানি হইবে না!"

নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজনে নরেন্দ্রের ভক্তিহানি হইবে না

নরেন্দ্র হোটেলে খাইয়া আসিয়া ঠাকুরকে বলিল, "মহাশয়, আজ হোটেলে সাধারণে যাহাকে অখাদ্য বলে, খাইয়া আসিয়াছি।" ঠাকুর বুঝিলেন, নরেন্দ্র বাহাদুরী-প্রকাশের জন্য ঐ কথা বলিতেছে না, কিন্তু সে ঐরূপ করিয়াছে বলিয়া তাহাকে স্পর্শ করিতে বা তাঁহার গৃহস্থিত ঘটি বাটি প্রভৃতি পাত্র-সকল ব্যবহার করিতে দিতে যদি তাঁহার আপত্তি থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইতে পারিবেন, এজন্য ঐরূপ বলিতেছে। ঐরূপ বুঝিয়া বলিলেন, "তোর তাহাতে দোষ লাগিবে না; শোর গোরু খাইয়া যদি কেহ ভগবানে মন রাখে, তাহা হইলে উহা হবিষ্যান্নের তুল্য, আর শাকপাতা খাইয়া যদি বিষয়-বাসনায় ডুবে থাকে, তাহা

হইলে উহা শোর গোরু খাওয়া অপেক্ষা কোন অংশে বড় নহে। তুই অখাদ্য খাইয়াছিস্ তাহাতে আমার কিছুই মনে হইতেছে না, কিন্তু (অন্য সকলকে দেখাইয়া) ইহাদিগের কেহ যদি আসিয়া ঐ কথা বলিত, তাহা হইলে তাহাকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারিতাম না!"

ঠাকুরের ভালবাসায় নরেন্দ্রের উন্নতি ও আত্মবিক্রয়

ঐরূপে প্রথম দর্শনকাল হইতে শ্রীযুত নরেন্দ্র ঠাকুরের নিকটে যেরূপ ভালবাসা, প্রশংসা ও সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠককে যথাযথ বুঝান একপ্রকার সাধ্যাতীত বলিয়া বোধ হয়। মহানুভব শিষ্যের আন্তরিক শক্তির এতদূর সম্মান রাখিয়া তাহার সহিত সর্ব্ববিষয়ে আচরণ করা জগদ্গুরুগণের জীবনেতিহাসে অন্যত্র কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। ঠাকুর অন্তরের সকল কথা নরেন্দ্রনাথকে না বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না, সকল বিষয়ে তাঁহার মতামত গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইতেন, তাঁহার সহিত তর্ক করাইয়া সমীপাগত ব্যক্তিসকলের বুদ্ধি ও বিশ্বাসের বল পরীক্ষা করিয়া লইতেন এবং সম্যক্রূপে পরীক্ষা না করিয়া কোন বিষয় সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে তাঁহাকে কখনও অনুরোধ করিতেন না। বলা বাহুল্য, ঠাকুরের ঐরূপ আচরণ শ্রীযুত নরেন্দ্রের আত্মবিশ্বাস, পুরুষকার, সত্যপ্রিয়তা ও শ্রদ্ধাভক্তিকে স্বল্পকালের মধ্যেই শতধারে বাড়াইয়া তুলিয়াছিল এবং তাঁহার অসীম বিশ্বাস ও ভালবাসা দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় চতুর্দ্দিকে অবস্থানপূর্ব্বক অসীম স্বাধীনতাপ্রিয় নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার অজ্ঞাতসারে সর্ব্বত্র সকল প্রকার প্রলোভন ও হীন আচরণের

হস্ত হইতে নিত্য রক্ষা করিয়াছিল। ঐরূপে প্রথম দর্শন-দিবসের পরে বৎসরকাল অতীত হইতে না হইতে শ্রীযুত নরেন্দ্র ঠাকুরের প্রেমে চিরকালের নিমিত্ত আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুরের অহেতুক প্রেমপ্রবাহ তাঁহাকে ধীরে ধীরে ঐ পথে কতদূর অগ্রসর করিয়াছে, তাহা কি তখন তিনি সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন ? —বোধ হয় নহে। বোধ হয়, ঠাকুরের অপার্থিব প্রেমলাভে অননুভূতপূর্ব্ব বিশুদ্ধ আনন্দে তাঁহার হৃদয় নিরন্তর পূর্ণ ও পরিতৃপ্ত থাকিত বলিয়া উহা যে কতদূর দুর্লভ দেববাঞ্ছিত পদার্থ—তাহা স্বার্থপর কঠোর সংসারের সংঘর্ষে আসিয়া তুলনায় বিশেষরূপে বুঝিতে তখনও তাঁহার কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট ছিল। পূর্ব্বোক্ত কথাসকল পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করাইতে কয়েকটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করিলে মন্দ হইবে না—

ঠাকুরের নিকটে শ্রীযুত নরেন্দ্রের আগমনের কয়েক মাস পরে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-প্রণেতা শ্রীযুত ম— দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরের পুণ্যদর্শন-লাভে ধন্য হইয়াছিলেন। বরাহনগরে অবস্থান করায় কিরূপে তখন তাঁহার কয়েকবার উপর্য্যুপরি ঠাকুরের নিকট আসিবার সুবিধা হইয়াছিল, ঠাকুরের দুই-চারিটি জ্ঞানগর্ভ শ্লেষপূর্ণ বাক্য তাঁহার জ্ঞানাভিমান বিদূরিত করিয়া কিরূপে তাঁহাকে চিরকালের মত বিনীত শিক্ষার্থীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, ঐ সকল কথা তিনি তৎপ্রণীত গ্রন্থের স্থানবিশেষে স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নরেন্দ্রনাথ বলিতেন, "ঐ কালে এক দিবস দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে রাত্রিযাপন করিয়া-

শ্রীযুত ম—র সহিত নরেন্দ্রের তর্ক বাধাইয়া দেওয়া

ছিলাম। পঞ্চবটীতলে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া আছি, এমন সময়ে ঠাকুর সহসা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হস্তধারণ-পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, 'আজ তোর বিদ্যা-বুদ্ধি বুঝা যাবে; তুই ত মোটে আড়াইটা পাশ করিয়াছিস্, আজ সাড়ে তিনটা পাশ[১] করা মাষ্টার এসেছে; চল্, তার সঙ্গে কথা কইবি।' অগত্যা ঠাকুরের সহিত যাইতে হইল এবং ঠাকুরের ঘরে যাইয়া শ্রীযুত ম—র সহিত পরিচিত হইবার পরে নানা বিষয় আলাপে প্রবৃত্ত হইলাম। ঐরূপে আমাদিগকে কথা কহিতে লাগাইয়া দিয়া ঠাকুর চুপ করিয়া বসিয়া আমাদিগের আলাপ শুনিতে ও আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। পরে শ্রীযুত ম— সেদিন বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক চলিয়া যাইলে বলিলেন, 'পাশ করিলে কি হয়, মাষ্টারটার মাদীভাব,[২] কথা কহিতেই পারে না!' ঠাকুর ঐরূপে আমাকে সকলের সহিত তর্কে লাগাইয়া দিয়া তখন রঙ্গ দেখিতেন।"

ভক্ত শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ঠাকুরের গৃহস্থভক্তগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। বোধ হয়, নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণেশ্বরে আসিবার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে ইনি ঠাকুরের নিকট গমনাগমন করিতেন। কিন্তু কর্ম্মস্থল পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা সহরে থাকায় পূজাদির অবকাশ ভিন্ন অন্য সময়ে ইনি ঠাকুরের নিকটে বড় একটা আসিতে পারিতেন না।

১ নরেন্দ্রনাথ তখন বি.এ. পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুত ম— বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন (বি.এল্.) পড়িতেছিলেন—সেই কথাই ঠাকুর ঐরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

২ ঠাকুর এস্থলে অন্ত শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

কেদারনাথ ভক্তসাধক ছিলেন এবং বৈষ্ণব-তন্ত্রোক্ত ভাব অবলম্বন করিয়া সাধন-পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। ভজন কীর্ত্তনাদি শুনিলে তাঁহার দু-নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইত। ঠাকুর সেজন্য সকলের নিকটে তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিতেন। কেদারনাথের ভগবৎ-প্রেম দেখিয়া ঢাকার বহুলোকে তাঁহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করিত। অনেকে আবার তাঁহার উপদেশমত ধর্ম্মজীবন-গঠনে অগ্রসর হইত। শুনা যায়, ঠাকুরের নিকটে যখন বহুলোকের সমাগম হইতে থাকে, তখন ধর্ম্ম-বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে পরিশ্রান্ত ও ভাবাবিষ্ট হইয়া তিনি এক সময়ে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে বলিয়াছিলেন, 'মা, আমি আর এত বক্‌তে পারি না; তুই কেদার, রাম, গিরিশ ও বিজয়কে[১] একটু একটু শক্তি দে, যাতে লোকে তাদের কাছে গিয়ে কিছু শেখবার পরে এখানে (আমার নিকটে) আসে এবং দুই-এক কথাতেই চৈতন্যলাভ করে!' —কিন্তু উহা অনেক পরের কথা।

কেদারের তর্কশক্তি ও নরেন্দ্রের সহিত প্রথম পরিচয়

কিছুকালের নিমিত্ত অবসর গ্রহণ করিয়া শ্রীযুত কেদার ঐ কালে কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক ঠাকুরের নিকটে মধ্যে মধ্যে আসিবার সুযোগলাভ করিয়াছিলেন। ঠাকুরও সাধক-ভক্তকে নিকটে পাইয়া পরম উৎসাহে তাঁহার সহিত ধর্ম্মালাপ করিতে এবং সমীপাগত অন্যান্য ভক্তগণকে তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দিতে-ছিলেন। শ্রীযুত নরেন্দ্র এই সময়ে একদিন ঠাকুরের নিকটে আসিয়া কেদারনাথকে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং ভজন

১ শ্রীযুত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, রামচন্দ্র দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

গাহিবার কালে তাঁহার ভাবাবেশ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পরে কেদারের সহিতও ঠাকুর কিছুক্ষণের জন্য নরেন্দ্রনাথের তর্ক বাধাইয়া দিয়াছিলেন। কেদার আপনার ভাবে মন্দ তর্ক করিতেন না এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর বাক্যের অযৌক্তিকতা সময়ে সময়ে তীক্ষ্ণ শ্লেষবাক্য-প্রয়োগে নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। বাদীকে এক দিন তিনি যে কথাগুলি বলিয়া নিরস্ত করিয়াছিলেন, তাহা ঠাকুরের বিশেষ মনোজ্ঞ হওয়ায় ঐরূপ প্রশ্ন কেহ পুনরায় তাঁহার নিকটে উত্থাপিত করিলে ঠাকুর প্রায়ই বলিতেন, কেদার ঐরূপ প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দেয়। বাদী সেদিন প্রশ্ন উঠাইয়াছিল, ভগবান যদি সত্যসত্যই দয়াময় হয়েন, তবে তাঁহার সৃষ্টিতে এত দুঃখকষ্ট অন্যায়-অত্যাচারাদি সৃজন করিয়াছেন কেন? যথেষ্ট অন্ন উৎপন্ন না হওয়ায় সময়ে সময়ে সহস্র সহস্র লোকের দুর্ভিক্ষে অনাহারে মৃত্যু হয় কেন? কেদার তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন, "দয়াময় হইয়াও ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্টিতে দুঃখ, কষ্ট, অপমৃত্যু ইত্যাদি রাখিবার কথা যেদিন স্থির করিয়াছিলেন, সেদিনকার মিটিং-এ (সভায়) আমাকে আহ্বান করেন নাই; সুতরাং কেমন করিয়া ঐকথা বুঝিতে পারিব?" কিন্তু নরেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ যুক্তিতে সকলের সম্মুখে কেদারকে অদ্য নিরস্ত হইতে হইয়াছিল।

কেদার বিদায় গ্রহণ করিবার পরে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কি রে, কেমন দেখ্‌লি? কেমন ভক্তি বল্ দেখি, ভগবানের নামে একেবারে কেঁদে ফেলে! হরি বলতে যার চোখে ধারা বয়, সে জীবন্মুক্ত; কেদারটি বেশ—নয়?" পবিত্র-হৃদয় তেজীয়ান্ নরেন্দ্রনাথ ধর্ম্মলাভ অথবা অন্য যে-কোন কারণে হউক,

যাহারা পুরুষ-শরীর ধারণপূর্ব্বক নারীসুলভ ভাব অবলম্বন করে, তাহাদিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। দৃঢ়সঙ্কল্প ও উত্তম-সহায়ে না হইয়া পুরুষ রোদন-মাত্রকে আশ্রয়-পূর্ব্বক ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইবে, একথা তাঁহার নিকটে পুরুষত্বের অবমাননা বলিয়া সর্ব্বদা প্রতীত হইত। ঈশ্বরে একান্ত নির্ভর করিলেও পুরুষ চিরকাল পুরুষই থাকিবে এবং পুরুষের ন্যায় তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিবে, তাঁহার এইরূপ মত ছিল। সুতরাং ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত কথা সম্পূর্ণহৃদয়ে অনুমোদন করিতে না পারিয়া তিনি বলিলেন, "তা মহাশয়, আমি কেমন করিয়া জানিব? আপনি (লোক-চরিত্র) বুঝেন, আপনি বলিতে পারেন। নতুবা কান্নাকাটি দেখিয়া ভালমন্দ কিছুই বুঝা যায় না। একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে চোখ দিয়া অমন কত জল পড়ে! আবার শ্রীমতীর বিরহসূচক কীর্ত্তনাদি শুনিয়া যাহারা কাঁদে, তাহাদের অধিকাংশ নিজ নিজ স্ত্রীর সহিত বিরহের কথা স্মরণ বা আপনাতে ঐ অবস্থার আরোপ করিয়া কাঁদে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐরূপ অবস্থার সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত আমার ন্যায় ব্যক্তিগণের মাথুর কীর্ত্তন শুনিলেও অন্যের ন্যায় সহজে কাঁদিবার প্রবৃত্তি কখনই আসিবে না।" ঐরূপে শ্রীযুত নরেন্দ্র যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, জিজ্ঞাসিত হইলে তাহা ঠাকুরের নিকটে সর্ব্বদা নির্ভয় অন্তরে প্রকাশ করিতেন। ঠাকুরও উহাতে সর্ব্বদা প্রসন্ন ভিন্ন কখনও রুষ্ট হইতেন না। কারণ অন্তর্দ্দর্শী ঠাকুর নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন, সত্যপ্রাণ নরেন্দ্রের ভাবের ঘরে কিছুমাত্র চুরি নাই।

ঠাকুরের জিজ্ঞাসায় কেদারের সম্বন্ধে নরেন্দ্রের নিজমত প্রকাশ

সাকারোপাসনার জন্য নরেন্দ্রের তিরস্কার, রাখালের ভয় ও ঠাকুরের কথায় উভয়ের মধ্যে পুনরায় প্রীতিস্থাপন

ঠাকুরের দর্শনলাভের স্বল্পকাল পূর্ব্বে নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়াছিলেন। নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাসবান হইয়া কেবলমাত্র তাঁহারই উপাসনা ও ধ্যানধারণা করিবেন, এই মর্ম্মে ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীকারপত্রে এই সময়ে তিনি সহি করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হইয়া উক্ত সমাজ-প্রচলিত সামাজিক আচারব্যবহারাদি অবলম্বন করিবার সঙ্কল্প তাঁহার মনে কখন উদিত হয় নাই। শ্রীযুত রাখাল এই কালের পূর্ব্ব হইতেই নরেন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত ছিলেন এবং অনেক সময় তাঁহার সহিত অতিবাহিত করিতেন। শিশুর ন্যায় কোমল-প্রকৃতিসম্পন্ন নির্ভরশীল রাখালচন্দ্র যে নরেন্দ্রনাথের সপ্রেম ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সর্ববিষয়ে নিয়ন্ত্রিত হইবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সুতরাং নরেন্দ্রনাথের পরামর্শে তিনিও ঐ সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজের পূর্ব্বোক্ত প্রকার অঙ্গীকারপত্রে সহি করিয়াছিলেন। ঐ ঘটনার স্বল্পকাল পরেই রাখালচন্দ্র ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে কৃতার্থ হয়েন এবং তাঁহার উপদেশে সাকারোপাসনার সুপ্ত প্রীতি রাখালের অন্তরে পুনরায় জাগরিত হইয়া উঠে। উহার কয়েক মাস পরে নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে আসিতে আরম্ভ করেন এবং রাখাল-চন্দ্রকে তথায় দেখিয়া পরম প্রীত হয়েন। কিছুদিন পরে নরেন্দ্রনাথ দেখিতে পাইলেন, রাখালচন্দ্র ঠাকুরের সহিত মন্দিরে যাইয়া দেব-বিগ্রহসকলকে প্রণাম করিতেছেন। সত্যপরায়ণ নরেন্দ্র উহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া রাখালচন্দ্রকে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া তীব্র অনুযোগ

করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীকারপত্রে সহি করিয়া পুনরায় মন্দিরে যাইয়া প্রণাম করায় তোমাকে মিথ্যাচারে দূষিত হইতে হইয়াছে।" কোমল-প্রকৃতি রাখাল বন্ধুর ঐরূপ কথায় নীরব রহিলেন এবং তদবধি কিছুকাল তাঁহার সহিত দেখা করিতে ভীত ও সঙ্কুচিত হইতে লাগিলেন। পরিশেষে ঠাকুর রাখালচন্দ্রের ঐরূপ হইবার কারণ জানিতে পারিয়া নরেন্দ্রনাথকে মিষ্টবাক্যে নানাভাবে বুঝাইয়া বলিলেন, "দেখ্, রাখালকে আর কিছু বলিস্ নি, সে তোকে দেখলেই ভয়ে জড়সড় হয়; তার এখন সাকারে বিশ্বাস হয়েছে, তা কি করবে, বল্; সকলে কি প্রথম হইতে নিরাকার ধারণা করতে পারে?" শ্রীযুত নরেন্দ্রও তদবধি রাখালের প্রতি দোষারোপ করিতে ক্ষান্ত হইলেন।

অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী করিতে ঠাকুরের চেষ্টা ও নরেন্দ্রের প্রতিবাদ

নরেন্দ্রনাথকে উত্তম অধিকারী জানিয়া প্রথম দিন হইতে ঠাকুর তাঁহাকে অদ্বৈততত্ত্বে বিশ্বাসবান্ করিতে প্রযত্ন করিতেন। দক্ষিণেশ্বরে আসিলেই তিনি তাঁহাকে অষ্টাবক্র-সংহিতাদি গ্রন্থসকল পাঠ করিতে দিতেন। নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের দ্বৈতভাবে উপাসনায় নিযুক্ত নরেন্দ্রনাথের চক্ষে ঐসকল গ্রন্থ তখন নাস্তিক্য-দোষ-দুষ্ট বলিয়া মনে হইত। ঠাকুরের অনুরোধে একটু-আধটু পাঠ করিবার পরেই তিনি স্পষ্ট বলিয়া বসিতেন, "ইহাতে আর নাস্তিকতাতে প্রভেদ কি? সৃষ্ট জীব আপনাকে স্রষ্টা বলিয়া ভাবিবে? ইহা অপেক্ষা অধিক পাপ আর কি হইতে পারে? আমি ঈশ্বর, তুমি ঈশ্বর, জন্ম-মরণশীল যাবতীয় পদার্থ সকলই ঈশ্বর—ইহা অপেক্ষা অযুক্তিকর কথা অন্য কি হইবে?

গ্রন্থকর্ত্তা ঋষিমুনিদের নিশ্চয় মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল, নতুবা এমন সকল কথা লিখিবেন কিরূপে?" —ঠাকুর স্পষ্টবাদী নরেন্দ্রনাথের ঐরূপ কথা শুনিয়া হাসিতেন এবং সহসা তাঁহার ঐরূপ ভাবে আঘাত না করিয়া বলিতেন, "তা তুই ঐ কথা এখন নাই বা নিলি, তা বলে মুনিঋষিদের নিন্দা ও ঈশ্বরীয় স্বরূপের ইতি করিস্ কেন? তুই সত্যস্বরূপ ভগবানকে ডাকিয়া যা, তারপর তিনি তোর নিকটে যে ভাবে প্রকাশিত হইবেন, তাহাই বিশ্বাস করিবি।" কিন্তু ঠাকুরের ঐ কথা নরেন্দ্র বড় একটা শুনিতেন না। কারণ, যুক্তি দ্বারা যাহার প্রতিষ্ঠা হয় না, তাহাই তাঁহার নিকট তখন মিথ্যা বলিয়া মনে হইত এবং সর্ব্বপ্রকার মিথ্যার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। সুতরাং ঠাকুর ভিন্ন অন্য অনেকের নিকটেও কথাপ্রসঙ্গে অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে নানারূপ যুক্তি প্রদর্শন করিতে এবং সময়ে সময়ে শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না।

প্রতাপচন্দ্র হাজরা

প্রতাপচন্দ্র হাজরা নামক এক ব্যক্তি তখন দক্ষিণেশ্বর-উদ্যানে অবস্থান করিতেন। প্রতাপের সাংসারিক অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায় স্বচ্ছল ছিল না। সেজন্য, ধর্ম্মলাভে প্রযত্ন করিলেও অর্থকামনা তাঁহার অন্তরে অনেক সময় আধিপত্য লাভ করিত। সুতরাং তাঁহার ধর্ম্মাচরণের মূলে প্রায়ই সকাম ভাব থাকিত। কিন্তু বাহিরে ঐ কথা কাহাকেও জানিতে দেওয়া দূরে থাকুক, তিনি সর্ব্বদা নিষ্কামভাবে উপাসনার উচ্চ উচ্চ কথাসকল লোকের নিকটে বলিয়া প্রশংসালাভে উদ্যত হইতেন। শুদ্ধ তাহাই নহে, ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিবার কালে প্রতি পদে

নিজ লাভ-লোকসান খতাইয়া দেখা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল এবং বোধ হয়, জপ-তপাদির দ্বারা কোনপ্রকার সিদ্ধাই লাভ করিয়া নিজ অর্থকামনা পূরণ করিবেন, এ কথাও মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে উঁকি-ঝুঁকি মারিত। ঠাকুর প্রথম দিন হইতেই তাঁহার অন্তরের ঐ প্রকার ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং উহা ত্যাগ করিয়া যথার্থ নিষ্কামভাবে ঈশ্বরকে ডাকিতে তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। দুর্ব্বলচেতা হাজরা ঠাকুরের ঐ কথা কেবল যে লইতে পারেন নাই তাহা নহে, কিন্তু ভ্রমধারণা, অহঙ্কার এবং স্বার্থসিদ্ধির প্রেরণায় ঠাকুরের দর্শনকামনায় আগত ব্যক্তিসকলের নিকটে অবসর পাইলেই প্রচার করিতেন যে, তিনিও স্বয়ং একটা কম সাধু নহেন। ঐরূপ করিলেও বোধ হয় তাঁহার অন্তরে সৎ হইবার যথার্থ ইচ্ছা একটু-আধটু ছিল। কারণ, ঠাকুর তাঁহার ঐ প্রকার কার্য্য-কলাপের কথা নিত্য জানিতে পারিলেও এবং উহার জন্য কখন কখন তীব্র তিরস্কার করিলেও তাঁহাকে তথা হইতে এককালে তাড়াইয়া দেন নাই। তবে তিনি আমাদিগের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও তাঁহার সহিত অধিক মিশামিশি করিতে সতর্ক করিয়া দিতেন; বলিতেন, "হাজরা শালার ভারি পাটোয়ারি বুদ্ধি, ওর কথা শুনিস্ নি।"

হাজরা মহাশয়ের বুদ্ধিমত্তার নরেন্দ্রের প্রসন্নতা

অন্যান্য দোষ-গুণের সহিত হাজরা মহাশয়ের অন্তরে সহসা কোন বিষয় বিশ্বাস করিব না, এ ভাবটিও ছিল। তাঁহার ন্যায় স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিগণের তুলনায় তাঁহার বুদ্ধিও মন্দ ছিল না। সেজন্য নরেন্দ্রনাথের ন্যায় ইংরাজি-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যখন পাশ্চাত্য সন্দেহবাদী দার্শনিকগণের মতামত আলোচনা করিতেন, তখন

তিনি উহার কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেন। বুদ্ধিমান নরেন্দ্র ঐজন্য তাঁহার উপর প্রসন্ন ছিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরে আসিলেই অবকাশমত দুই-এক ঘণ্টাকাল হাজরা মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়া কাটাইতেন। নরেন্দ্রনাথের প্রখর বুদ্ধির সম্মুখে হাজরার মস্তক সর্ব্বদা অবনত হইত! তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রীযুত নরেন্দ্রের কথাগুলি শুনিতেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে তামাক সাজিয়া খাওয়াইতেন। হাজরার প্রতি নরেন্দ্রের ঐরূপ সদয় ভাব দেখিয়া আমরা অনেকে রহস্য করিয়া বলিতাম, "হাজরা মহাশয় হচ্চেন নরেন্দ্রের 'ফেরেণ্ড' (friend)।"

নরেন্দ্রের দক্ষিণেশ্বরে আগমনে ঠাকুরের আচরণ

নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে আসিলে ঠাকুর অনেক সময় তাঁহাকে দেখিবামাত্র ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। পরে অর্দ্ধ-বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পরমানন্দে তাঁহার সহিত ধর্ম্মালাপে নিযুক্ত থাকিতেন। ঐ সময়ে তিনি যেন নানা কথায় ও চেষ্টায় উচ্চ আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষসমূহ তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে প্রযত্ন করিতেন। কখন বা ঐরূপ সময়ে তাঁহার গান (ভজন) শুনিবার ইচ্ছা হইত এবং নরেন্দ্রের সুমধুর কণ্ঠ শুনিবামাত্র পুনরায় সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। নরেন্দ্রনাথের গান কিন্তু ঐজন্য থামিত না, তন্ময় হইয়া তিনি কয়েক ঘণ্টা কাল একের পর অন্য গীত গাহিয়া যাইতেন। ঠাকুর আবার অর্দ্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া হয় ত নরেন্দ্রনাথকে কোন একটি বিশেষ সঙ্গীত গাহিতে অনুরোধ করিতেন। কিন্তু সর্ব্বশেষে নরেন্দ্রের মুখ হইতে 'যো কুছ্ হ্যায় সো তুহি হ্যায়' সঙ্গীতটি না শুনিলে তাঁহার পূর্ণ পরিতৃপ্তি হইত না। পরে

অদ্বৈতবাদের নানা রহস্য, যথা—জীব ও ঈশ্বরের প্রভেদ, জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ ইত্যাদি কথায় কতক্ষণ অতিবাহিত হইত। এইরূপে নরেন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে দক্ষিণেশ্বরে আনন্দের তুফান ছুটিত।

ঠাকুর ঐরূপে নরেন্দ্রনাথকে একদিবস অদ্বৈতবিজ্ঞানের জীব-ব্রহ্মের ঐক্যসূচক অনেক কথা বলিয়াছিলেন। নরেন্দ্র ঐ সকল কথা মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়াও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না এবং ঠাকুরের কথা সমাপ্ত হইলে হাজরা মহাশয়ের নিকটে উপবিষ্ট হইয়া তামাকু সেবন করিতে করিতে পুনরায় ঐ সকল কথার আলোচনাপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "উহা কি কখন হইতে পারে? ঘটিটা ঈশ্বর, বাটিটা ঈশ্বর, যাহা কিছু দেখিতেছি এবং আমরা সকলেই ঈশ্বর?" হাজরা মহাশয়ও নরেন্দ্রনাথের সহিত যোগদান করিয়া ঐরূপ ব্যঙ্গ করায় উভয়ের মধ্যে হাস্যের রোল উঠিল। ঠাকুর তখনও অর্দ্ধবাহ্যদশায় ছিলেন। নরেন্দ্রকে হাসিতে শুনিয়া তিনি বালকের ন্যায় পরিধানের কাপড়খানি বগলে লইয়া বাহিরে আসিলেন এবং 'তোরা কি বল্‌ছিস রে' বলিয়া হাসিতে হাসিতে নিকটে আসিয়া নরেন্দ্রকে স্পর্শ করিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন।

অদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে নরেন্দ্রের হাজরার নিকটে জল্পনা ও ঠাকুরের তাহাকে ভাবাবেশে স্পর্শ

নরেন্দ্রনাথ বলিতেন, "ঠাকুরের ঐদিনকার অদ্ভুত স্পর্শে মুহূর্ত্ত-মধ্যে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। স্তম্ভিত হইয়া সত্যসত্যই দেখিতে লাগিলাম, ঈশ্বর ভিন্ন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অন্য কিছুই আর নাই! ঐরূপ দেখিয়াও কিন্তু নীরব রহিলাম, ভাবিলাম—দেখি কতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ ভাব থাকে। কিন্তু সেই ঘোর সেদিন কিছুমাত্র কমিল না।

বাটীতে ফিরিলাম, সেখানেও তাহাই—যাহা কিছু দেখিতে
লাগিলাম, সে সকলই তিনি, এইরূপ বোধ হইতে লাগিল।

উহার ফলে নরেন্দ্রের অদ্ভুত দর্শন

খাইতে বসিলাম, দেখি অন্ন, থাল, যিনি পরিবেশন করিতেছেন, সে-সকলই এবং আমি নিজেও তিনি ভিন্ন অন্য কেহ নহে! দুই-এক গ্রাস খাইয়াই স্থির হইয়া বসিয়া রাহলাম। 'বসে আছিস্ কেন রে, খা না'—মার ঐরূপ কথায় হুঁশ হওয়ায় আবার খাইতে আরম্ভ করিলাম। ঐরূপে খাইতে, শুইতে, কলেজে যাইতে, সকল সময়েই ঐরূপ দেখিতে লাগিলাম এবং সর্ব্বদা কেমন একটা ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া রহিলাম। রাস্তায় চলিয়াছি, গাড়ী আসিতেছে দেখিতেছি, কিন্তু অন্য সময়ের ন্যায় উহা ঘাড়ে আসিয়া পড়িবার ভয়ে সরিবার প্রবৃত্তি হইত না!—মনে হইত, উহাও যাহা আমিও তাহাই! হস্ত-পদ এই সময়ে সর্ব্বদা অসাড় হইয়া থাকিত এবং আহার করিয়া কিছুমাত্র তৃপ্তি হইত না। মনে হইত যেন অপর কেহ খাইতেছে। খাইতে খাইতে সময়ে সময়ে শুইয়া পড়িতাম এবং কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া আবার খাইতে থাকিতাম। এক একদিন ঐরূপে অনেক অধিক খাইয়া ফেলিতাম। কিন্তু তাহার জন্য কোনরূপ অসুখও হইত না!—মা ভয় পাইয়া বলিতেন, 'তোর দেখ্ছি ভিতরে ভিতরে একটা বিষম অসুখ হয়েছে'—কখন কখন বলিতেন, 'ও আর বাঁচবে না।' যখন পূর্ব্বোক্ত আচ্ছন্ন ভাবটা একটু কমিয়া যাইত, তখন জগৎটাকে স্বপ্ন বলিয়া মনে হইত! হেদুয়া পুষ্করিণীর ধারে বেড়াইতে যাইয়া উহার চতুঃপার্শ্বের লোহরেলে মাথা ঠুকিয়া দেখিতাম, যাহা দেখিতেছি তাহা স্বপ্নের রেল অথবা সত্যকার

হস্ত-পদের অসাড়তার জন্য মনে হইত, পক্ষাঘাত হইবে না ত? ঐরূপে কিছুকাল পর্য্যন্ত ঐ বিষম-ভাবের ঘোর ও আচ্ছন্নতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই নাই। যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম, তখন ভাবিলাম উহাই অদ্বৈতবিজ্ঞানের আভাস! তবে ত শাস্ত্রে ঐ বিষয়ে যাহা লেখা আছে, তাহা মিথ্যা নহে। তদবধি অদ্বৈততত্ত্বের উপরে আর কখনও সন্দিহান হইতে পারি নাই।"

নরেন্দ্রের সহিত গ্রন্থকারের একদিবস আলাপের ফল

অন্য একটি আশ্চর্য্য ঘটনাও আমরা নরেন্দ্রনাথের নিকটে সময়ান্তরে শুনিতে পাইয়াছিলাম। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের শীতকালে, যখন তাঁহার সহিত আমরা বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছি, তখন তিনি আমাদিগের নিকটে ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদিগের অনুমান ঘটনাটি এই কালে হইয়াছিল। সেজন্য এইখানেই ঐ বিষয় পাঠককে বলিতেছি। আমাদিগের স্মরণ আছে, বেলা দুই প্রহরের কিছু পূর্ব্বে সেদিন আমরা সিমলার গৌরমোহন মুখার্জ্জির ষ্ট্রীটস্থ নরেন্দ্রনাথের ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলাম এবং রাত্রি প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত অতিবাহিত করিয়াছিলাম। শ্রীযুত রামকৃষ্ণানন্দ স্বামিজীও সেদিন আমাদিগের সঙ্গে ছিলেন। প্রথম দর্শন-দিন হইতে আমরা নরেন্দ্রের প্রতি যে দিব্য আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, বিধাতার নিয়োগে উহা সেদিন সহস্রগুণে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে আমরা ঠাকুরকে একজন ঈশ্বরজ্ঞানিত ব্যক্তি বা সিদ্ধপুরুষ মাত্র বলিয়া ধারণা করিয়াছিলাম। কিন্তু ঠাকুরের সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথের অদ্যকার প্রাণস্পর্শী কথাসমূহ আমাদের অন্তরে নূতন আলোক আনয়ন

করিয়াছিল। আমরা বুঝিয়াছিলাম, মহামহিম শ্রীচৈতন্য ও ঈশা প্রভৃতি জগদ্‌গুরু মহাপুরুষগণের জীবনেতিহাসে লিপিবদ্ধ যে সকল অলৌকিক ঘটনার কথা পাঠ করিয়া আমরা এতকাল অবিশ্বাস করিয়া আসিতেছি, তদ্রূপ ঘটনাসকল ঠাকুরের জীবনে নিত্যই ঘটিতেছে—ইচ্ছা বা স্পর্শমাত্রেই তিনি শরণাগত ব্যক্তির সংস্কার-বন্ধন মোচনপূর্ব্বক তাহাকে ভক্তি দিতেছেন, সমাধিস্থ করিয়া দিব্যানন্দের অধিকারী করিতেছেন, অথবা তাহার জীবনগতি আধ্যাত্মিক পথে এরূপভাবে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন যে, অচিরে ঈশ্বরদর্শন উপস্থিত হইয়া চিরকালের মত সে কৃতার্থ হইতেছে! আমাদের মনে আছে, ঠাকুরের কৃপালাভ করিয়া নিজ জীবনে যে দিব্যানুভবসমূহ উপস্থিত হইয়াছে, সে-সকলের কথা বলিতে বলিতে নরেন্দ্রনাথ সেদিন আমাদিগকে সন্ধ্যাকালে হেতুয়া পুষ্করিণীর ধারে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছিলেন এবং কিছুকালের জন্য আপনাতে আপনি মগ্ন থাকিয়া অন্তরের অদ্ভুত আনন্দাবেশ পরিশেষে কিন্নরকণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছিলেন—

"প্রেমধন বিলায় গোরা রায়!
চাঁদ নিতাই ডাকে আয় আয়।
(তোরা কে নিবি রে আয়।)
প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়!
প্রেমে শান্তিপুর ডুবু ডুবু
নদে ভেসে যায়!
(গৌর-প্রেমের হিল্লোলেতে)
নদে ভেসে যায়!"

গীত সাঙ্গ হইলে নরেন্দ্রনাথ যেন আপনাকে আপনি সম্বোধন-পূর্ব্বক ধীরে ধীরে বলিয়াছিলেন, "সত্যসত্যই বিলাইতেছেন! প্রেম বল, ভক্তি বল, জ্ঞান বল, মুক্তি বল, গোরা রায় যাহাকে যাহা ইচ্ছা তাহাকে তাহাই বিলাইতেছেন! কি অদ্ভুত শক্তি! (কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিবার পরে) রাত্রে ঘরে খিল দিয়া বিছানায় শুইয়া আছি, সহসা আকর্ষণ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে হাজির করাইলেন—শরীরের ভিতরে যেটা আছে সেইটাকে; পরে কত কথা কত উপদেশের পর পুনরায় ফিরিতে দিলেন! সব করিতে পারেন—দক্ষিণেশ্বরের গোরা রায় সব করিতে পারেন!"

নরেন্দ্রের অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া তামসী রাত্রিতে পরিণত হইয়াছে। পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পাইতেছি না, প্রয়োজনও হইতেছে না। —কারণ, নরেন্দ্রের জ্বলন্ত ভাবরাশি মরমে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তরে এমন এক দিব্য মাদকতা আনিয়া দিয়াছে—যাহাতে শরীর টলিতেছে এবং এতকালের বাস্তব জগৎ যেন দূরে স্বপ্নরাজ্যে অপসৃত হইয়াছে, আর অহেতুকী কৃপার প্রেরণায় অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের সান্তবৎ হইয়া উদয় হওয়া এবং জীবের সংস্কার-বন্ধন বিনষ্ট করিয়া ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন করারূপ সত্য—যাহা জগতের অধিকাংশের মতে অবাস্তব কল্পনাসম্ভূত—তাহা তখন জীবন্ত সত্য হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে!—সময় কোথা দিয়া কিরূপে পলাইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু সহসা শুনিতে পাইলাম রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে বিদায় গ্রহণ করিবার

গ্রন্থকারের বাসস্থানে আসিয়া নরেন্দ্রের অপূর্ব্ব উপলব্ধি

সঙ্কল্প করিতেছি, এমন সময়ে নরেন্দ্র বলিলেন, "চল, তোমাদিগকে কিছুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়া আসি।" যাইতে যাইতে আবার পূর্ব্বের ন্যায় কথাসকলের আলোচনা আরম্ভ হওয়ায় আমরা এতদূর তন্ময় হইয়া যাইলাম যে, চাঁপাতলার নিকটে বাটীতে পৌঁছিবার পরে মনে হইল, শ্রীযুত নরেন্দ্রকে এতদূর আসিতে দেওয়া ভাল হয় নাই। সুতরাং বাটীতে আহ্বান করিয়া কিছু জলযোগ করাইবার পরে বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহাদের বাটী পর্য্যন্ত তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলাম। সেদিনকার আর একটি কথাও বিলক্ষণ স্মরণ আছে। আমাদের বাটীতে প্রবেশ করিয়াই শ্রীযুত নরেন্দ্র সহসা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, "এ বাড়ী যে আমি ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি! ইহার কোথা দিয়া কোথা যাইতে হয়, কোথায় কোন্ ঘর আছে, সে সকলি যে আমার পরিচিত—আশ্চর্য্য!" নরেন্দ্রনাথের জীবনে সময়ে সময়ে ঐরূপ অনুভব আসিবার কথা এবং উহার কারণ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি। সেজন্য এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না।

সপ্তম অধ্যায়

ঠাকুরের পরীক্ষাপ্রণালী ও নরেন্দ্রনাথ

অসাধারণ লক্ষণসমূহ দর্শনে উত্তম অধিকারী স্থির করিয়া প্রথম মিলনের দিবস হইতে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে নিজ অদৃষ্টপূর্ব্ব অহেতুক ভালবাসায় আবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং পরে সময়ে সময়ে পরীক্ষা-পূর্ব্বক আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষাদানে অগ্রসর হইয়াছিলেন, একথা আমরা পাঠককে বলিয়াছি। অতএব কি ভাবে কতরূপে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ের কিঞ্চিদাভাস এখানে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

ঠাকুরের অদ্ভুত লোক-পরীক্ষা

কুচবিহার-বিবাহে মতভেদ লইয়া দলভঙ্গ হইবার উপক্রমে ঠাকুর কেশবচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "তুমি পরীক্ষা না করিয়া যাহাকে তাহাকে লইয়া দলবৃদ্ধি কর, সুতরাং তোমার দল ভাঙ্গিয়া যাইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? পরীক্ষা না করিয়া আমি কখন কাহাকেও গ্রহণ করি না।" বাস্তবিক, সমীপাগত ভক্তগণকে তাহাদিগের জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে ঠাকুর কতরূপে পরীক্ষা করিয়া লইতেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। মনে হয়, নিরক্ষর বলিয়া যিনি জনসমাজে আপনাকে পরিচিত করিয়াছেন, লোকচরিত্র বুঝিবার এই সকল অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব উপায় তিনি কোথা হইতে কেমনে আয়ত্ত করিয়াছিলেন! মনে হয়, উহা কি তাঁহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বিদ্যার ইহজন্মে স্বয়ং-প্রকাশ—অথবা, সাধন-প্রভাবে ঋষিকুলের ন্যায়

অতীন্দ্রিয়দর্শিত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভের ফল—অথবা, অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের নিকটে তিনি ঈশ্বরাবতার বলিয়া যে নিজ পরিচয় প্রদান করিতেন, সেই বিশেষত্বের কারণেই তাঁহার ঐরূপ জ্ঞানপ্রকাশ উপস্থিত হইয়াছিল? ঐরূপ নানা কথার মনে উদয় হইলেও ঐ বিষয়ের মীমাংসা করিতে আমরা সম্প্রতি অগ্রসর হইতেছি না, কিন্তু ঘটনাবলীর যথাযথ বিবরণ যতদূর সম্ভব প্রদানপূর্ব্বক পাঠকের উপরে ঐ বিষয়ের মীমাংসার ভার অর্পণ করিতেছি।

পরীক্ষা-প্রণালীর সাধারণ বিধি

লোকচরিত্র অবগত হইবার জন্য ঠাকুরকে যে-সকল উপায় অবলম্বন করিতে দেখিয়াছি, তদ্বিষয়ক কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই উহাদিগের অদ্ভুত অলৌকিকত্ব পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে, কিন্তু ঐরূপ করিবার পূর্ব্বে উহাদিগের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জানা বিশেষ প্রয়োজন। আমরা দেখিয়াছি, কোন ব্যক্তি ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাহার প্রতি একপ্রকার বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিতেন। ঐরূপ করিয়া যদি তাহার প্রতি তাঁহার চিত্ত কিছুমাত্র আকৃষ্ট হইত, তাহা হইলে তাহার সহিত সাধারণভাবে ধর্ম্মালাপে প্রবৃত্ত হইতেন এবং তাহাকে তাঁহার নিকটে যাওয়া-আসা করিতে বলিতেন। যত দিন যাইত এবং ঐ ব্যক্তি তাঁহার নিকটে যত গমনাগমন করিতে থাকিত ততই তিনি তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির গঠনভঙ্গী, মানসিক ভাবসমূহ, কামকাঞ্চনাসক্তি ও ভোগতৃষ্ণার পরিমাণ এবং তাঁহার প্রতি তাহার মন কি ভাবে কতদূর আকৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, চালচলন ও কথাবার্ত্তায় প্রকাশিত এই সকল বিষয়ে তন্ন তন্ন লক্ষ্য

রাখিয়া তাহার অন্তর্নিহিত সুপ্ত আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত ধারণায় উপস্থিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেন। ঐরূপে দুই-চারি দিন দর্শনের ফলেই তিনি ঐ ব্যক্তির চরিত্র সম্বন্ধে এককালে নিঃসন্দেহ হইতেন। পরে ঐ ব্যক্তির অন্তরের নিগূঢ় কোন কথা জানিবার প্রয়োজন হইলে তিনি তাঁহার যোগপ্রসূত সূক্ষ্মদৃষ্টিসহায়ে উহা জানিয়া লইতেন। ঐ সম্বন্ধে তিনি একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "রাত্রিশেষে একাকী অবস্থানকালে যখন তোদের কল্যাণ চিন্তা করিতে থাকি, তখন মা (জগদম্বা) সব কথা জানাইয়া ও দেখাইয়া দেন—কে কতদূর উন্নতিলাভ করিল, কাহার কিসের জন্য (ধর্ম্মবিষয়ে) উন্নতি হইতেছে না, ইত্যাদি।" ঠাকুরের উক্ত কথায় পাঠক যেন না ভাবিয়া বসেন, তাঁহার যোগদৃষ্টি কেবলমাত্র ঐ সময়েই উন্মীলিত হইত। তাঁহার অন্যান্য কথায় বুঝিতে পারা যায়, ইচ্ছামাত্র তিনি উচ্চ ভাবভূমিতে আরোহণপূর্ব্বক সকল সময়েই ঐরূপ দৃষ্টিলাভে সমর্থ হইতেন। যথা—"কাচের আলমারির দিকে দেখিলেই যেমন তাহার ভিতরের পদার্থসমূহ নয়নগোচর হয়, তেমনি মানুষের দিকে তাকাইলেই তাহার অন্তরের চিন্তা, সংস্কারাদি সকল বিষয় দেখিতে পাইয়া থাকি!"—ইত্যাদি।

ঠাকুর পূর্ব্বোক্তভাবে লোকচরিত্র অবগত হইতে সাধারণতঃ অগ্রসর হইলেও বিশেষ বিশেষ অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের সম্বন্ধে ঐ নিয়মের স্বল্পবিস্তর ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায়। দেখা যায়, তাহাদিগের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ তিনি দৈবপ্রেরণায় উচ্চ উচ্চতর ভাবভূমিতে অবস্থিত হইয়াই করিয়াছিলেন। 'লীলাপ্রসঙ্গে'র একস্থলে আমরা

পাঠককে বলিয়াছি, অদৃষ্টপূর্ব্ব সাধনাবলে ঠাকুরের শরীর মন, সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকশক্তি ধারণ ও জ্ঞাপনের বিচিত্র যন্ত্রস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ কথা এককালে বর্ণে বর্ণে সত্য। আমরা নিয়ত দেখিতে পাইতাম, যাহার ভিতর যেরূপ আধ্যাত্মিক ভাব বর্ত্তমান থাকিত তাহাকে দেখিবামাত্র তাঁহার অন্তর কোন্ এক দিব্য প্রেরণায় সহসা অনুরূপভাবে রঞ্জিত হইয়া উঠিত এবং পূর্ব্ব কর্ম্ম ও সংস্কারবশে আধ্যাত্মিক রাজ্যে যে যতদূর আরূঢ় হইয়াছে, তাহার আগমনমাত্রেই তাঁহার অন্তর স্বভাবতঃ ঐ ভূমিতে আরোহণ করিয়া আগন্তুকের অন্তরের কথা তাঁহাকে জানাইয়া দিত। নরেন্দ্র-নাথের প্রথম আগমনকালে ঠাকুরের যে-সকল উপলব্ধি আমরা ইতিপূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহাদিগের সহায়েই পাঠক আমাদিগের ঐ কথা বুঝিতে পারিবেন।

উচ্চ অধিকারীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎকালে ঠাকুরের অনুরূপ ভাবাবেশ

ঐরূপ হইলেও লোকচরিত্র-পরিজ্ঞানের জন্য ঠাকুর যে সাধারণ বিধি সর্ব্বদা অবলম্বন করিতেন, তাহা যে তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতেন না, তাহা নহে। সাধারণ ভাবভূমিতে অবস্থানকালে তাহাদিগের চালচলন, কথাবার্ত্তাদি তিনি উহার সহায়ে সমভাবে লক্ষ্য করিতেন এবং অন্যে পরে কা কথা, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথকেও তিনি ঐরূপে পরীক্ষা না করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই। অতএব ঐ বিষয়ের সহিত পাঠককে পরিচিত করা যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা বলা বাহুল্য। ভক্তদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য ঠাকুর যে উপায়-সমূহ অবলম্বন করিতেন, তাহাদিগের মধ্যে চারিটি প্রধান বিভাগ

পরীক্ষাপ্রণালীর চারি বিভাগ

নয়নগোচর হয়। আমরা ইতিপূর্ব্বেই ঐ বিষয় ইঙ্গিত করিয়াছি। অতএব ঐ বিভাগচতুষ্টয়ের প্রত্যেকের উল্লেখপূর্ব্বক দৃষ্টান্তসহায়ে উহা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করাইতে এখন প্রবৃত্ত হইতেছি :—

১ম—শারীরিক লক্ষণসমূহ দেখিয়া ঠাকুর সমীপাগত ব্যক্তিগণের অন্তরের প্রবল পূর্ব্বসংস্কারসমূহ নির্ণয় করিতেন।

(১) শারীরিক লক্ষণসমূহ দর্শনে অন্তরের সংস্কার নির্ণয়

মনের প্রত্যেক সুব্যক্ত চিন্তা ক্রিয়ারূপে পরিণত হইবার সহিত আমাদিগের মস্তিষ্কে এবং শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে এক একটা দাগ অঙ্কিত করিয়া যায়—বর্ত্তমান যুগের শরীর ও মনোবিজ্ঞান ঐ বিষয় অনেকাংশে প্রমাণিত করিয়া আমাদিগকে এখন ঐ কথায় শ্রদ্ধাবান করিতেছে। বেদপ্রমুখ শাস্ত্রসকল কিন্তু ঐ কথা চিরকাল বলিয়া আসিয়াছে। হিন্দুর শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, দর্শনাদি সকল শাস্ত্র সমস্বরে ঘোষণা করিয়াছে, 'মন সৃষ্টি করে এ শরীর'—ব্যক্তি-বিশেষের অন্তরের চিন্তাপ্রবাহ কু বা সু পথে চলিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীরও পরিবর্ত্তিত হইয়া অনুরূপ আকার ধারণ করিতে থাকে। সেইজন্য শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির গঠন দেখিয়া লোকের চরিত্রনির্ণয় করা সম্বন্ধে অনেক প্রবাদকথা আমাদিগের ভিতর প্রচলিত আছে এবং বিবাহ, দীক্ষাদান প্রভৃতি স্থলে কন্যা ও শিষ্যের হস্ত-পদ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল অবয়বের এবং সর্ব্বশরীরের গঠনপ্রকার দেখা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া একাল পর্য্যন্ত পরিগণিত হইয়া রহিয়াছে।

সর্ব্বশাস্ত্রে বিশ্বাসবান ঠাকুর যে সুতরাং, নিজ শিষ্যবর্গের শরীর ও অবয়বাদির গঠনপ্রকার লক্ষ্য করিবেন, তদ্বিষয়ে আশ্চর্য্য হইবার

কিছুই নাই। কিন্তু কথাচ্ছলে, সময়ে সময়ে তিনি ঐ বিষয়ে এত কথা আমাদিগকে বলিতে থাকিতেন যে, নির্ব্বাক হইয়া আমরা চিন্তা করিতাম, ঐ সম্বন্ধে এত অভিজ্ঞতা তিনি কোথা হইতে লাভ করিলেন! ভাবিতাম প্রাচীনকালে ঐ বিষয়ে কোন বৃহৎ গ্রন্থ কি বিদ্যমান ছিল —যাহা পাঠ বা শ্রবণ করিয়া তিনি ঐ সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন? কিন্তু একাল পর্য্যন্ত ঐরূপ কোন গ্রন্থ নয়নগোচর করা দূরে থাকুক, উহার নাম পর্য্যন্ত শুনিতে না পাওয়ায় ঐরূপ চিন্তা দাঁড়াইবার স্থান পায় না। সুতরাং বিস্মিত হইয়া শুনিতে থাকিতাম, ঠাকুর স্ত্রী বা পুরুষ-শরীরের প্রত্যেক অবয়ব ও ইন্দ্রিয়ের গঠন-প্রকার নিত্য পরিদৃষ্ট বিশেষ বিশেষ পদার্থের গঠনের ন্যায় হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়া ঐরূপ হইবার ফলাফল বলিয়া যাইতেছেন। যথা, মানবের চক্ষুর কথা তুলিয়া উহা কাহারও পদ্মপত্রের ন্যায়, কাহারও বৃষের ন্যায়, কাহারও যোগী বা দেবতার ন্যায় ইত্যাদি বলিয়া বলিতেন—"পদ্মপত্রের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তির অন্তরে সদ্ভাব ও সাধুভাব থাকে; বৃষের ন্যায় চক্ষু যাহার তাহার কাম প্রবল হয়, যোগীর চক্ষু ঊর্দ্ধদৃষ্টিসম্পন্ন রক্তিমাভ হয়; দেবচক্ষু অধিক বড় হয় না, কিন্তু টানা বা আকর্ণবিশ্রান্ত হয়। কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিবার কালে মধ্যে মধ্যে তাহাকে অপাঙ্গে নিরীক্ষণ করা অথবা চোখের কোণ দিয়া দেখা যাহাদিগের স্বভাব, তাহারা সাধারণ মানব অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান।" অথবা, শরীরের সাধারণ গঠনপ্রকারের কথা তুলিয়া বলিতেন, "ভক্তিমান ব্যক্তির শরীর স্বভাবতঃ কোমল ও তাহার হস্তপদাদির গ্রন্থিসকল শিথিল হয় (অর্থাৎ সহজে ফিরান-

ঐ বিষয়ে ঠাকুরের অদ্ভুত জ্ঞান

ঘুরান যায়); কৃশ হইলেও তাহার শরীরে অস্থি পেশী প্রভৃতি এমনভাবে বিন্যস্ত থাকে যাহাতে অধিক কোণ দেখা যায় না।” বুদ্ধিমান বলিয়া কাহাকেও নির্ণয় করিয়া তাহার বুদ্ধির স্বাভাবিক প্রবণতা সৎ কিংবা অসৎ বিষয়ে—এ কথা স্থির করিতে ঠাকুর ঐ কনুই হইতে অঙ্গুলী পর্য্যন্ত হস্তখানি নিজহস্তে ধারণপূর্ব্বক তাহাকে উহা শিথিলভাবে রক্ষা করিতে বলিয়া উহার গুরুত্ব বা ভার উপলব্ধি করিতেন এবং মানবসাধারণের হস্তের ঐ অংশের গুরুত্ব অপেক্ষা যদি উহার ভার অল্প বোধ হইত, তাহা হইলে তাহাকে সুবুদ্ধি-বিশিষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন। শ্রীযুত প্রেমানন্দ স্বামীর[১] দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমনদিবসে ঠাকুর তাহার হস্তধারণপূর্ব্বক ঐরূপে ওজন করিয়াছিলেন, একথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু কিজন্য ঐরূপ করিয়াছিলেন তাহা তিনি সেদিন না বলায় আমরাও ঐ স্থানে ঐ বিষয়ে কিছু বলি নাই। ব্যক্তিবিশেষের বুদ্ধি সৎ অথবা অসৎ এ বিষয় জানিবার জন্য যে ঠাকুর ঐরূপ করিতেন, তদ্বিষয়ের পরিচয় আমরা নিম্নলিখিতভাবে অন্য এক দিবস প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

গলরোগে আক্রান্ত হইয়া ঠাকুর যখন কাশীপুরের বাগানে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময়ে লেখকের পরলোকগত কনিষ্ঠ সহোদর[২] একদিন তাঁহাকে দর্শন করিতে তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুর তাহাকে দেখিয়া সেদিন বিশেষ প্রসন্ন হইয়াছিলেন এবং নিকটে বসাইয়া তাহাকে নানা কথা জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক ধর্ম্মবিষয়ক নানা

---

১ পূর্ব্ব নাম—বাবুরাম

২ শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে লেখক ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ছেলেটি তোর ভাই?" লেখক ঐ কথা স্বীকার করিলে আবার বলিয়াছিলেন, "বেশ ছেলে, তোর চেয়ে এর বুদ্ধি বেশী; দেখি সদ্‌বুদ্ধি কি অসদ্‌বুদ্ধি"—বলিয়াই তাহার দক্ষিণ হস্তের পূর্ব্বোক্ত অংশ ধারণপূর্ব্বক ওজন করিতে করিতে বলিলেন, "সদ্‌বুদ্ধি।" পরে লেখককে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, (কনিষ্ঠকে দেখাইয়া) "ইহাকেও টান্‌ব নাকি রে, (ইহার মনকে সংসারের প্রতি উদাসীন করিয়া ঈশ্বরমুখী করিয়া দিব নাকি) কি বলিস্?" লেখক বলিয়াছিল, "বেশ ত মহাশয়, তাহাই করুন।" ঠাকুর তাহাতে ক্ষণকাল চিন্তাপূর্ব্বক বলিলেন, "না—থাক; একটাকে নিয়েছি, আবার এটাকেও নিলে তোর বাপ-মার বড় কষ্ট হবে—বিশেষতঃ তোর মার; জীবনে অনেক শক্তিকে[১] রুষ্টা করেছি, এখন আর কাজ নাই।" এই বলিয়া ঠাকুর তাহাকে সদুপদেশ প্রদান ও কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইয়া সেদিন বিদায় করিয়াছিলেন।

হস্তের ওজনের তারতম্যে সদসৎ বুদ্ধি-নির্ণয়

ঠাকুর বলিতেন, শরীরের অবয়বাদির গঠনপ্রকারের ন্যায় নিদ্রা শৌচাদি শারীরিক সামান্য ক্রিয়াসকলও ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। সেই জন্য বহুদর্শী ব্যক্তিগণ ঐ সকল হইতেও ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্র-নির্ণয়ের ইঙ্গিত পাইয়া থাকেন।

শারীরিক নিত্যক্রিয়া-সকলের

১ জগদম্বার সৃজনী ও পালনী শক্তির মূর্ত্তিমতীস্বরূপা নারীগণকে।

বিভিন্নতায় সংস্কার-ভিন্নতার সূচনা

যথা—নিদ্রা যাইবার কালে সকলের নিঃশ্বাস সমভাবে পড়ে না, ভোগীর একভাবে এবং ত্যাগীর অন্যভাবে পড়িয়া থাকে ; শৌচাদি-গমনকালে ভোগীর মূত্রের ধারা বামে হেলিয়া এবং ত্যাগীর দক্ষিণে হেলিয়া পড়ে। যোগীর মল শূকরে স্পর্শ করে না—ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে একটি ঘটনাও ঠাকুর আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। হনুমানসিং নামক এক ব্যক্তি মথুর বাবুর আমলে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-রক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। দ্বারবানদিগের অন্যতম হইলেও হনুমানসিং-এর মর্য্যাদা অধিক ছিল। কারণ, সে কেবল একজন প্রসিদ্ধ পাহালওয়ান মাত্র ছিল না, কিন্তু একজন নিষ্ঠাবান ভক্তসাধক ছিল। মহাবীরমন্ত্রের উপাসক হনুমানসিংকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাহার পদগ্রহণ-মানসে অন্য একজন পাহালওয়ান একসময়ে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার প্রকাণ্ড দেহ ও শারীরিক বল প্রভৃতি দেখিয়াও হনুমান তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দণ্ডায়মান হইতে নিরস্ত হইল না। দিন স্থির হইল এবং মথুর বাবু প্রমুখ ব্যক্তিগণ উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তদ্বিষয় বিচারের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

দ্বারবান হনুমানসিং

প্রতিযোগিতার দিনের সপ্তাহকাল পূর্ব্ব হইতে নবাগত মল্ল রাশীকৃত পুষ্টিকর খাদ্যভোজনে ও ব্যায়ামাদির অভ্যাসে লাগিয়া রহিল। হনুমানসিং কিন্তু ঐরূপ না করিয়া নিত্য যেমন করিত সেরূপ প্রাতঃস্নানপূর্ব্বক সমস্ত দিন ইষ্টমন্ত্রজপে এবং দিনান্তে একবার মাত্র ভোজন করিয়া কালযাপন করিতে লাগিল। সকলে ভাবিল, হনুমান ভীত হইয়াছে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ের আশা পরিত্যাগ

করিয়াছে। ঠাকুর তাহাকে ভালবাসিতেন, সেজন্য প্রতিযোগিতার পূর্ব্বদিবসে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ব্যায়াম ও পুষ্টিকর আহারাদির দ্বারা শরীরকে প্রস্তুত করিয়া লইলে না, নূতন মল্লের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিবে কি?" হনুমান ভক্তিভরে প্রণাম-পূর্ব্বক কহিল, "আপনার কৃপা থাকে ত আমি নিশ্চয় জয়লাভ করিব; কতকগুলা আহার করিলেই শরীরে বলাধান হয় না, উহা হজম করা চাই; আমি গোপনে নবাগত মল্লের মল দেখিয়া বুঝিয়াছি, সে হজমশক্তির অতিরিক্ত আহার করিতেছে।" ঠাকুর বলিতেন, প্রতিযোগিতার দিবসে হনুমানসিং সত্যসত্যই ঐ ব্যক্তিকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিল।

পুরুষ-শরীরের ন্যায় স্ত্রী-শরীরের অবয়বসকলের গঠনপ্রকার সম্বন্ধেও ঠাকুর অনেক কথা বলিতেন এবং উহা লক্ষ্য করিয়া রমণী-গণের কতকগুলিকে দেবীভাবসম্পন্না বা বিদ্যাশক্তি এবং কতকগুলিকে আসুরীভাবাপন্না বা অবিদ্যা-শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। বলিতেন— "ভোজন, নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়াসক্তি বিদ্যাশক্তিদিগের স্বভাবতঃ অল্প হইয়া থাকে। স্বামীর সহিত ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণ ও আলাপ করিতে তাঁহাদিগের প্রাণে বিশেষ উল্লাস উপস্থিত হয়। উচ্চ আধ্যাত্মিক প্রেরণা প্রদানপূর্ব্বক ইঁহারা নীচ প্রবৃত্তি ও হীন কার্য্যের হস্ত হইতে পতিকে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাকেন এবং পরিণামে ঈশ্বর লাভ করিয়া যাহাতে তিনি নিজ জীবন ধন্য করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা প্রদান করেন। অবিদ্যাশক্তিদিগের স্বভাব ও কার্য্য সম্পূর্ণ বিপরীত

শারীরিক অবয়বগঠন ও ক্রিয়াদর্শনে বিদ্যা ও অবিদ্যা-শক্তির নির্ণয়

হইয়া থাকে। আহার-নিদ্রাদি শারীরিক সকল ব্যাপার তাহাদিগের অধিক হইতে দেখা যায়, এবং তাহার সুখসম্পাদন ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে পতি যাহাতে মনোনিবেশ না করেন, তদ্বিষয়ই তাহাদিগের প্রধান লক্ষ্য হয়। পতি ইহাদিগের নিকটে পারমার্থিক বিষয়ে আলাপ করিলে ইহারা রুষ্ট ভিন্ন কখনও তুষ্ট হয় না।" যে ইন্দ্রিয়-বিশেষের সহায়ে রমণীগণ মাতৃত্বপদ-গৌরব লাভ করিয়া থাকেন, তাহার বাহ্যিক আকার হইতে অন্তরের ভোগাসক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে বলিয়া ঠাকুর কখন কখন নির্দ্দেশ করিতেন। বলিতেন, উহা নানা আকারের হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কোন কোন আকার পাশব প্রবৃত্তির স্বল্পতার বিশেষ পরিচায়ক। আবার বলিতেন, যাহাদিগের পশ্চাদ্ভাগ পিপীলিকার ন্যায় উচ্চ তাহাদিগের অন্তরে উক্ত প্রবৃত্তি প্রবল থাকে।

নরেন্দ্রের শারীরিক লক্ষণ সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা

ঐরূপে শরীরের গঠনপ্রকার দেখিয়া মানবের প্রকৃতি নিরূপণ করা সম্বন্ধে কত কথা ঠাকুর আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। লোকচরিত্র-পরিজ্ঞানের উপায়-সকলের মধ্যে অন্যতম বলিয়া উহা তাঁহার নিকটে সর্ব্বদা পরিগণিত হইত এবং নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ সকল ভক্তকেই উহার সহায়ে তিনি স্বল্পবিস্তর পরীক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন। ঐরূপে পরীক্ষাপূর্ব্বক সন্তুষ্ট হইয়া তিনি নরেন্দ্রনাথকে একদিন বলিয়াছিলেন, "তোর শরীরের সকল স্থানই সুলক্ষণাক্রান্ত, কেবল দোষের মধ্যে নিদ্রা যাইবার কালে নিঃশ্বাসটা কিছু জোরে পড়ে। যোগীরা বলেন, অত জোরে নিঃশ্বাস পড়িলে অল্পায়ু হয়।"

২য় ও ৩য়—সামান্য সামান্য কার্য্যে প্রকাশিত মানসিক ভাব ও কাম-কাঞ্চনাসক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখাই ব্যক্তিবিশেষের স্বাভাবিক প্রকৃতি-পরিজ্ঞানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায় বলিয়া ঠাকুরের নিকটে পরিগণিত হইত। ব্যক্তিবিশেষের দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন হইতে ঠাকুর তাহার সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বিষয়সকল কিছুকাল পর্য্যন্ত নীরবে লক্ষ্য মাত্র করিয়া যাইতেন। পরে নিজ মণ্ডলী-মধ্যে তাহাকে গ্রহণ করিবেন বলিয়া যেদিন হইতে স্থির করিতেন, সেদিন হইতে নানাভাবে উপদেশ-দানে এবং আবশ্যক হইলে কখন কখন মিষ্ট তিরস্কারসহায়ে তাহাকে উক্ত দোষসকল পরিহার করাইতে সচেষ্ট হইতেন। আবার মণ্ডলীমধ্যে গ্রহণপূর্ব্বক সন্ন্যাসী অথবা গৃহস্থ কোন্ ভাবে জীবনগঠন করিতে তাহাকে শিক্ষাপ্রদান করিবেন তদ্বিষয়ও তিনি পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়া লইতেন। সেইজন্য সমীপাগত ব্যক্তিকে তিনি প্রথমেই প্রশ্ন করিতেন—সে বিবাহিত কি না, তাহার বাটীতে মোটা ভাতকাপড়ের অভাব আছে কি না, অথবা সে সংসার ত্যাগ করিলে তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ভার লইতে পারিবে এমন কোন নিকট আত্মীয় আছে কি না।

(২) সামান্য কার্য্যে প্রকাশিত মানসিক ভাব দ্বারা এবং (৩) ঐরূপ কার্য্য দ্বারা প্রকাশিত কাম-কাঞ্চনাসক্তির তারতম্য বুঝিয়া অন্তরের সংস্কার নিরূপণ

বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের উপর ঠাকুরের বিশেষ কৃপা সর্ব্বদা লক্ষিত হইত। বলিতেন, "ইহাদিগের মন এখনও স্ত্রী-পুত্র মান-যশাদির ভিতর ছড়াইয়া পড়ে নাই, (উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে) ইহারা সহজেই ষোল-আনা মন ঈশ্বরে দিতে পারিবে।" সেইজন্য

ইহাদিগের ভিতরে ধর্ম্মভাব প্রবেশ করাইয়া দিবার তাঁহার বিশেষ প্রযত্ন ছিল। নানা দৃষ্টান্তসহায়ে তিনি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত মত প্রকাশ করিতেন। বলিতেন, "মন সরিষার পুঁটুলির মত, একবার ছড়াইয়া পড়িলে উহার সব দানাগুলি একত্র করা একপ্রকার অসম্ভব,"—"কাঁটি উঠিলে পাখীকে 'রাধাকৃষ্ণ' নাম বলান দুঃসাধ্য,"—"কাঁচা টালির উপরে গরুর খুরের ছাপ পড়িলে সহজেই মুছিয়া ফেলা যায়, কিন্তু টালি পোড়াইবার পরে ঐ ছাপ আর তুলিয়া ফেলা যায় না" ইত্যাদি। ঐ কারণে সংসারানভিজ্ঞ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকেই তিনি বিশেষভাবে প্রশ্ন করিয়া তাহাদিগের মনের স্বাভাবিক গতি, প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তির দিকে তাহা বুঝিয়া লইতেন এবং উপযুক্ত বুঝিলে তাহাদিগকে শেষোক্ত পথে পরিচালিত করিতেন।

বালকদিগের সম্বন্ধে ঠাকুরের ধারণা

ঐরূপে কথাপ্রসঙ্গে নানাভাবে প্রশ্ন করিয়া ব্যক্তিবিশেষের মনের ভাব অবগত হইয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন না, কিন্তু সে ব্যক্তি কতদূর সরল ও সত্যনিষ্ঠ, মুখে যাহা বলে কার্য্যে সে তাহার কতদূর অনুষ্ঠান করে, বিচারপূর্ব্বক সে প্রতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করে কি না এবং উপদিষ্ট বিষয়ের ধারণাই বা সে কতদূর কিরূপ করিয়া থাকে প্রভৃতি নানা-বিষয় তাহার প্রতিকার্য্যে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে থাকিতেন। কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই পাঠক পূর্ব্বোক্ত বিষয় বুঝিতে পারিবেন।

সমীপাগত ভক্তগণের প্রতিকার্য্য লক্ষ্য করা

কয়েকদিন দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন করিবার পরে জনৈক বালককে তিনি একদিন সহসা বলিয়া বসিলেন, "তুই বিবাহ

কর্ না কেন?" সে উত্তর করিল, "মহাশয়, মন বশীভূত হয় নাই, এখন বিবাহ করিলে স্ত্রীর প্রতি আসক্তিতে হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হইতে হইবে, যদি কখন কামজিৎ হইতে পারি তখন বিবাহ করিব।" ঠাকুর বুঝিলেন, অন্তরে আসক্তি প্রবল থাকিলেও বালকের মন নিবৃত্তি-মার্গের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে—বুঝিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যখন কামজিৎ হইবি তখন আর বিবাহ করিবার আবশ্যকতা থাকিবে না।"

ঐ বিষয়ক দৃষ্টান্তনিচয়

জনৈক বালকের সহিত একদিন দক্ষিণেশ্বরে নানাবিষয়ে কথা কহিতে কহিতে বলিলেন, "এটা কি বল্ দেখি? কোমরে কিছুতেই (সর্ব্বদা) কাপড় রাখতে পারি না—থাকে না, কখন খুলে পড়ে গেছে জান্তেও পারি না! বুড়ো মিন্সে উলঙ্গ হয়ে বেড়াই! কিন্তু লজ্জাও হয় না! পূর্ব্বে পূর্ব্বে কে দেখ্চে না দেখ্চে সে কথায় এককালে হুঁশ্ থাকত না—এখন, যারা দেখে তাদের কাহারও কাহারও লজ্জা হয় বুঝে কোলের উপর কাপড়খানা ফেলে রাখি। তুই লোকের সাম্নে আমার মত (উলঙ্গ) হয়ে বেড়াতে পারিস্?" সে বলিল, "মহাশয়, ঠিক বলিতে পারি না, আপনি আদেশ করিলে বস্ত্রত্যাগ করিতে পারি।" তিনি বলিলেন, কৈ যা দেখি, মাথায় কাপড়খানা জড়িয়ে ঠাকুরবাড়ীর উঠানে একবার ঘুরে আয় দেখি।" বালক বলিল, "তাহা করিতে পারিব না, কিন্তু কেবলমাত্র আপনার সম্মুখে ঐরূপ করিতে পারি।" ঠাকুর তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন, "ঐ কথা আরও অনেকে বলে—বলে, 'তোমার সাম্নে পরিধানের কাপড় ফেলিয়া দিতে লজ্জা করে না কিন্তু অপরের সাম্নে করে!'"

ঠাকুরের বসনত্যাগের কথাপ্রসঙ্গে অন্য একদিনের ঘটনা আমাদিগের মনে আসিতেছে। জ্যোৎস্না-বিধৌতা-যামিনী, বোধ হয় সেদিন কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া বা তৃতীয়া হইবে।

গঙ্গায় বান

রাত্রে শয়ন করিবার অল্পক্ষণ পরেই গঙ্গায় বান আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুর শয্যাত্যাগপূর্ব্বক 'ওরে, বান দেখ্‌বি আয়' বলিয়া সকলকে ডাকিতে ডাকিতে পোস্তার উপরে ছুটিলেন এবং নদীর শান্ত শুভ্র জলরাশি ফেনশীর্ষ উত্তাল তরঙ্গাকারে পরিণত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় বিপরীত দিকে প্রচণ্ডবেগে আগমন-পূর্ব্বক পোস্তার উপরে লাফাইয়া উঠিতেছে দেখিয়া বালকের ন্যায় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঠাকুর যখন আমাদিগকে ডাকিয়া-ছিলেন তখন আমাদিগের তন্দ্রা আসিয়াছে, উহার ঘোরে উঠিয়া পরিহিত বস্ত্রাদি সামলাইয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে সামান্য বিলম্ব হইয়াছিল। সুতরাং আমরা পোস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইতে না হইতে বান চলিয়া যাইল, কেহ উহার সামান্য দর্শন পাইল, কেহ বা তাহাও পাইল না। ঠাকুর এতক্ষণ আপন আনন্দেই বিভোর ছিলেন, বান চলিয়া যাইলে আমাদিগের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কি রে, কেমন বান দেখ্‌লি ?" এবং আমরা কাপড় পরিতে বান চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া বলিলেন, "দূর শালারা, তোদের কাপড় পরবার জন্য কি বান অপেক্ষা করবে ? আমার মত কাপড় ফেলিয়া চলিয়া আসিলি না কেন ?"

'বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে কি না', 'চাকুরী করিবি কি না'—ঠাকুরের এই সকল প্রশ্নের উত্তরে আমাদিগের কেহ কেহ বলিত, "বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই মহাশয়, কিন্তু চাকুরী করিতে হইবে।"

অশেষ স্বাধীনতাপ্রিয় ঠাকুরের নিকটে কিন্তু ঐ কথা বিষম বিসদৃশ লাগিত। তিনি বলিতেন, "যদি বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম পালনই করিবি না, তবে আজীবন অপরের চাকর হইয়া থাকিবি কেন?" ষোলআনা মনপ্রাণ ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া তাঁহার উপাসনা কর—সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়া মানবের তদপেক্ষা মহৎ কার্য্য অন্য কিছুই আর হইতে পারে না এবং ঐরূপ করা একান্ত অসম্ভব বুঝিলে বিবাহ করিয়া ঈশ্বরলাভকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য স্থিরপূর্ব্বক সৎপথে থাকিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর—ইহাই তাঁহার মত ছিল। সেইজন্য আধ্যাত্মিক রাজ্যে উত্তম ও মধ্যম অধিকারী বলিয়া যে-সকল ব্যক্তিকে তিনি বুঝিতে পারিতেন তাহাদিগের কেহ বিবাহ করিয়াছে অথবা বিশেষ কারণ ব্যতীত ইতরসাধারণের ন্যায় অর্থোপার্জ্জনের জন্য চাকুরী স্বীকারপূর্ব্বক বা নাম-যশের প্রত্যাশী হইয়া সংসারের অন্য কোনপ্রকার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া নিজ শক্তি ক্ষয় করিতেছে শুনিলে তিনি প্রাণে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার বালকভক্তদিগের অন্যতম জনৈক[১] চাকুরী স্বীকার করিয়াছে শুনিয়া তিনি তাহাকে একদিন বলিয়াছিলেন, "তুই তোর বৃদ্ধা মাতার ভরণপোষণের জন্য করিতেছিস্ তাই, নতুবা চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিস্ শুনিলে তোর মুখ দেখিতে পারিতাম না।" অপর জনৈক[২] বিবাহ করিয়া কাশীপুরের বাগানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, তাঁহার যেন পুত্রশোক উপস্থিত হইয়াছে এইরূপভাবে তাহার গ্রীবা ধারণপূর্ব্বক অজস্র

ঈশ্বরলাভই জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিয়া সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান

১ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ২ ছোট নরেন্দ্র

নিরঞ্জন
স্বামী নিরঞ্জনানন্দ।

রোদন করিতে করিতে বারংবার বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বরকে ভুলিয়া যেন একেবারে (সংসারে) ডুবিয়া যাস্ নি।"

বিশ্বাস ব্যতিরেকে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় না, নবানুরাগের প্রেরণায় ঐ কথার বিপরীত অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তখন যাহাতে তাহাতে এবং যাহাকে তাহাকে বিশ্বাস করিতে অগ্রসর হইত। ঠাকুরের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইবামাত্র তিনি ঐ বিষয় বুঝিয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দিতেন। বাস্তবিক, বিশ্বাস-অবলম্বনে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে বলিলেও তিনি কাহাকেও কোন দিন সদসৎ বিচার ত্যাগ করিতে বলেন নাই। সদসদ্বিচারসম্পন্ন হইয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবে এবং ইষ্টানিষ্ট বিচার না করিয়া সাংসারিক কোন কর্ম্মও করিতে উদ্যত হইবে না, ইহাই তাঁহার মত ছিল বলিয়া আমাদিগের ধারণা। তাঁহার আশ্রিতবর্গের মধ্যে জনৈক[১] একদিন দোকানীকে ধর্ম্মভয় দেখাইয়া বাজার হইতে একখানি লোহার কড়া কিনিয়া বাটীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দেখিলেন, দোকানী তাঁহাকে ফাটা কড়া দিয়াছে! ঠাকুর ঐ কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "(ঈশ্বর) ভক্ত হইতে হইবে বলিয়া কি নির্ব্বোধ হইতে হইবে? দোকানী কি দোকান ফাঁদিয়া ধর্ম্ম করিতে বসিয়াছে যে তুই তার কথায় বিশ্বাস করিয়া কড়াখানা একবার না দেখিয়াই লইয়া চলিয়া আসিলি? আর কখনও ঐরূপ করিবি না। কোন দ্রব্য কিনিতে হইলে পাঁচ দোকান ঘুরিয়া তাহার উচিত মূল্য

সরল ঈশ্বর-বিশ্বাস ও নির্ব্বুদ্ধিতা ভিন্ন পদার্থ; সদসদ্বিচারসম্পন্ন হইতে হইবে

---

১ স্বামী যোগানন্দ, পূর্ব্ব নাম যোগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

জানিবি, দ্রব্যটি লইবার কালে বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিবি, আবার যে-সকল দ্রব্যের ফাউ পাওয়া যায় তাহার ফাউটি পর্য্যন্ত না গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিবি না।”

ধর্ম্মলাভ করিতে আসিয়া কোন কোন প্রকৃতিতে দয়ার ভাবটি এত অধিক পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে যে, পরিণামে উহাই তাহার বন্ধনের এবং কখন কখন ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইবার কারণ হইয়া পড়ে। কোমলহৃদয় নরনারীরই অনেক সময় ঐরূপ হইয়া থাকে।

অধিকারিভেদে ঠাকুরের দয়াবান ও নির্ম্মম হইবার উপদেশ

ঠাকুর সেইজন্য ঐরূপ নরনারীকে কঠোর হইবার জন্য এবং তদ্বিপরীত প্রকৃতিবিশিষ্টদিগকে কোমল হইতে সর্ব্বদা উপদেশ প্রদান করিতেন। আমাদিগের মধ্যে জনৈকের[১] হৃদয় অতি কোমল ছিল। বিশিষ্ট কারণ বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহার ক্রোধের উদয় হইতে বা তাঁহাকে রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিতে আমরা কখনও দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। সম্পূর্ণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইলেও এবং বিন্দুমাত্র ইচ্ছা না থাকিলেও মাতার চক্ষে জল দেখিতে না পারিয়া তিনি সহসা একদিন আপনাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের আশ্রয় এবং আশ্বাসবাক্যই তাঁহাকে উক্ত কর্ম্মনিবন্ধন প্রাণে দারুণ অনুতাপ ও হতাশ ভাবের উদয় হইতে সে যাত্রায় রক্ষা করিয়াছিল। ঐরূপ অযথা কোমলতা ও দয়ার ভাব সংযত করিয়া যাহাতে তিনি প্রতি কার্য্য বিচারপূর্ব্বক সম্পাদন করেন তদ্বিষয়ে ঠাকুরের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সামান্য সামান্য বিষয়ের সহায়ে ঠাকুর কিরূপে তাঁহাকে শিক্ষাপ্রদান করিতেন, দুই-একটি ঘটনার উল্লেখেই তাহা বুঝিতে

১ স্বামী যোগানন্দ

পারা যাইবে। ঠাকুরের বস্ত্রাদি যাহাতে রক্ষিত হইত তাহাতে একটি আরস্থলা বাসা করিয়াছে, এক দিবস দেখিতে পাওয়া গেল। ঠাকুর বলিলেন, "আরস্থলাটাকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া গিয়া মারিয়া ফেল্।" পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি ঐরূপ আদেশ পাইয়া আরস্থলাটাকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া যাইলেন কিন্তু না মারিয়া ছাড়িয়া দিয়া আসিলেন। আসিবামাত্র ঠাকুর তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, "কি রে, আরস্থলাটাকে মারিয়া ফেলিয়াছিস্ ত?" তিনি অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না মহাশয়, ছাড়িয়া দিয়াছি।" ঠাকুর তাহাতে তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "আমি তোকে মারিয়া ফেলিতে বলিলাম, তুই কিনা সেটাকে ছাড়িয়া দিলি! যেমনটি করিতে বলিব ঠিক সেইরূপ করিবি, নতুবা ভবিষ্যতে গুরুতর বিষয়-সকলেও নিজের মতে চলিয়া পশ্চাত্তাপ উপস্থিত হইবে।"

স্বামী যোগানন্দকে ঐ বিষয়ক শিক্ষা

কলিকাতা হইতে গহনার নৌকায় করিয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিবার কালে শ্রীযুত যোগেন একদিন অন্য এক আরোহীর দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন, তিনি রাণী রাসমণির কালী-বাটীতে ঠাকুরের নিকটে যাইতেছেন। ঐ কথা শুনিয়াই ঐ ব্যক্তি অকারণে ঠাকুরের নিন্দা করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "ঐ এক ঢং আর কি; ভাল খাচ্চেন্, গদিতে শুচ্চেন্, আর ধর্ম্মের ভান করে যত সব স্কুলের ছেলের মাথা খাচ্চেন্" ইত্যাদি। ঐরূপ কথাসকল শুনিয়া যোগেন মর্ম্মাহত হইলেন; ভাবিলেন, তাহাকে দুই-চারিটি কথা শুনাইয়া দেন। পরক্ষণেই নিজ শান্তপ্রকৃতির প্রেরণায় তাঁহার মনে হইল, ঠাকুরের প্রকৃত পরিচয় পাইবার কিছুমাত্র চেষ্টা

না করিয়া কত লোকে কত প্রকার বিপরীত ধারণা ও নিন্দাবাদ করিতেছে, তিনি তাহার কি করিতে পারেন। ঐরূপ ভাবিয়া তিনি ঐ ব্যক্তির কথায় কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন এবং ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া কথাপ্রসঙ্গে ঐ ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। যোগেন ভাবিয়াছিলেন, নিরভিমান ঠাকুর—যাঁহাকে স্তুতি-নিন্দায় কেহ কখন বিচলিত হইতে দেখে নাই—ঐ কথা শুনিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। ফল কিন্তু অন্যরূপ হইল। তিনি ঐ ঘটনা ভিন্ন আলোকে দেখিয়া যোগেনের ঐ বিষয়ে আচরণ সম্বন্ধে বলিয়া বসিলেন, "আমার অযথা নিন্দা করিল, আর তুই কিনা তাহা চুপ করিয়া শুনিয়া আসিলি! শাস্ত্রে কি আছে জানিস্?—গুরুনিন্দাকারীর মাথা কাটিয়া ফেলিবে, অথবা সেই স্থান পরিত্যাগ করিবে। তুই মিথ্যা রটনার একটা প্রতিবাদও করিলি না!"

ঐরূপ ঘটনাস্থলে নিরঞ্জনকে ঠাকুরের অন্যপ্রকার উপদেশ

ঐরূপ অন্য একটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, ঠাকুরের শিক্ষা ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃতির কতদূর অনুসারী হইত। শ্রীযুত নিরঞ্জনের স্বভাবতঃ উগ্র প্রকৃতি ছিল। গহনার নৌকায় করিয়া একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিবার কালে আরোহীসকলকে পূর্ব্বোক্তরূপে ঠাকুরের অযথা নিন্দাবাদ করিতে শুনিয়া তিনি প্রথমে উহার তীব্র প্রতিবাদে নিযুক্ত হইলেন এবং তাহাতেও উহারা নিরস্ত না হওয়াতে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া নৌকা ডুবাইয়া দিয়া উহার প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হইলেন। নিরঞ্জনের শরীর বিশেষ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ ছিল এবং তিনি

বিলক্ষণ সন্তরণপটু ছিলেন। তাঁহার ক্রোধদৃপ্ত মূর্ত্তির সম্মুখে সকলে ভয়ে জড়সড় হইয়া গেল এবং অশেষ অনুনয় বিনয় ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিন্দাকারীরা তাঁহাকে ঐ কর্ম্ম হইতে নিরস্ত করিল। ঠাকুর ঐ কথা পরে জানিতে পারিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "ক্রোধ চণ্ডাল, ক্রোধের বশীভূত হইতে আছে? সৎ ব্যক্তির রাগ জলের দাগের মত, হইয়াই মিলাইয়া যায়। হীন-বুদ্ধি লোকে কত কি অন্যায় কথা বলে, তাহা লইয়া বিবাদ-বিসংবাদ করিতে গেলে উহাতেই জীবনটা কাটাইতে হয়। ঐরূপ স্থলে ভাবিবি লোক না পোক্ (কীট) এবং উহাদিগের কথা উপেক্ষা করিবি। ক্রোধের বশে কি অন্যায় করিতে উদ্যত হইয়াছিলি ভাব্ দেখি। দাঁড়ি-মাঝিরা তোর কি অপরাধ করিয়াছিল যে, সেই গরীবদের উপরেও অত্যাচার করিতে অগ্রসর হইয়াছিলি।"

স্ত্রীভক্তদিগকেও ঠাকুরের ঐভাবে শিক্ষাদানের দৃষ্টান্ত

পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীভক্তগণের সম্বন্ধেও ঠাকুর স্বাভাবিক প্রকৃতি বুঝিয়া ঐরূপে উপদেশ প্রদান করিতেন। আমাদিগের স্মরণ হয়, বিশেষ কোমলস্বভাবা কোন রমণীকে একদিন তিনি নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন—"যদি বুঝ তোমার পরিচিত কোন ব্যক্তি অশেষ আয়াস স্বীকারপূর্ব্বক তোমাকে সকল বিষয়ে সহায়তা করিলেও নিজ দুর্ব্বল চিত্তকে রূপজ মোহ হইতে সংযত করিতে না পারিয়া তোমার জন্য কষ্টভোগ করিতেছে, সেই স্থলে তোমার কি তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে হইবে, অথবা কঠোরভাবে তাহার বক্ষে পদাঘাত-পূর্ব্বক চলিয়া আসিয়া চিরকালের মত তাহার নিকট হইতে দূরে

থাকিতে হইবে? অতএব বুঝ, যখন তখন যেখানে সেখানে যাহাকে তাহাকে দয়া করা চলে না। দয়াপ্রকাশের একটা সীমা আছে, দেশকালপাত্রভেদে উহা করা কর্ত্তব্য।"

পূর্ব্বোক্ত প্রসঙ্গে অন্য একটি কথা আমাদিগের মনে আসিতেছে। হরিশ বলিষ্ঠ যুবা পুরুষ। বাটীতে সুন্দরী স্ত্রী, শিশু পুত্র এবং মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান ছিল। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সমীপে কয়েকবার আসিতে না আসিতে তাহার মন বিশেষভাবে বৈরাগ্যপ্রবণ হইয়া উঠিল।

হরিশের কথা

তাহার সরল স্বভাব, একনিষ্ঠা এবং শান্তভাব দেখিয়া ঠাকুরও তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে আশ্রয়দান করিলেন। তদবধি ঠাকুরের সেবা ও ধ্যানজপপরায়ণ হইয়া হরিশ দক্ষিণেশ্বরেই অধিকাংশ কাল কাটাইতে লাগিল। অভিভাবকদিগের তাড়না, শ্বশুরালয়ের সাদরাহ্বান, স্ত্রীর ক্রন্দন কিছুতেই তাহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। সে কাহারও কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া এক প্রকার মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঠাকুর তাহার শান্ত একনিষ্ঠ প্রকৃতির দিকে আমাদিগের চিত্তাকর্ষণের জন্য মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "মানুষ যারা, জ্যান্তে মরা—যেমন হরিশ!"

একদিন সংবাদ আসিল, সংসারের সকল কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধনভজন লইয়া থাকাতে হরিশের বাটীর সকলে বিশেষ সন্তপ্ত হইয়াছে এবং তাহার স্ত্রী তাহাকে বহুকাল না দেখিতে পাইয়া শোকে অধীরা হইয়া একপ্রকার অন্নজল ত্যাগ করিয়াছে। হরিশ ঐ কথা শুনিয়া পূর্ব্ববৎ নীরব রহিল। কিন্তু ঠাকুর তাহার মন

জানিবার জন্য তাহাকে বিরলে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোর স্ত্রী অত কাতর হইয়াছে, তা তুই একবার বাটীতে যাইয়া তাহাকে দেখা দিয়া আয় না কেন? তাহাকে দেখিবার কেহ নাই বলিলেই হয়,[১] তাহার উপরে একটু দয়া করিলে ক্ষতি কি?" হরিশ সকাতরে বলিল, "মহাশয়, দয়াপ্রকাশের স্থান উহা নহে। ঐ স্থলে দয়া করিতে যাইলে মায়ামোহে অভিভূত হইয়া জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা। আপনি ঐরূপ আদেশ করিবেন না।" ঠাকুর তাহার ঐ কথায় পরম প্রসন্ন হইয়াছিলেন এবং তদবধি হরিশের ঐ কথাগুলি মধ্যে মধ্যে আমাদিগের নিকটে উল্লেখ করিয়া তাহার বৈরাগ্যের প্রশংসা করিতেন।

'দয়াপ্রকাশের স্থান উহা নহে'

ঐরূপে সামান্য সামান্য দৈনিক কার্য্যসকলের উপর লক্ষ্য রাখিয়া আমাদিগের অন্তরের দোষ-গুণ পরিজ্ঞাত হইবার বিষয়ে ঠাকুরের সম্বন্ধে বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। নিরঞ্জনকে অধিক পরিমাণে ঘৃত ভোজন করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "অত ঘি খাওয়া!—শেষে কি লোকের ঝি বউ বার করবি?" জনৈক অধিক নিদ্রা যাইত বলিয়া কিছুকাল ঠাকুরের অসন্তোষ-ভাজন হইয়াছিল। চিকিৎসাশাস্ত্র-অধ্যয়নের ঝোঁকে পড়িয়া জনৈক তাঁহার নিষেধ অবহেলা করায় বলিয়াছিলেন, "কোথায় একে একে বাসনা ত্যাগ করিবি তাহা নহে,

দৈনিক সামান্য কার্য্যসকল লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন ব্যক্তিকে উপদেশপ্রদান

১ হরিশের মাতা জীবিতা ছিলেন না, বোধ হয় সেইজন্য ঠাকুর ঐরূপ বলিয়াছিলেন।

বাসনা-জালের বৃদ্ধি করিতেছিস্, তাহা হইলে আধ্যাত্মিক উন্নতি-লাভ আর কেমন করিয়া হইবে।" প্রসঙ্গান্তরে ঐরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আমরা ইতিপূর্ব্বে সময়ে সময়ে পাঠকের নয়নগোচর করিয়াছি, সুতরাং ঐ বিষয়ে অধিক কথা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

আশ্রিত ব্যক্তিগণের স্বাভাবিক প্রকৃতি পূর্ব্বোক্ত উপায়সকলের সহায়ে পরিজ্ঞাত হইয়া উহার দোষভাগ ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তনের চেষ্টামাত্র করিয়া ঠাকুর ক্ষান্ত হইতেন না—কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য কতদূর সংসিদ্ধ হইল তদ্বিষয় বারংবার অনুসন্ধান করিতেন। তদ্ভিন্ন ঐরূপ কোন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিমাণ করিবার জন্য তাঁহাকে এক বিশেষ উপায় সর্ব্বদা অবলম্বন করিতে দেখা যাইত। উপায়টি ইহাই—

(৪) তাঁহাতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক প্রকাশ উপলব্ধি করিবার দিকে ব্যক্তিবিশেষ কতদূর অগ্রসর ঠাকুরের তাহা লক্ষ্য করা

৪র্থ—ব্যক্তিবিশেষ তাঁহার নিকটে প্রথম আসিবার কালে যে শ্রদ্ধা বা ভক্তিভাবের প্রেরণায় উপস্থিত হইত, সেই ভাবটি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে কি না তদ্বিষয় অনুসন্ধান করা ঠাকুরের রীতি ছিল। ঐ বিষয় জানিবার জন্য তিনি কখন কখন নিজ আধ্যাত্মিক অবস্থা বা আচরণবিশেষের সম্বন্ধে ঐ ব্যক্তি কতদূর কিরূপ বুঝিতেছে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন, কখন বা তাঁহার সকল কথায় সে সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করে কি না তাহা লক্ষ্য করিতেন, আবার কখন বা নিজ সঙ্ঘমধ্যস্থ যে-সকল ব্যক্তির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে মিলিত হইলে তাহার ভাব গভীরতা প্রাপ্ত হইবে তাহাদিগের সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দেওয়া প্রভৃতি নানা

উপায়ে তাহাকে সহায়তা করিতেন। ঐরূপে যতদিন না ঐ ব্যক্তি অন্তরের স্বাভাবিক প্রেরণায় তাঁহাকে জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রকাশ বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হইত ততদিন পর্য্যন্ত তিনি তাহার ধর্ম্মলাভ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না।

শেষোক্ত উপায়ের দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিমাণ নির্ণয় ঠাকুরের পক্ষে স্বাভাবিক কেন

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলিতে পাঠক বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বল্প চিন্তার ফলে বুঝিতে পারা যায় উহাতে বিস্ময়ের কারণ যে কিছুমাত্র নাই তাহা নহে, কিন্তু ঐরূপ করাই ঠাকুরের পক্ষে নিতান্ত যুক্তিযুক্ত ও স্বাভাবিক ছিল। বুঝিতে পারা যায়, তিনি আপনাতে অদৃষ্ট-পূর্ব্ব আধ্যাত্মিকতা-প্রকাশের কথা সত্যসত্য জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ঐরূপ আচরণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। 'লীলা-প্রসঙ্গে'র অন্যত্র আমরা পাঠককে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছি, দীর্ঘকালব্যাপী অলৌকিক তপস্যা ও ধ্যানসমাধিসহায়ে ঠাকুরের অন্তরে অভিমান-অহঙ্কার সর্ব্বথা বিনষ্ট হইয়া যখন তাঁহার ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা এককালে তিরোহিত হইয়াছিল তখন অখণ্ড স্মৃতি ও অনন্ত জ্ঞানপ্রকাশ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করাইয়াছিল—তাঁহার শরীর-মনাশ্রয়ে যেরূপ অভিনব আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে, সংসারে ঐরূপ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও কুত্রাপি হয় নাই। সুতরাং ঐ কথা যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিয়া উক্ত আদর্শের আলোকে যে ব্যক্তি নিজ জীবন গঠন করিতে প্রয়াস পাইবে তাহারই বর্ত্তমান যুগে

আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ সুগম ও সহজসাধ্য হইবে, এবিষয়ে তাঁহাকে স্বতঃ বিশ্বাসস্থাপন করিতে হইয়াছিল। ঐ জন্য সমীপাগত ব্যক্তিগণ তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বিষয় বুঝিয়াছে কি না এবং তৎপ্রদর্শিত মহদুদার ভাবাশ্রয়ে নিজ নিজ জীবনগঠনে সচেষ্ট হইয়াছে কি না তদ্বিষয় তিনি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে।

অন্তরের পূর্ব্বোক্ত ধারণা ঠাকুর নানাভাবে আমাদিগের নিকটে প্রকাশ করিতেন। বলিতেন, "নবাবী আমলের মুদ্রা বাদশাহী আমলে চলে না", "আমি যেরূপে বলিতেছি সেইরূপে যদি চলিয়া যাস্, তাহা হইলে সোজাসুজি গন্তব্য স্থলে পৌঁছাইয়া যাইবি", "যাহার শেষ জন্ম—যাহার সংসারে পুনঃপুনঃ আগমনের ও জন্ম-মরণের শেষ হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই এখানে আসিবে এবং এখান-কার ভাব গ্রহণ করিতে পারিবে,"[১] "তোমার ইষ্ট (উপাস্য দেব) (আপনাকে দেখাইয়া) ইহার ভিতরে আছেন, ইহাকে ভাবিলেই তাঁহাকে ভাবা হইবে।" —ইত্যাদি।

আশ্রিতগণের অন্তরে পূর্ব্বোক্ত ভাবের উদয় হইয়া দিন দিন উহা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইতেছে কি না তদ্বিষয় ঠাকুর কিরূপে অন্বেষণাদি করিতেন ঐ সম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলে পাঠক আমাদিগের কথা বুঝিতে পারিবেন—

ঠাকুরের পুণ্যদর্শন ও অহেতুকী কৃপালাভ করিবার যাঁহাদের সৌভাগ্য হইয়াছিল তাঁহারা প্রত্যেকেই বিদিত আছেন, তিনি

১ ঠাকুরের এই কথার বিস্তারিত আলোচনা আমরা 'গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ' -শীর্ষক গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে করিয়াছি।

তাঁহাদিগকে বিরলে অথবা দুই-চারি জন ভক্তের সম্মুখে সময়ে সময়ে সহসা প্রশ্ন করিয়া বসিতেন, "আচ্ছা, আমাকে তোমার কি মনে হয় বল দেখি ?" দক্ষিণেশ্বরে কিছুকাল গমন-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সম্বন্ধ কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠ হইবার পরেই সচরাচর ঐ প্রশ্নের উদয় হইত। তাহা বলিয়া প্রথম দর্শনে অথবা উহার স্বল্পকাল পরে ঐ প্রশ্ন তিনি যে কাহাকেও কখন করেন নাই, তাহা নহে। যে-সকল ভক্তের আগমনের কথা তিনি তাহাদিগের আসিবার বহুপূর্ব্বে যোগদৃষ্টিসহায়ে জ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাহারা কেহ কেহ আসিবামাত্র তিনি ঐরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন, আমরা জ্ঞাত আছি। ঐরূপে পৃষ্ট হইয়া তাঁহার আশ্রিতগণের প্রত্যেকে তাঁহাকে কত প্রকার উত্তর প্রদান করিত, তাহা বলিবার নহে। কেহ বলিত, 'আপনি যথার্থ সাধু'—কেহ বলিত, 'যথার্থ ঈশ্বরভক্ত'—কেহ 'মহা পুরুষ'—কেহ 'সিদ্ধপুরুষ'—কেহ 'ঈশ্বরাবতার'—কেহ 'স্বয়ং শ্রীচৈতন্য'—কেহ 'সাক্ষাৎ শিব'—কেহ 'ভগবান' ইত্যাদি। ব্রাহ্ম-সমাজপ্রত্যাগত কেহ কেহ—যাহারা ঈশ্বরের অবতারত্বে বিশ্বাসবান্ ছিল না—বলিয়াছিল, "আপনি শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা ও শ্রীচৈতন্যপ্রমুখ ভক্তাগ্রণীদিগের সমতুল্য ঈশ্বরপ্রেমিক।" আবার খৃষ্টানধর্ম্মাবলম্বী উইলিয়মস্[১] নামক এক ব্যক্তি ঐরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে

'আমাকে কি মনে হয়'—ঠাকুরের এই প্রশ্নে নানা ভক্তের নানা মত প্রকাশ

১ আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, এই ব্যক্তি কয়েকবার ঠাকুরের নিকটে গমনাগমন করিবার পরেই তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন এবং তাঁহার উপদেশে সংসারত্যাগ করিয়া পঞ্জাবপ্রদেশের উত্তরে অবস্থিত হিমালয় গিরির কোন স্থলে তপস্যাদিতে নিযুক্ত হইয়া শরীরপাত করিয়াছিলেন।

'নিত্যচিন্ময়বিগ্রহ ঈশ্বরপুত্র ঈশামসি' বলিয়া নিজ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। উত্তরদাতাগণ ঠাকুরকে কতদূর বুঝিত বলিতে পারি না, কিন্তু ঐ সকল বাক্যদ্বারা তাঁহার সম্বন্ধে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর সম্বন্ধে নিজ নিজ মনোভাব যে যথাযথ ব্যক্ত করিত, তাহা বলা বাহুল্য। ঠাকুরও তাঁহাদিগের ঐ প্রকার উত্তরসকল পূর্ব্বোক্ত আলোকে দেখিয়া যাহার যে প্রকার ভাব তাহার প্রতি সেই প্রকার আচরণ ও উপদেশাদি প্রদান করিতেন, কারণ ভাবময় ঠাকুর কখনও কাহারও ভাব নষ্ট না করিয়া উহার পরিপুষ্টিতে যাহাতে সেই ব্যক্তি দেশকালাতীত সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের উপলব্ধি করিতে পারে তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা সহায়তা করিতেন। তবে উত্তরদাতা তাঁহার প্রশ্নে আপন অন্তরের ধারণা প্রকাশ করিতেছে অথবা অপরের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কথা কহিতেছে এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য থাকিত।

ঐ বিষয়ক ১ম দৃষ্টান্ত—ভক্ত পূর্ণচন্দ্র ও 'ছেলেধরা মাষ্টার'

পূর্ণ[১] যখন ঠাকুরের নিকটে প্রথম আগমন করে তখন তাহাকে নিতান্ত বালক বলিলেই হয়। বোধ হয়, তাহার বয়স তখন সবেমাত্র তের বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। তখন ঠাকুরের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা সংস্থাপিত শ্যামবাজারের বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং বালকদিগের মধ্যে কাহাকেও স্বভাবতঃ ঈশ্বরানুরাগী দেখিতে পাইলে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে লইয়া আসিতেছিলেন। ঐরূপে তেজচন্দ্র, নারায়ণ, হরিপদ, বিনোদ, (ছোট) নরেন, প্রমথ

---

১ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ

পূর্ণচন্দ্র ঘোষ

(পল্টু) প্রভৃতি বাগবাজার-অঞ্চলের অনেকগুলি বালককে তিনি একে একে ঠাকুরের আশ্রয়ে লইয়া আসিয়াছিলেন। ঐজন্য আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ রহস্য করিয়া তাঁহাকে 'ছেলেধরা মাষ্টার' বলিয়া নির্দ্দেশ করিত এবং ঠাকুরও উহা শুনিয়া কখন কখন হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "তাহার ঐ নাম উপযুক্ত হইয়াছে।" বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়াইবার কালে পূর্ণের সুন্দর স্বভাব ও মধুর আলাপে তাঁহার চিত্ত একদিন আকৃষ্ট হইল এবং উহার অনতিকাল পরেই তিনি ঠাকুরের সহিত বালকের পরিচয় করাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিলেন। বন্দোবস্ত গোপনেই করা হইল। কারণ পূর্ণের অভিভাবকেরা বিশেষ কড়া মেজাজের লোক ছিলেন—ঐ কথা জানিতে পারিলে শিক্ষক ও ছাত্র উভয় পক্ষেরই লাঞ্ছিত হইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা ছিল। অতএব যথাসময়ে বিদ্যালয়ে আসিয়া পূর্ণ গাড়ী ভাড়া করিয়া দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া যাইয়া স্কুলের ছুটি হইবার পূর্ব্বেই প্রত্যাগমনপূর্ব্বক অন্যদিনের ন্যায় বাটীতে ফিরিয়া গিয়াছিল।

পূর্ণের আগমনে ঠাকুরের প্রীতি ও তাহার উচ্চাধিকার সম্বন্ধে কথা

পূর্ণকে দেখিয়া ঠাকুর সেদিন বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন এবং পরম স্নেহে তাহাকে উপদেশপ্রদান ও জল-যোগাদি করাইয়া দিয়া ফিরিবার কালে বলিয়া দিয়াছিলেন, "তোর যখনই সুবিধা হইবে চলিয়া আসিবি, গাড়ী করিয়া আসিবি, যাতায়াতের ভাড়া এখান হইতে দিবার বন্দোবস্ত থাকিবে।" পরে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "পূর্ণ নারায়ণের অংশ, সত্ত্বগুণী আধার—নরেন্দ্রের (স্বামী বিবেকানন্দের) নীচেই পূর্ণের ঐ বিষয়ে স্থান বলা যাইতে

পারে! এখানে আসিয়া ধর্ম্মলাভ করিবে বলিয়া যাহাদিগকে বহুপূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, পূর্ণের আগমনে সেই থাকের (শ্রেণীর) ভক্তসকলের আগমন পূর্ণ হইল—অতঃপর ঐরূপ আর কেহ এখানে আসিবে না।"

পূর্ণেরও সেদিন অপূর্ব্ব ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুরের সহিত সম্বন্ধবিষয়ক পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইয়া তাহাকে এককালে স্থির ও অন্তর্ম্মুখী করিয়া দিয়াছিল এবং তাহার দুনয়নে অজস্র আনন্দধারা বিগলিত হইয়াছিল। অভিভাবকদিগের ভয়ে বহু চেষ্টায় আপনাকে সামলাইয়া তাহাকে সেদিন বাটীতে ফিরিতে হইয়াছিল। তদবধি পূর্ণকে দেখিবার এবং খাওয়াইবার জন্য ঠাকুরের প্রাণে বিষম আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। সুবিধা পাইলেই তিনি নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য তাহাকে পাঠাইয়া দিতেন এবং যে ব্যক্তি উহা লইয়া যাইত তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেন, সে যেন লুকাইয়া ঐ সকল তাহার হস্তে দিয়া আসে, কারণ, বাটীতে ঐ কথা প্রকাশ হইলে তাহার উপর অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা।

পূর্ণের সহিত ঠাকুরের সপ্রেম আচরণ

পূর্ণের সহিত দেখা করিবার আগ্রহে আমরা ঠাকুরকে সময়ে সময়ে দরদরিত ধারে চক্ষের জল ফেলিতে দেখিয়াছি। তাঁহার ঐরূপ আচরণে আমাদিগকে বিস্মিত হইতে দেখিয়া তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "পূর্ণের উপরে এই টান্ (আকর্ষণ) দেখিয়াই তোরা অবাক্ হয়েছিস্, নরেন্দ্রের (বিবেকানন্দের) জন্য প্রথম প্রথম প্রাণ যেরূপ ব্যাকুল হইত ও যেরূপ ছট্‌ফট্ করিতাম,

ঠাকুরের পূর্ণকে দেখিবার আগ্রহ ও তাহার সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকালে জিজ্ঞাসা—

'আমাকে তোর কি মনে হয় ?'

তাহা দেখিলে না জানি কি হইতিস্!" সে যাহা হউক, পূর্ণকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলেই ঠাকুর এখন হইতে মধ্যাহ্নে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং বাগবাজারে বলরামবসুর ভবনে অথবা তদঞ্চলের অন্য কোন ব্যক্তির বাটীতে উপস্থিত হইয়া সংবাদ প্রেরণপূর্ব্বক তাহাকে বিদ্যালয় হইতে ডাকাইয়া আনিতেন। ঐরূপ কোন স্থলেই পূর্ণ ঠাকুরের পুণ্যদর্শন দ্বিতীয়বার লাভ করিয়াছিল এবং সেদিন সে এককালে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল। ঠাকুর সেদিন স্নেহময়ী জননীর ন্যায় তাহাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমাকে তোর কি মনে হয়, বল দেখি?" ভক্তিগদগদ হৃদয়ের অপূর্ব্ব প্রেরণায় অবশ হইয়া পূর্ণ উহাতে বলিয়া উঠিয়াছিল, "আপনি ভগবান্—সাক্ষাৎ ঈশ্বর!"

বালক পূর্ণ দর্শনমাত্রেই যে তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে, একথা জানিয়া ঠাকুরের সেদিন বিস্ময় ও আনন্দের অবধি ছিল না। তিনি তাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক শক্তিপূত মন্ত্রসহিত সাধনরহস্যের উপদেশ করিয়াছিলেন। পরে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আমাদিগকে বারংবার বলিয়াছিলেন, "আচ্ছা, পূর্ণ ছেলেমানুষ, বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নাই, সে কেমন করিয়া ঐ কথা বুঝিল বল দেখি? আরও কেহ কেহ দিব্য সংস্কারের প্রেরণায় পূর্ণের মত ঐ প্রশ্নের ঐরূপ উত্তর দিয়াছে! উহা নিশ্চয় পূর্ব্বজন্মকৃত সংস্কার। ইহাদিগের শুদ্ধ সাত্ত্বিক অন্তরে সত্যের ছবি স্বভাবতঃ পূর্ণপরিস্ফুট হইয়া উঠে!"

পূর্ণের উত্তরে ঠাকুরের আনন্দ ও তাহাকে উপদেশ

ঘটনাচক্রে পূর্ণকে দারপরিগ্রহ করিয়া সাধারণের ন্যায় সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল—কিন্তু তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যাহারা সম্বদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা সকলেই তাহার অলৌকিক বিশ্বাস, ঈশ্বরনির্ভরতা, সাধনপ্রিয়তা, নিরভিমানিতা ও সর্ব্বপ্রকারে আত্মত্যাগের সম্বন্ধে একবাক্যে সাক্ষ্যপ্রদান করিয়া থাকে।

সংসারী পূর্ণের মহত্ব

আশ্রিত ভক্তগণকে পূর্ব্বোক্তভাবে প্রশ্ন করা বিষয়ে আর একটি দৃষ্টান্তের আমরা এখানে উল্লেখ করিব। দক্ষিণেশ্বরে আগমনের স্বল্পকাল পরে আমাদিগের সুপরিচিত জনৈক ব্যক্তিকে ঠাকুর একদিবস নিজ গৃহস্থিত মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তনের ছবিখানি দেখাইয়া বলিলেন, "সকলে কেমন ঈশ্বরীয় ভাবে বিভোর হয়েছে দেখ্ছিস্?"

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত—বৈকুণ্ঠনাথকে ঠাকুরের ঐ বিষয়ক প্রশ্ন ও তাহার উত্তর

ঐ ব্যক্তি—ওরা সব ছোট লোক, মহাশয়।

ঠাকুর—সে কিরে? ও কথা বল্তে আছে!

ঐ ব্যক্তি—হাঁ মহাশয়, আমার নদীয়ায় বাড়ী, আমি জানি বষ্টুম ফষ্টুম ছোটলোকে হয়।

ঠাকুর—তোর নদীয়ায় বাড়ী, তবে তোকে আর একটা প্রণাম।[১] আচ্ছা, রাম প্রভৃতি (আপনাকে দেখাইয়া) ইহাকে অবতার বলে, তোর কি মনে হয়, বল দেখি?

ঐ ব্যক্তি—তারা ত ভারি ছোট কথা বলে, মহাশয়।

১ কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তাহাকে প্রণাম করা ঠাকুরের রীতি ছিল। এই ব্যক্তিকে ইতিপূর্ব্বে ঐরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া পুনরায় প্রণাম করিবার সময় তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন।

ঠাকুর—সে কিরে? ভগবানের অবতার বলে, আর তুই বলচিস্ ছোট কথা বলে!

ঐ ব্যক্তি—হাঁ মহাশয়, অবতার তো তাঁর (ঈশ্বরের) অংশ, আমার আপনাকে সাক্ষাৎ শিব বলিয়া মনে হয়।

ঠাকুর—বলিস্ কিরে?

ঐ ব্যক্তি—ঐরূপ মনে হয়, তা কি করবো, বলুন? আপনি শিবের ধ্যান করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু নিত্য চেষ্টা করিলেও উহা কিছুতেই পারি না! ধ্যান করিতে বসিলেই আপনার প্রসন্ন মুখখানি সম্মুখে জ্বল্ জ্বল্ করিতে থাকে, উহাকে সরাইয়া শিবকে কিছুতেই মনে আনিতে পারি না, ইচ্ছাও হয় না। সুতরাং আপনাকে শিব বলিয়া ভাবি।

ঠাকুর—(হাসিতে হাসিতে) বলিস্ কিরে! আমি কিন্তু জানি, আমি তোর একগাছি ছোট কেশের সমান (উভয়ের হাস্য)। যাহক্, তোর জন্য বড় ভাবনা ছিল, আজ নিশ্চিন্ত হইলাম।

শেষোক্ত কথাগুলি ঠাকুর কেন বলিলেন, তাহা ঐ ব্যক্তি তখন বুঝিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না। আমাদিগের জানা আছে, ঐরূপ স্থলে ঠাকুর প্রসন্ন হইয়াছেন—এই কথা বুঝিয়াই আমাদিগের প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিত এবং তাঁহার ঐরূপ কথাসকল বুঝিবার প্রবৃত্তি থাকিত না! এখন বুঝিতে পারি, তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে জানিয়াই ঠাকুর ঐ ব্যক্তিকে ঐ দিবস ঐ কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

আশ্রিত ভক্তগণ তদীয় সর্ব্বপ্রকার আচরণ তন্ন তন্ন ভাবে লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া যাহাতে তাঁহাকে ঐরূপে গ্রহণ করে তজ্জন্য

ঠাকুরের বিশেষ প্রযত্ন ছিল। কারণ প্রায়ই তিনি আমাদিগকে বলিতেন, "সাধুকে দিনে দেখিবি, রাত্রে দেখিবি, তবে সাধুকে বিশ্বাস করিবি।" সাধু অপরকে যাহা শিক্ষা দেয় স্বয়ং তাহা অনুষ্ঠান করে কি না তদ্বিষয় বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে ঠাকুর আমাদিগকে সর্ব্বদা উৎসাহিত করিতেন। বলিতেন—কথায় এবং কার্য্যে, মন ও মুখে যাহার মিল নাই, তাহার কথায় কখনও বিশ্বাস করিতে নাই। ঐ প্রসঙ্গে একটি গল্পও তাঁহাকে কখনও কখনও বলিতে শুনিয়াছি।

কথায় ও কার্য্যে যাহার মিল নাই তাহাকে বিশ্বাস করিতে নাই

কোন ব্যক্তির স্বল্পবয়স্ক পুত্র সর্ব্বদা অজীর্ণরোগে কষ্ট পাইত। পিতা তাহার চিকিৎসার জন্য তাহাকে গ্রামান্তরে এক বিখ্যাত বৈদ্যের নিকট একদিন লইয়া যাইল। বৈদ্য বালককে পরীক্ষাদি করিয়া তাহার রোগনির্ণয় করিলেন, কিন্তু ঔষধের ব্যবস্থা সেদিন না করিয়া তাহাকে পরদিবস পুনরায় আসিতে বলিলেন। পিতা পুত্রকে লইয়া ঐদিন উপস্থিত হইলে বৈদ্য বালককে বলিলেন, "তুমি গুড় খাওয়া পরিত্যাগ কর, তাহা হইলেই সারিয়া যাইবে, ঔষধ খাইবার প্রয়োজন নাই।" পিতা ঐকথা শুনিয়া বলিল, "মহাশয়, ঐকথা ত কাল বলিলেই পারিতেন; তাহা হইলে এতটা কষ্ট করিয়া আজি এতদূর আসিতে হইত না!" বৈদ্য তাহাতে বলিলেন, "কি জান, কল্য আমার এখানে কয়েক কলসি গুড় ছিল—দেখিয়াছিলে বোধ হয়। কাল যদি বালককে গুড় খাইতে নিষেধ করিতাম, তাহা হইলে সে ভাবিত, কবিরাজ লোক মন্দ নয়, নিজে এত গুড় খাইতেছে আর আমাকে কি না গুড় খাইতে নিষেধ

ঐ বিষয়ে ঠাকুরের গল্প—বৈদ্য ও অসুস্থ বালক

করিতেছে। ঐরূপ ভাবিয়া সে আমার কথায় শ্রদ্ধা করা দূরে থাকুক কিছুমাত্র বিশ্বাস করিত না। সেজন্য গুড়ের কলসি সরাইবার পূর্ব্বে তাহাকে ঐকথা বলি নাই।”

ঠাকুরের ঐরূপ শিক্ষার প্রেরণায় আমরা সকলে তাঁহার আচরণসমূহ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতাম। কেহ কেহ আবার উহার প্রভাবে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেও পশ্চাৎপদ হইত না! ফলে দেখা গিয়াছে, নিজ নিজ বিশ্বাসভক্তি বৃদ্ধির জন্য সরলান্তঃকরণে আমরা তাঁহার উপরে যে যাহা আবদার-অত্যাচার করিয়াছি, সে সকলই তিনি প্রসন্নমনে সহ্য করিয়াছেন। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তপাঠে পাঠকের ঐ কথা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ভক্তগণের ঠাকুরকে পরীক্ষা

যোগানন্দ স্বামিজীর সম্বন্ধে কোন কোন কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠককে বলিয়াছি। ঘটনাটি তাঁহাকে লইয়াই হইয়াছিল এবং তাঁহারই নিকটে আমরা পরে শ্রবণ করিয়াছিলাম। শ্রীযুত যোগানন্দের পরিচয় সংক্ষেপে পাঠককে প্রথমে প্রদানপূর্ব্বক আমরা উহা বলিতে প্রবৃত্ত হইব। যোগানন্দের পূর্ব্বনাম যোগীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ছিল। সুবিখ্যাত সাবর্ণ চৌধুরীদের বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতা নবীনচন্দ্র এককালে ধনাঢ্য জমিদার ছিলেন এবং পুরুষানুক্রমে দক্ষিণেশ্বর গ্রামেই বাস করিতেছিলেন। যোগীন্দ্রের বাল্যকালে এবং তৎপূর্ব্বে তাঁহার বাসভবন ভারত-ভাগবতাদি গ্রন্থপাঠে, পূজা ও কীর্ত্তনাদিতে সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত। ঠাকুর বলিতেন, সাধনকালে তিনি বহুবার ঐ ভবনে হরিকথা শুনিতে

১ম দৃষ্টান্ত—যোগানন্দ স্বামীর কথা

গিয়াছিলেন এবং কর্ত্তাদিগের কাহারও কাহারও সহিত পরিচিত ছিলেন। কিন্তু যোগীন্দ্র কৈশোরকাল অতিক্রম করিতে না করিতে গৃহবিসম্বাদ এবং অন্য নানা কারণে তাঁহাদিগের অধিকাংশ সম্পত্তি নষ্ট হইয়া চৌধুরীবংশীয়েরা দিন দিন নিঃস্ব হইয়াছিলেন।

যোগীন্দ্রের পুণ্য সংস্কারসমূহ ও বুদ্ধিমত্তা

যোগীন্দ্র বাল্যকাল হইতেই ধীর, বিনয়ী ও মধুরপ্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন। অসাধারণ শুভ সংস্কারসকল লইয়া তিনি সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বাল্যকালে তাঁহার সর্ব্বদা মনে হইত তিনি পৃথিবীর লোক নহেন, এখানে তাঁহার আবাস নহে, অতি দূরের কোন এক নক্ষত্রপুঞ্জে তাঁহার যথার্থ আবাস এবং সেখানেই তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত সঙ্গীসকল এখনও রহিয়াছে! আমরা তাঁহাকে কখনও ক্রোধ করিতে দেখি নাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "আমাদিগের ভিতর যদি কেহ সর্ব্বতোভাবে কামজিৎ থাকে ত সে যোগীন।" সরল-ভাবে সকলকে বিশ্বাস করিবার জন্য ঠাকুরের নিকটে কখন কখন তিরস্কৃত হইলেও যোগীন্দ্র নির্ব্বোধ ছিলেন না এবং সর্ব্বদা শান্তভাবে নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও তাঁহার বিচারশীল মন সকলের সকল কার্য্য লক্ষ্যপূর্ব্বক তাহাদিগের সম্বন্ধে যে সকল মতামত স্থির করিত তাহা সত্য ভিন্ন প্রায় মিথ্যা হইত না। সেইজন্য যোগীন্দ্রের বুদ্ধিমান বলিয়া একটু অহঙ্কার ছিল বলিয়া বোধ হয়।

দক্ষিণেশ্বরে বসবাস থাকায় যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতে যোগীন ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। প্রথম আগমন-দিবসে ঠাকুর ইঁহাকে দেখিয়া ও ইঁহার পরিচয় পাইয়া বিশেষ প্রীত

হইয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন তাঁহার নিকটে ধর্ম্মলাভ করিতে আসিবে বলিয়া যে-সকল ব্যক্তিকে শ্রীশ্রীজগন্মাতা তাঁহাকে বহুপূর্ব্বে দেখাইয়াছিলেন, যোগীন কেবলমাত্র তাঁহাদিগের অন্যতম নহেন, কিন্তু যে ছয়জন বিশেষ ব্যক্তিকে ঈশ্বরকোটী বলিয়া জগদম্বার কৃপায় তিনি পরে জানিতে পারিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদিগেরও অন্যতম।

ঠাকুরের কথা—যোগীন্দ্র ঈশ্বরকোটী ভক্ত

আমরা অন্যত্র বলিয়াছি মাতার করুণ ক্রন্দনে যোগীন সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বে সহসা বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "বিবাহ করিয়াই মনে হইল ঈশ্বরলাভের আশা করা এখন বিড়ম্বনামাত্র; যে ঠাকুরের প্রথম শিক্ষা কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ তাঁহার কাছে আর কিসের জন্য যাইব; হৃদয়ের কোমলতায় জীবনটা নষ্ট করিয়াছি, উহা আর ফিরিবার নহে; এখন যত শীঘ্র মৃত্যু হয় ততই মঙ্গল। পূর্ব্বে ঠাকুরের নিকটে প্রতিদিন যাইতাম, ঐ ঘটনার পরে এককালে যাওয়া বন্ধ করিলাম এবং দারুণ হতাশ ও মনস্তাপে দিন কাটাইতে লাগিলাম। ঠাকুর কিন্তু ছাড়িলেন না। বারংবার লোক প্রেরণ করিয়া ডাকিয়া পাঠাইতে লাগিলেন এবং তাহাতেও যাইলাম না দেখিয়া অপূর্ব্ব কৌশল অবলম্বন করিলেন। কালীবাটীর এক ব্যক্তি কোন দ্রব্য ক্রয় করিয়া দিবার নিমিত্ত আমাকে বিবাহের পূর্ব্বে কয়েকটি মুদ্রা দিয়াছিলেন। দ্রব্যটির মূল্য প্রদান করিয়া দুই-চারি আনা পয়সা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। দ্রব্যটি লোক মারফত তাঁহাকে পাঠাইয়া বলিয়া দিয়াছিলাম উদ্বৃত্ত পয়সা শীঘ্র পাঠাইতেছি।

যোগীন্দ্রের বিবাহ, মনস্তাপ ও ঠাকুরের নিকটে গমনে বিরত হওয়ায় ঠাকুরের কৌশলপূর্ব্বক তাহাকে আনয়ন ও সান্ত্বনা

ঠাকুর উহা জানিতে পারিয়া একদিন কৃত্রিম কোপ প্রকাশপূর্ব্বক আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'তুই কেমন লোক? লোকে জিনিস কিনিতে দিলে তাহার হিসাব দেওয়া, বাকি পয়সা ফিরাইয়া দেওয়া দূরে থাকুক, কবে দিবি তাহার একটা সংবাদ পাঠান পর্য্যন্ত নাই!' ঐ কথায় আমার হৃদয়ে বিষম অভিমান জাগিয়া উঠিল; ভাবিলাম, ঠাকুর আমাকে এতদিন পরে জুয়াচোর মনে করিলেন! থাক্, আজ কোনরূপে যাইয়া এই গণ্ডগোল মিটাইয়া দিয়া আসিব; পরে কালীবাড়ীর দিক আর মাড়াইব না। হতাশ, অনুতাপ, অভিমান, অপমানাদি নানা ভাবে মৃতকল্প হইয়া অপরাহ্নে কালীবাড়ীতে যাইলাম। দূর হইতে দেখিতে পাইলাম, ঠাকুর পরিধানের কাপড়খানি বগলে ধারণ করিয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া যেন ভাবাবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমাকে দেখিবামাত্র বেগে অগ্রসর হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'বিবাহ করিয়াছিস্, তাহাতে ভয় কি? এখানকার কৃপা থাকিলে লাখ্‌টা বিবাহ করিলেও কোন ক্ষতি হইবে না; যদি সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরলাভ করিতে চাস্ তাহা হইলে তোর স্ত্রীকে একদিন এখানে লইয়া আসিস্—তাহাকে ও তোকে সেইরূপ করিয়া দিব; আর যদি সংসারত্যাগ করিয়া ঈশ্বরলাভ করিতে চাস্, তাহা হইলে তাহাই করিয়া দিব!' অর্দ্ধবাহ্যদশায় অবস্থিত ঠাকুরের ঐ কথাগুলি একেবারে প্রাণের ভিতরে স্পর্শ করিল এবং ইতিপূর্ব্বের হতাশ অন্ধকার কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল! অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনিও সস্নেহে আমার হাত ধরিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত হিসাব ও উদ্বৃত্ত পয়সার কথা যখন তুলিতে যাইলাম

তখন সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না।” গৃহত্যাগী উদাসীনের ভাব লইয়া যোগীন্দ্র সংসারে আসিয়াছিলেন, বিবাহ করিয়াও তাঁহার ঐভাব কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হইল না। পূর্ব্বের ন্যায় ঠাকুরের সেবায় ও আশ্রয়েই তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। পুত্রকে বিষয়-কর্ম্ম ও অর্থোপার্জ্জনে উদাসীন দেখিয়া পিতামাতা অনুযোগ করিতে লাগিলেন। যোগীন বলিতেন, “ঐরূপ অনুযোগের কালে মাতা একদিন বলিলেন, ‘যদি উপার্জ্জনে মন দিবি না তবে বিবাহ করিলি কেন?’ বলিলাম, ‘আমি ত ঐ সময়ে তোমাদিগকে বারম্বার বলিয়াছিলাম বিবাহ করিব না; তোমার ক্রন্দন সহ্য করিতে না পারিয়াই ত পরিশেষে ঐ কার্য্যে সম্মত হইলাম।’ মাতা ক্রুদ্ধা হইয়া ঐ কথায় বলিয়া বসিলেন, ‘ওটা কি আবার একটা কথা—ভিতরে ইচ্ছা না হইলে তুই আমার জন্য বিবাহ করিয়াছিস্, ইহা কি সম্ভবে?’ তাঁহার ঐ কথায় এককালে নির্ব্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, হা ভগবান্! যাঁহার কষ্ট না দেখিতে পারিয়া তোমাকে ছাড়িতে উদ্যত হইলাম, তিনিই এই কথা বলিলেন! দূর হ’ক, এই সংসারে মন ও মুখে মিল থাকা একমাত্র ঠাকুর ভিন্ন আর কাহারও নাই। সেইদিন হইতে সংসারে এককালে বীতরাগ উপস্থিত হইল। ঐ ঘটনার পর হইতে ঠাকুরের নিকটে মাঝে মাঝে রাত্রেও থাকিতে লাগিলাম।”

ঠাকুরের নিকটে সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিয়া যোগীন্দ্র একদিন দেখিলেন, সন্ধ্যার প্রাক্কালে সমাগত ভক্তগণের সকলেই একে একে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক নিজ নিজ ভবনে চলিয়া গেল। কোনরূপ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে রাত্রে লোকাভাবে ঠাকুরের

কষ্ট হইতে পারে ভাবিয়া তিনি সেদিন বাটীতে ফিরিবার সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। ঠাকুরও যোগীনের ঐরূপ করায় বিশেষ প্রসন্ন হইলেন। ঈশ্বরীয় আলাপে ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। ঠাকুর তখন জলযোগ করিলেন এবং যোগীন্দ্রের ভোজন শেষ হইলে তাঁহাকে গৃহমধ্যেই শয়ন করিতে বলিয়া স্বয়ং শয্যাগ্রহণ করিলেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে ঠাকুরের বহির্গমনের ইচ্ছা উপস্থিত হওয়ায় তিনি যোগীনের দিকে চাহিয়া দেখিলেন সে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। কাঁচা ঘুম ভাঙ্গাইলে কষ্ট হইবে ভাবিয়া তাঁহাকে না ডাকিয়া তিনি একাকী পঞ্চবটী অভিমুখে অগ্রসর হইয়া ঝাউতলায় চলিয়া যাইলেন।

যোগীন্দ্রের দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবাস

যোগীন্দ্র চিরকাল স্বল্পনিদ্র ছিলেন। ঠাকুর চলিয়া যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। গৃহের দ্বার খোলা রহিয়াছে দেখিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং শয্যায় ঠাকুরকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, তিনি এত রাত্রে কোথায় গমন করিয়াছেন। গাড়ু প্রভৃতি জলপাত্রসকল যথাস্থানে রহিয়াছে দেখিয়া ভাবিলেন, ঠাকুর বুঝি তবে বাহিরে পাদচারণ করিতেছেন। যোগীন্দ্র বাহিরে আসিলেন, জ্যোৎস্নালোকের সাহায্যে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহার মনে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইল—তবে কি ঠাকুর নহবতে নিজ পত্নীর নিকটে শয়ন করিতে গিয়াছেন?—তবে কি তিনিও মুখে যাহা বলেন কার্য্যে তাহার বিপরীত অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন?

ঠাকুরের প্রতি সন্দেহ

যোগেন

স্বামী যোগানন্দ

যোগীন্দ্র বলিতেন, "ঐ চিন্তার উদয়মাত্র সন্দেহ, ভয় প্রভৃতি নানা ভাবের যুগপৎ সমাবেশে এককালে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। পরে স্থির করিলাম, নিতান্ত কঠোর এবং রুচি-বিরুদ্ধ হইলেও যাহা সত্য তাহা জানিতে হইবে।

যোগীন্দ্রের সংশয়ের মীমাংসা

অনন্তর নিকটবর্ত্তী একস্থানে দাঁড়াইয়া নহবত-খানার দ্বারদেশ লক্ষ্য করিতে থাকিলাম। কিছুকাল ঐরূপ করিতে না করিতে পঞ্চবটীর দিক্ হইতে চটীজুতার চট্ চট্ শব্দ শুনিতে পাইলাম এবং অবিলম্বে ঠাকুর আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 'কি রে, তুই এখানে দাঁড়াইয়া আছিস্ যে?' তাঁহার উপরে মিথ্যা সন্দেহ করিয়াছি বলিয়া লজ্জা ও ভয়ে জড়সড় হইয়া অধোবদনে দাঁড়াইয়া থাকিলাম, ঐ কথার কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। ঠাকুর আমার মুখ দেখিয়াই সকল কথা বুঝিতে পারিলেন এবং অপরাধ গ্রহণ না করিয়া আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, 'বেশ, বেশ, সাধুকে দিনে দেখিবি, রাত্রে দেখিবি, তবে বিশ্বাস করিবি!' ঐ কথা বলিয়া ঠাকুর আমাকে অনুসরণ করিতে বলিয়া নিজ গৃহের দিকে অগ্রসর হইলেন। সন্দিগ্ধ স্বভাবের প্রেরণায় কি ভয়ানক অপরাধ করিয়া বসিলাম, একথা ভাবিয়া সে রাত্রে আমার আর নিদ্রা হইল না।"

গুরুপদে সর্ব্বতোভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়া প্রথমে তাঁহার, এবং তাঁহার অন্তর্দ্ধানে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সেবাতে প্রাণপাত করিয়া স্বামী যোগানন্দ পরজীবনে পূর্ব্বোক্ত অপরাধের সম্যক্ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া-ছিলেন। তাঁহার ন্যায় তীব্র-বৈরাগ্যসম্পন্ন, জ্ঞান ও ভক্তির

যোগীন্দ্রের গুরুপদে আত্ম-সমর্পণ

সমভাবে অধিকারী, সমাধিবান্ যোগীপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সন্ন্যাসি-সঙ্ঘে বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি দেহরক্ষা করিয়া পরমপদে মিলিত হইয়াছিলেন।

নরেন্দ্রের কার্য্য লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা করেন

দক্ষিণেশ্বর আগমনের পর হইতে ঠাকুর যে নরেন্দ্রনাথের প্রতিকার্য্য তন্ন তন্ন করিয়া নিত্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন একথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। উহার ফলে তিনি বুঝিয়াছিলেন ধর্ম্মানুরাগ, সাহস, সংযম, বীর্য্য ও মহদুদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ করা প্রভৃতি সদ্গুণসকল নরেন্দ্রের হৃদয়ে স্বভাবতঃ প্রদীপ্ত রহিয়াছে। বুঝিয়াছিলেন, শুভ সংস্কারনিচয় তাঁহার হৃদয়ে এত অধিক বিদ্যমান রহিয়াছে যে, প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া বিশেষরূপে প্রলুব্ধ হইলেও ইতরসাধারণের ন্যায় হীন কার্য্যের অনুষ্ঠান তাঁহার দ্বারা কখনও সম্ভবপর হইবে না। আর, সত্যনিষ্ঠা—নরেন্দ্রের কঠোর সত্যপালন দেখিয়া তিনি যে কেবল তাহার সকল কথায় বিশ্বাস করিতেন তাহাই নহে, কিন্তু তাঁহার প্রাণে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, শীঘ্রই তাহার এমন অবস্থা উপস্থিত হইবে যখন সত্য ভিন্ন মিথ্যা বাক্য প্রমাদকালেও তাহার মুখ দিয়া নির্গত হইবে না—যখন তাহার মনের যদৃচ্ছা-উত্থিত সংকল্প-সকলও সর্ব্বদা সত্যে পরিণত হইবে! সেজন্য তিনি তাহাকে ঐ বিষয়ে সর্ব্বদা উৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক বলিতেন, "যে কায়মনো-বাক্যে সত্যকে ধরিয়া থাকে সে সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের দর্শনলাভে ধন্য হয়,"—"বার বৎসর কায়মনোবাক্যে সত্যপালন করিলে মানব সত্যসংকল্প হয়।"

সত্যনিষ্ঠার জন্য নরেন্দ্রনাথের উপর ঠাকুরের দৃঢ় বিশ্বাস সম্বন্ধে একটি রহস্যজনক ঘটনা আমাদিগের মনে উদয় হইতেছে।

রহস্যজনক ঘটনা—চামচিকাকে চাতক নির্ণয়

একদিন কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর ভক্তের স্বভাব চাতক পক্ষীর ন্যায় হইয়া থাকে বলিয়া বুঝাইয়া দিতেছিলেন, "চাতক যেমন নিজ পিপাসাশান্তির জন্য সর্ব্বদা মেঘের দিকে তাকাইয়া থাকে এবং উহার উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে, ভক্তও তদ্রূপ নিজ প্রাণের পিপাসা ও সর্ব্বপ্রকার অভাব মিটাইবার জন্য একমাত্র ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে"—ইত্যাদি। নরেন্দ্রনাথ তখন তথায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন, "মহাশয়, চাতক বৃষ্টির জল ভিন্ন অন্য কিছু পান করে না—ঐরূপ প্রসিদ্ধি থাকিলেও ঐকথা সত্য নহে, অন্য পক্ষীসকলের ন্যায় নদী প্রভৃতি জলাশয়েও পিপাসাশান্তি করিয়া থাকে। আমি চাতক পক্ষীকে ঐরূপে জলপান করিতে দেখিয়াছি।" ঠাকুর বলিলেন, "সে কিরে! চাতক অন্য পক্ষীর ন্যায় জলপান করে? তবে ত আমার এত কালের ধারণা মিথ্যা হল। তুই যখন দেখিয়াছিস্ তখন ত আর ঐ বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারি না।" বালকের ন্যায় স্বভাবসম্পন্ন ঠাকুর ঐরূপ বলিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন না, ভাবিতে লাগিলেন—ঐ ধারণাটা যেমন ভ্রম বলিয়া প্রমাণিত হইল, তাঁহার অন্য ধারণাসকলও ত ঐরূপ হইতে পারে। ঐরূপ ভাবিয়া তিনি বিশেষ বিষণ্ণ হইলেন। উহার স্বল্পদিন পরেই নরেন্দ্র এক দিবস ঠাকুরকে সহসা ডাকিয়া বলিলেন, "ঐ দেখুন মহাশয়, চাতক গঙ্গার জল পান করিতেছে।" ঠাকুর ব্যস্ত হইয়া দেখিতে আসিয়া বলিলেন, "কৈ রে?" নরেন্দ্র

দেখাইয়া দিলে তিনি দেখিলেন একটি চাম্‌চিকা জল পান করিতেছে এবং হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওটা চাম্‌চিকা যে! ওরে শালা, তুই চাম্‌চিকাকে চাতকজ্ঞান করিয়া আমাকে এতটা ভাবাইয়াছিস্! তোর সকল কথায় আর বিশ্বাস করিব না।"

নরেন্দ্রের সংযম

সম্মান, শিষ্টাচার, সৌন্দর্য্যানুভব প্রভৃতি ভাবসমূহের প্রেরণায় যতদূর কোমল হওয়া সম্ভবপর, রমণীর সম্মুখে সাধারণ মানবের অন্তর অনেক সময়ে তদপেক্ষা অধিকতর মৃদুভাব অবলম্বন করে। হৃদয়ের সুপ্রচ্ছন্ন সংস্কারবিশেষ উহাকে ঐরূপ করিয়া থাকে, একথা শাস্ত্রসম্মত। নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে ঐরূপ সংস্কার চিরকাল স্বল্প পরিলক্ষিত হইত! উহা লক্ষ্য করিয়া ঠাকুরের মনে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, নরেন্দ্র রূপজ মোহে আত্মহারা হইয়া সংযমের পথ হইতে কখনও ভ্রষ্ট হইবে না। ঘন ঘন ভাবসমাধি হওয়ার জন্য আমাদিগের নিকটে এক সময়ে উচ্চ-সম্মানপ্রাপ্ত জনৈকের[১] সহিত নরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে তুলনা করিয়া ঠাকুর এক দিবস বলিয়াছিলেন, "রমণীগণের আদরযত্নে ঐব্যক্তি যেন এককালে আত্মহারা হইয়া গড়াইয়া পড়ে; নরেন্দ্র কখন ঐরূপ হয় না; বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, ঐরূপ স্থলে সে মুখে কিছু না বলিলেও তাহার ভাব দেখিয়া মনে হয় সে যেন বিরক্ত হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বলিতেছে, 'এরা আবার এখানে কেন?'"

জ্ঞানের প্রকাশ এবং পুরুষোচিত ভাবসমূহ প্রবল থাকিলেও নরেন্দ্রনাথের ভিতরে কোমলতা ও ভক্তিভাবের স্বল্পতা ছিল না,

১ নৃত্যগোপাল—ইনি পরজীবনে জ্ঞানানন্দ স্বামী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঠাকুর ঐকথা আমাদিগকে অনেক সময়ে বলিয়াছেন। সামান্ত সামান্ত আচরণে প্রকাশিত কেবলমাত্র তাঁহার মনের ভাবসকল লক্ষ্য করিয়াই তিনি যে উক্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার শারীরিক লক্ষণসকল দেখিয়াও তিনি ঐ বিষয় স্থির করিয়াছিলেন। আমাদের স্মরণ হয়, একদিন নরেন্দ্রনাথের মুখ-শ্রী দেখিতে দেখিতে তিনি বলিয়াছিলেন, "এইরূপ চক্ষু কি কখনও শুষ্ক জ্ঞানীর হইয়া থাকে? জ্ঞানের সহিত রমণীসুলভ ভক্তির ভাব তোর ভিতরে বিলক্ষণ রহিয়াছে। কেবলমাত্র পুরুষোচিত ভাবসকল যাহার ভিতরে থাকে তাহার স্তনের বোঁটার চারিদিকে ভেলার দাগ (কালবর্ণ) থাকে না—মহাবীর অর্জ্জুনের ঐরূপ ছিল।"

শারীরিক লক্ষণ দেখিয়া নরেন্দ্রের পরিমাণ নির্ণয়

পূর্ব্বোল্লিখিত চারিপ্রকার সাধারণ উপায় ভিন্ন আমাদিগের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত অন্য নানাপ্রকারে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রধান দুই-একটির কথা আমরা পাঠককে অতঃপর বলিব। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আসিলে ঠাকুর তাঁহাকে লইয়াই ব্যস্ত হইতেন। তাঁহাকে দূরে দেখিবামাত্র ঠাকুরের সম্পূর্ণ অন্তর যেন প্রবলবেগে শরীর হইতে নির্গত হইয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিত! "ঐ ন—, ঐ ন—" বলিতে বলিতে আমরা কতদিন ঠাকুরকে ঐরূপে সমাধিস্থ হইয়া পড়িতে দেখিয়াছি তাহা বলা যায় না। ঐরূপ হইলেও কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে কিছুকাল যাতায়াত করিবার পরে এমন একদিন

ঠাকুরের উদাসীনতায় নরেন্দ্রের আচরণ

আসিয়াছিল যেদিন নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে আগমন করিলে তিনি তাঁহার সহিত সর্ব্বপ্রকারে উদাসীনের ন্যায় আচরণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। নরেন্দ্র আসিলেন, ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন, সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া কিছুকাল অপেক্ষা করিলেন—ঠাকুর কিন্তু আদরযত্ন করা দূরে থাকুক একবার কুশলপ্রশ্ন পর্য্যন্ত না করিয়া সম্পূর্ণ অপরিচিতের ন্যায় তাঁহার দিকে একবার দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক আপনমনে বসিয়া রহিলেন। নরেন্দ্র ভাবিলেন, ঠাকুর বুঝি ভাবাবিষ্ট রহিয়াছেন। অগত্যা কিছুক্ষণ পরে গৃহের বাহিরে আসিয়া হাজরা মহাশয়ের সহিত বাক্যালাপে ও তামাকুসেবনে নিযুক্ত রহিলেন। ঠাকুর অপরের সহিত কথা কহিতেছেন শুনিতে পাইয়া নরেন্দ্র পুনরায় তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখনও ঠাকুর তাঁহাকে কিছুই না বলিয়া অপরদিকে মুখ ফিরাইয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। ঐরূপে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইয়া সন্ধ্যা উপস্থিত হইলেও ঠাকুরের ভাবান্তর না দেখিয়া নরেন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কলিকাতায় ফিরিলেন।

সপ্তাহকাল অতীত হইতে না হইতে নরেন্দ্রনাথ পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্ব্বক ঠাকুরকে তদবস্থ দেখিলেন। সেদিনও হাজরা মহাশয় ও অন্যান্য ব্যক্তির সহিত নানাবিধ আলাপে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। ঐরূপে তৃতীয় এবং চতুর্থ দিবস দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াও নরেন্দ্র ঠাকুরের কিছুমাত্র ভাবান্তর দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু উহাতেও তিনি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ বা বিচলিত না হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় সমভাবে ঠাকুরের নিকটে গমনাগমন করিতে থাকিলেন।

নরেন্দ্র বাটীতে থাকিবার কালে ঠাকুর তাঁহার কুশলসংবাদাদি লইতে মধ্যে মধ্যে কাহাকেও পাঠাইতেন বটে, কিন্তু নিকটে আসিলেই তাঁহার সহিত ঐরূপ ব্যবহার কিছুকাল পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। এক মাসের অধিক কাল ঐরূপে গত হইলে ঠাকুর যখন দেখিতে পাইলেন নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিতে বিরত হইলেন না, তখন একদিন তাঁহাকে নিকটে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আমি তো তোর সহিত একটা কথাও কহি না, তবু তুই এখানে কি করিতে আসিস্ বল দেখি ?" নরেন্দ্র বলিলেন, "আমি কি আপনার কথা শুনিতে এখানে আসি ? আপনাকে ভালবাসি, দেখিতে ইচ্ছা করে, তাই আসিয়া থাকি।" ঠাকুর ঐ কথায় বিশেষ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "আমি তোকে বিড়ে (পরীক্ষা করে) দেখ্ছিলাম—আদরযত্ন না পেলে তুই পালাস্ কি না ; তোর মত আধারই এতটা (অবজ্ঞা ও উদাসীন ভাব) সহ্য করিতে পারে—অপরে এতদিন কোন্ কালে পলায়ন করিত, এদিক আর মাড়াইত না।"

আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দর্শনলাভের আগ্রহ নরেন্দ্রনাথের অন্তরে কতদূর প্রবল ছিল, তাহা উহার সহায়ে সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইবে। এক সময়ে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে পঞ্চবটীতলে আহ্বানপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "ছাখ্, তপস্যাপ্রভাবে আমাতে অণিমাদি বিভূতিসকল অনেক কাল হইল উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আমার ন্যায় ব্যক্তির, যাহার পরিধানের কাপড় পর্য্যন্ত ঠিক থাকে না, তাহার ঐ সকল যথাযথ ব্যবহার করিবার অবসর কোথায় ?

ঈশ্বর দর্শনের আগ্রহে নরেন্দ্রের অণিমাদি বিভূতি প্রত্যাহার

তাই ভাবিতেছি, মাকে বলিয়া তোকে ঐ সকল প্রদান করি ; কারণ মা জানাইয়া দিয়াছেন, তোকে তাঁর অনেক কাজ করিতে হইবে। ঐ সকল শক্তি তোর ভিতরে সঞ্চারিত হইলে কার্য্যকালে ঐ সকল ব্যবহারে লাগাইতে পারিবি—কি বলিস্ ?" ঠাকুরের পুণ্যদর্শন লাভ করিবার দিন হইতে নরেন্দ্র দৈবীশক্তির অশেষ প্রকাশ তাঁহাতে নয়নগোচর করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার ঐ কথায় অবিশ্বাস করিবার নরেন্দ্রের কোন কারণ ছিল না। অবিশ্বাস না করিলেও কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক ঈশ্বরানুরাগ তাঁহাকে ঐ সকল বিভূতি নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিল না। তিনি চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, ঐ সকলের দ্বারা আমার ঈশ্বরলাভ বিষয়ে সহায়তা হইবে কি ?" ঠাকুর বলিলেন, "সে বিষয়ে সহায়তা না হইলেও ঈশ্বরলাভ করিয়া যখন তাঁহার কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবি, তখন উহারা বিশেষ সহায়তা করিতে পারিবে।" নরেন্দ্র ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, "মহাশয়. আমার ঐ সকলে প্রয়োজন নাই। আগে ঈশ্বরলাভ হউক, পরে ঐ সকল গ্রহণ করা না করা সম্বন্ধে স্থির করা যাইবে। বিচিত্র বিভূতিসকল এখন লাভ করিয়া যদি উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাই এবং স্বার্থপরতার প্রেরণায় উহাদিগকে অযথা ব্যবহার করিয়া বসি, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হইবে যে।" ঠাকুর নরেন্দ্রকে অণিমাদি বিভূতিসকল সত্য-সত্য প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, অথবা তাঁহার অন্তর পরীক্ষার জন্য পূর্ব্বোক্ত-ভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় বলা আমাদিগের সাধ্যাতীত—কিন্তু নরেন্দ্র ঐ সকল গ্রহণে অসম্মত হওয়াতে তিনি যে বিশেষ প্রসন্ন হইয়াছিলেন, একথা আমাদিগের জানা আছে।

অষ্টম অধ্যায়—প্রথম পাদ

সংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা

ঠাকুর কখন কখন নরেন্দ্রের সহিত নিজ স্বভাবের তুলনায় আলোচনা করিয়া আমাদিগকে বলিতেন, "ইহার (তাঁহার নিজের) ভিতরে যে আছে তাহাতে স্ত্রীলোকের ন্যায় ভাবের ও নরেনের ভিতরে যে আছে তাহাতে পুরুষোচিত ভাবের প্রকাশ রহিয়াছে।" কথাগুলি তিনি ঠিক কোন্ অর্থে প্রয়োগ করিতেন তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। তবে ঈশ্বর বা চরম সত্যের অনুসন্ধানে তাঁহারা উভয়ে যে পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন অথবা যে উপায় প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত কথার একটা সঙ্গত অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ, দেখা যায় ঈশ্বরলাভ করিতে হইলে যে-সকল উপায় অবলম্বনীয় বলিয়া অধ্যাত্ম শাস্ত্রসমূহ নির্দ্দেশ করিয়াছে, ঠাকুর ঐ সকলের প্রত্যেকটি গুরুমুখে শ্রবণমাত্র উহাতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—নরেন্দ্রনাথের আচরণ কিন্তু ঐরূপ স্থলে সম্পূর্ণ বিভিন্নাকার ধারণ করিত। নরেন্দ্র ঐরূপ স্থলে শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে ভ্রম-প্রমাদের সম্ভাবনা আছে কি না তদ্বিষয় নির্ণয় করিতে নিজ বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রথমেই নিযুক্ত করিতেন এবং তর্কযুক্তিসহায়ে উহাদিগের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর বিবেচনা করিবার পরে উহাদিগের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন। পূর্ব্বসংস্কারবশে দৃঢ়আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন

আপনাতে স্ত্রীভাবের ও নরেন্দ্রে পুরুষ-ভাবের প্রকাশ বলিয়া ঠাকুর নির্দ্দেশ করিতেন—উহার অর্থ

হইলেও নরেন্দ্রের ভিতর—মানবমাত্রেই নানা কুসংস্কার ও ভ্রম-প্রমাদের বশবর্ত্তী, অতএব কাহারও কোন কথা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিব কেন ?—এইরূপ একটা ভাব আজীবন দেখিতে পাওয়া যায়। ফলাফল উহার যাহাই হউক এবং উহার উৎপত্তি যথায় যেরূপেই হউক না কেন, বুদ্ধিবৃত্তিসহায়ে বিশ্বাস-ভক্তিকে ঐরূপে সংযত রাখিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে এবং অন্য সকল বিষয়ে অগ্রসর হওয়াই যে বর্ত্তমান কালের মানবসাধারণের নিকটে পুরুষোচিত বলিয়া বিবেচিত হয়, একথা বলিতে হইবে না।

নরেন্দ্রের পারিপার্শ্বিক অবস্থানুগত শিক্ষা, স্বাধীন চিন্তা, সংশয়, গুরুবাদ-অস্বীকার প্রভৃতি

পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহ মানবজীবনে সর্ব্বত্র সর্ব্বকাল বিশেষ অধিকার বিস্তৃত করিয়া বসে। শুদ্ধ অধিকারবিস্তার কেন?—উহারাই উহাকে গন্তব্য পথে সর্ব্বদা নিয়মিত করিয়া থাকে। অতএব নরেন্দ্রের জীবনে উহাদিগের প্রভাব ও প্রেরণা পরিলক্ষিত হইবে ইহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। ঠাকুরের নিকটে যাইবার পূর্ব্বেই নরেন্দ্র নিজ অসাধারণ ধীশক্তিপ্রভাবে ইংরাজী কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস ও ন্যায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পাশ্চাত্যভাবে বিশেষরূপে ভাবিত হইয়াছিলেন। স্বাধীন চিন্তা সহায়ে সকল বিষয় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়ারূপ পাশ্চাত্ত্যের মূলমন্ত্র ঐ সময়েই তাঁহার মনে মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং শাস্ত্রবাক্যসকলে তিনি যে ঐ সময়ে বিশেষ সন্দিহান হইবেন ও অনেক স্থলে মিথ্যা বোধ করিবেন এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকভাবে ভিন্ন অপর কোন ভাবে মানব-বিশেষকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন, ইহাই স্বাভাবিক।

নিজ অভিভাবকদিগের জীবনাদর্শ এবং কলিকাতার তৎকালীন সমাজের অবস্থা নরেন্দ্রনাথকে পূর্ব্বোক্ত ভাবপোষণে সহায়তা করিয়াছিল। পিতামহ আজীবন হিন্দুশাস্ত্রে অশেষ আস্থাসম্পন্ন থাকিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও নরেন্দ্রের পিতা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও স্বাধীন-চিন্তার ফলে উক্ত বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন। পারস্য কবি হাফেজের কবিতা এবং বাইবেল-নিবদ্ধ ঈশার বাণীসমূহ তাঁহার নিকটে আধ্যাত্মিক ভাবের চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইত। সংস্কৃতভাষায় অজ্ঞতাবশতঃ গীতাপ্রমুখ হিন্দুশাস্ত্রসকল অধ্যয়ন করিতে না পারাতেই যে তাঁহাকে আধ্যাত্মিক রসোপভোগের জন্য ঐ সকল গ্রন্থের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল তাহা বলিতে হইবে না। আমরা শুনিয়াছি, নরেন্দ্রকে ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত দেখিয়া তিনি তাহাকে একখানি বাইবেল উপহার দিয়া একদিন বলিয়াছিলেন, "ধর্ম্মকর্ম্ম যদি কিছু থাকে তাহা কেবলমাত্র ইহারই ভিতরে আছে!" হাফেজের কবিতাবলী এবং বাইবেলের ঐরূপে প্রশংসা করিলেও তাঁহার জীবন যে ঐ সকল গ্রন্থোক্ত আধ্যাত্মিক ভাবে নিয়মিত ছিল, তাহা নহে। উহাদিগের সহায়ে ক্ষণিক রসানুভব ভিন্ন ঐরূপ করিবার প্রয়োজনীয়তা তিনি কখনও অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্বয়ং ভোগসুখে থাকিব এবং যথাসম্ভব দান করিয়া দশজনকে সুখী করিব—ইহাই তাঁহার জীবনের চরম উদ্দেশ্য ছিল। উহা হইতে এবং তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের আলোচনায় বুঝা যায় ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাস কতদূর শিথিল ছিল। বাস্তবিক পাশ্চাত্যের জড়বাদ ও

পিতার জীবন ও সমাজের ঐরূপ শিক্ষায় সহায়তা

ইহকালসর্ব্বস্বতা তখন নরেন্দ্রের পিতার ন্যায় ব্যক্তিদিগের ভিতর আধ্যাত্মিক বিষয়সকলে দারুণ সংশয় ও অনেক সময়ে নাস্তিকতা আনয়নপূর্ব্বক আমাদিগের প্রাচীন ঋষি ও শাস্ত্রসকলের নিকটে দুর্ব্বলতা ও কুসংস্কার ভিন্ন অন্য কিছু শিক্ষিতব্য নাই ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছিল এবং উহার প্রভাবে ধর্ম্মবিশ্বাস ও নৈতিক মেরুদণ্ড-বিহীন হইয়া তাহারা অন্তরে একরূপ ও বাহিরে অন্যরূপ ভাব পোষণপূর্ব্বক দিন দিন স্বার্থপর ও কপটাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। মহামনস্বী রাজা রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ ঐ দেশব্যাপী স্রোতের গতি স্বল্পকাল ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া পরিণামে পাশ্চাত্য-ভাবের প্রবল প্রভাবে অন্তর্বিবাদে দুই দলে বিভক্ত ও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল এবং ঐ দুই দলভুক্ত ব্যক্তিসকলের মধ্যেও পূর্ব্বোক্ত স্রোতে গাত্র ঢালিবার লক্ষণ তখন কিছু কিছু প্রকাশ পাইতেছিল।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এফ. এ. পরীক্ষার পরে শ্রীযুত নরেন্দ্র পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য ন্যায়, বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও নরেন্দ্রের সত্যলাভ হইল না বলিয়া অশান্তি

মিল্ প্রমুখ পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকসকলের মতবাদ তিনি ইতিপূর্ব্বেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন; এখন—ডেকার্টের 'অহংবাদ', হিউম্ এবং বেনের 'নাস্তি-কতা', স্পাইনোজার 'অদ্বৈতচিদ্বস্তুবাদ', ডারউইনের 'অভিব্যক্তিবাদ', কোঁতে ও স্পেন্সরের 'অজ্ঞেয়বাদ' এবং আদর্শ সমাজের অভিব্যক্তি প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিক মতবাদসমূহ আয়ত্ত করিয়া সত্যবস্তু নির্ণয় করিবার বিষম উৎসাহ তাঁহার প্রাণে উপস্থিত হইয়াছিল। জার্ম্মাণ দার্শনিকসকলের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া

দর্শনেতিহাস গ্রন্থসকলের সহায়ে তিনি কাণ্ট, ফিক্‌টে, হেগেল্‌, শপেনহর্‌ প্রভৃতির মতবাদের যথাসম্ভব পরিচয় গ্রহণেও অগ্রসর হইয়াছিলেন। আবার, স্নায়ু ও মস্তিষ্কের গঠন ও কার্য্যপ্রণালীর সহিত পরিচিত হইবার জন্য তিনি বন্ধুবর্গের সহিত মধ্যে মধ্যে মেডিকেল কলেজে যাইয়া শারীর-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বক্তৃতা শ্রবণ ও গ্রন্থপাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ফলে, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি পাশ্চাত্য দর্শনে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ অভিজ্ঞতা হইতে নিরপেক্ষ সদ্বস্তু ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারলাভের নিশ্চয় উপায় জানিতে পারা ও শান্তিলাভ করা দূরে থাকুক, মানব-মন-বুদ্ধিপ্রচারের সীমা ও ঐ সীমা অতিক্রম করিয়া অবস্থিত সত্যবস্তুকে প্রকাশ করিবার উহাদের নিতান্ত অসামর্থ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়া তাঁহার প্রাণে অশান্তির স্রোত অধিকতর বেগে প্রবাহিত হইয়াছিল।

নরেন্দ্রের সন্দেহ—প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্য, কোন্ প্রথানুসারে তত্ত্বানুসন্ধানে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য

পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানসহায়ে নরেন্দ্র স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের আক্ষেপ বা উত্তেজনা মানবমনে প্রতিমুহূর্ত্তে নানা বিকার আনয়নপূর্ব্বক তাহাতে সুখ-দুঃখাদি জ্ঞানের প্রকাশ উপস্থিত করিতেছে। ঐ সকল মানসিক বিকারই মানব দেশকালাদি সহায়ে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনুভব করিতেছে, কিন্তু বহির্জগৎ ও তদন্তর্গত যে-সকল বস্তু পূর্ব্বোক্ত উত্তেজনা ও বিকারসমূহ তাহার ভিতর উপস্থিত করিতেছে, তাহাদিগের যথার্থ স্বরূপ চিরকাল তাহার নিকটে অজ্ঞেয় হইয়া রহিয়াছে। অন্তর্জগৎ বা মানবের নিজ স্বরূপ সম্বন্ধেও

ঐ কথা সমভাবে প্রযোজ্য হইয়া রহিয়াছে। সেখানেও দেখা যাইতেছে কোন এক অপূর্ব্ব বস্তু নিজশক্তি সহায়ে মনে অহংজ্ঞান ও নানা ভাবের উদয় করিলেও তাহার স্বরূপ দেশকালের বাহিরে অবস্থান করায় মানব উহাকে ধরিতে বুঝিতে পারিতেছে না। ঐরূপে অন্তরে ও বাহিরে, যেদিকেই মানব-মন চরম সত্যের অনুসন্ধানে ধাবিত হইতেছে সেই দিকেই সে দেশকালের দুর্ভেদ্য প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া আপনার অকিঞ্চিৎকরত্ব সর্ব্বথা অনুভব করিতেছে। ঐরূপে, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন-বুদ্ধিরূপ যে যন্ত্রসহায়ে মানব বিশ্বরহস্য উদ্ঘাটনে ধাবিত হইয়াছে, তাহার বিশ্বের চরম কারণ প্রকাশ করিবার অসামর্থ্য—ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ, যাহার উপর ভিত্তি স্থাপনপূর্ব্বক সে সকল বিষয়ের অনুমান ও মীমাংসায় ব্যস্ত রহিয়াছে, তাহার ভিতরে নিরন্তর ভ্রমপ্রমাদের বর্ত্তমানতা—শরীর ভিন্ন আত্মার পৃথগস্তিত্ব আছে কি না তদ্বিষয় নিরাকরণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতকুলের সকল চেষ্টার বিফলতা প্রভৃতি নানা বিষয়ে নরেন্দ্রনাথ জানিতে পারিয়াছিলেন। ঐ জন্য আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দর্শনের চরম মীমাংসাসমূহ তাঁহার নিকটে যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীত হয় নাই। রূপ-রসাদি বিষয়ভোগে নিরন্তর আসক্ত মানবসাধারণের প্রত্যক্ষসকলকে সহজ ও স্বাভাবিক স্বীকার করিয়া লইয়া উহার উপর ভিত্তিস্থাপনপূর্ব্বক পাশ্চাত্যের অনুসরণে দর্শনশাস্ত্র গড়িয়া তোলা ভাল, অথবা বুদ্ধাদি চরিত্রবান্ মহাপুরুষসকলের অসাধারণ প্রত্যক্ষসকল ইতরসাধারণ মানব-প্রত্যক্ষের বিরোধী হইলেও, সত্য বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক উহাদিগকে ভিত্তিরূপে অবলম্বন করিয়া প্রাচ্যের প্রথানুসারে দার্শনিক

তত্ত্বানুসন্ধানে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য—ঐরূপ সন্দেহও তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল।

ঈশ্বর বা চরম সত্যলাভের সঙ্কল্প দৃঢ় রাখিয়া নরেন্দ্রের পাশ্চাত্য প্রথার গুণভাগ-মাত্র গ্রহণ

পাশ্চাত্য দর্শনোক্ত আধ্যাত্মিক মীমাংসাসকলের অধিকাংশ নরেন্দ্রনাথের অযুক্তিকর বলিয়া মনে হইলেও জড়বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহের এবং পাশ্চাত্যের বিশ্লেষণ-প্রণালীর তিনি ভূয়সী প্রশংসা করিতেন এবং মনোবিজ্ঞানের ও আধ্যাত্মিক রাজ্যের তত্ত্বসকলের পরীক্ষাস্থলে উহাদিগের সহায়তা সর্ব্বদা গ্রহণ করিতেন। ঠাকুরের জীবনের অসাধারণ প্রত্যক্ষসমূহ তিনি উহাদিগের সহায়ে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে এখন হইতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন এবং ঐরূপ পরীক্ষায় যে সকল তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইত, সেই সকলকে সত্য বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক নির্ভয়ে তাহাদিগের অনুষ্ঠান করিতেন। সত্যলাভের জন্য বিষম অস্থিরতা তাঁহার প্রাণ অধিকার করিলেও না বুঝিয়া কোনরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া এবং কাহাকেও ভয়ে ভক্তি করা তাঁহার এককালে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। বিচারবুদ্ধির যথাশক্তি পরিচালনের পরিণাম যদি নাস্তিক্য হয় তাহাও তিনি গ্রহণে স্বীকৃত ছিলেন এবং সংসারে ভোগসুখ ত দূরের কথা, নিজ প্রাণের বিনিময়ে যদি জীবনরহস্যের সমাধান ও সত্যপ্রকাশ উপস্থিত হয় তাহাতেও তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না। সুতরাং চরম সত্যের অনুসন্ধানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া নির্ভয়ে তিনি এই সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুসরণে ও উহার গুণভাগ গ্রহণে আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। উহার প্রভাবে তিনি বিশ্বাস-ভক্তির সরল পথ পরিত্যাগ করিয়া সময়ে সময়ে নানা

সন্দেহজালে নিপীড়িত ও অভিভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় ও ধীশক্তিই জয়ী হইয়া পরিণামে তাঁহাকে সত্যলাভে কৃতার্থম্মন্য করিয়াছিল। লোকে কিন্তু এই কালে অনেক সময়ে ভাবিয়া বসিত, পাশ্চাত্য গ্রন্থসকলে যে-সকল মত প্রকাশিত হয়, নরেন্দ্র সে সকলই নির্বিচারে গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার পাশ্চাত্য মতসকলের পক্ষপাতিত্ব এ সময়ে তাঁহার বন্ধুবর্গের ভিতর এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, গীতা অধ্যয়ন করিয়া তিনি যেদিন তাঁহাদিগের নিকটে উহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন, সেদিন বিস্মিত হইয়া তাঁহারা তাঁহার ঐরূপ আচরণের কথা ঠাকুরের কর্ণগোচর করিয়াছিলেন। ঠাকুরও তাহাতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সাহেবদের মধ্যে কেহ গীতা সম্বন্ধে ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া সে ঐরূপ করে নাই ত?"

অদ্ভুত দর্শন ও শ্রীগুরুর কৃপায় নরেন্দ্রের আস্তিক্যবুদ্ধি এইকালে রক্ষিত হয়

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে অন্তরে বিশেষ ভাব-পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বেই নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুণ্যদর্শন লাভপূর্ব্বক কতকগুলি অসাধারণ প্রত্যক্ষের অধিকারী হইয়াছিলেন। ঐ সকলের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই পাঠককে বলিয়াছি। নরেন্দ্রের আস্তিক্যবুদ্ধিকে সুদৃঢ় রাখিতে উহারা এখন বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। নতুবা পাশ্চাত্যের ভাব ও মতবাদ জগৎ-কারণ ঈশ্বরকে অজ্ঞেয় প্রমাণ করিয়া তাঁহাকে কতদূরে কোথায় লইয়া যাইত তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। স্বাভাবিক পুণ্যসংস্কারবশে তাঁহার আস্তিক্যবুদ্ধির উহাতে এককালে লোপসাধন না হইলেও উহা বিষম বিপর্য্যস্ত হইত বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে।

কিন্তু তাহা হইবার নহে। নরেন্দ্রের দেবরক্ষিত জীবন বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন করিতেই সংসারে উপস্থিত হইয়াছিল, অতএব ঐরূপ হইবে কেন? দেবকৃপায় তিনি যাঁহার আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন সেই সদ্‌গুরুই তাঁহাকে বারম্বার বলিয়াছিলেন, "মানবের সকরুণ প্রার্থনা ঈশ্বর সর্ব্বদা শ্রবণ করিয়া থাকেন এবং তোমাতে আমাতে যেভাবে বসিয়া কথোপকথন করিতেছি ইহা অপেক্ষাও স্পষ্টতরভাবে তাঁহাকে দেখিতে, তাঁহার বাণী শ্রবণ করিতে ও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারা যায়, একথা আমি শপথ করিয়া বলিতে প্রস্তুত আছি!" —আবার বলিয়াছিলেন, "সাধারণ-প্রসিদ্ধ ঈশ্বরের যাবতীয় রূপ এবং ভাবকে মানব-কল্পনা-প্রসূত বলিয়া যদি না মানিতে পার, অথচ জগতের নিয়ামক ঈশ্বর একজন আছেন এ কথায় বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে—'হে ঈশ্বর, তুমি কেমন তাহা জানি না; তুমি যেমন, তেমনি ভাবে আমাকে দেখা দাও'—এইরূপ কাতর প্রার্থনা করিলেও তিনি উহা শ্রবণপূর্ব্বক কৃপা করিবেন নিশ্চয়!" ঠাকুরের এই সকল কথা নরেন্দ্রনাথকে অশেষ আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক সাধনায় অধিকতর নিবিষ্ট করিয়াছিল, একথা বলা বাহুল্য।

নরেন্দ্রের সাধনা

পাশ্চাত্য দার্শনিক হ্যামিল্‌টন্ তৎকৃত দর্শনগ্রন্থের সমাপ্তিকালে বলিয়াছেন, 'জগতের নিয়ামক ঈশ্বর আছেন এই সত্যের আভাস মাত্র দিয়া মানব-বুদ্ধি নিরস্ত হয়; ঈশ্বর কিংস্বরূপ এ বিষয় প্রকাশ করিতে তাহার সামর্থ্যে কুলায় না; সুতরাং দর্শনশাস্ত্রের ঐখানেই ইতি—এবং যেখানে দর্শনের ইতি সেখানেই আধ্যাত্মিকতার আরম্ভ।' হ্যামিল্‌টনের ঐ কথা নরেন্দ্রনাথের বিশেষ রুচিকর ছিল এবং কথাপ্রসঙ্গে উহা তিনি সময়ে সময়ে

আমাদের নিকটে উল্লেখ করিতেন। যাহা হউক, সাধনায় মনোনিবেশ করিলেও নরেন্দ্র দর্শনাদি গ্রন্থপাঠ ছাড়িয়া দেন নাই। ফলতঃ গ্রন্থপাঠ, ধ্যান ও সঙ্গীতেই তিনি এই সময়ে অনেককাল অতিবাহিত করিতেন।

নূতন প্রণালী অবলম্বনে সারারাত্র ধ্যান

ধ্যানাভ্যাসের এক নূতন পথ তিনি এখন হইতে অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, সাকার বা নিরাকার যেরূপেই ঈশ্বরকে ভাবি না কেন, মানবীয় ধর্ম্মভূষিত করিয়া তাঁহাকে ভাবা[১] ভিন্ন আমাদিগের গত্যন্তর নাই। ঐ কথা হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্ব্বে নরেন্দ্রনাথ ধ্যান করিবার কালে ব্রাহ্মসমাজোক্ত পদ্ধতিতে নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের চিন্তাতে মনকে নিযুক্ত রাখিতেন। ঈশ্বরীয় স্বরূপের ঐরূপ ধারণা পর্য্যন্ত মানবীয় কল্পনাদুষ্ট স্থির করিয়া তিনি এখন ধ্যানের উক্ত অবলম্বনকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং 'হে ঈশ্বর, তুমি তোমার সত্যস্বরূপ দর্শনের আমাকে অধিকারী কর'—এই মর্ম্মে প্রার্থনা পুরঃসর মন হইতে সর্ব্বপ্রকার চিন্তা দূরীভূত করিয়া নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় উহাকে নিশ্চল রাখিয়া অবস্থান করিতে অভ্যাস করিতে লাগিলেন। স্বল্পকাল ঐরূপ করিবার ফলে নরেন্দ্র-নাথের সংযত চিত্ত উহাতে এতদূর মগ্ন হইয়া যাইত যে, নিজ শরীরের এবং সময়ের জ্ঞান পর্য্যন্ত তাঁহার সময়ে সময়ে তিরোহিত হইয়া যাইত। বাটীর সকলে সুপ্ত হইবার পরে নিজ কক্ষে ধ্যানে বসিয়া তিনি ঐভাবে সমস্ত রজনী অনেক দিবস অতিবাহিত করিয়াছেন।

১ Anthropomorphic idea of God.

ঐরূপে ধ্যানের ফলে একদা এক দিব্যদর্শন নরেন্দ্রনাথের উপস্থিত হইয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিতভাবে তিনি উহা একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—

ঐরূপ ধ্যানে বুদ্ধদেব

"অবলম্বনশূন্য করিয়া মনকে স্থির রাখিবার কালে অন্তরে একটা প্রশান্ত আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইতে থাকিত। ধ্যানভঙ্গের পরেও উহার প্রভাবে একটা নেশার ন্যায় ঝোঁক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অনুভব করিতাম। তজ্জন্য সহসা আসন ছাড়িয়া উঠিতে প্রবৃত্তি হইত না। ধ্যানাবসানে একদিন ঐভাবে বসিয়া থাকিবার কালে দেখিতে পাইলাম, দিব্য জ্যোতিতে গৃহ পূর্ণ করিয়া এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসিমূর্ত্তি কোথা হইতে সহসা আগমনপূর্ব্বক আমার সম্মুখে কিছু দূরে দণ্ডায়মান হইলেন! তাঁহার অঙ্গে গৈরিক বসন, হস্তে কমণ্ডলু এবং মুখমণ্ডলে এমন স্থির প্রশান্ত ও সর্ব্ববিষয়ে উদাসীনতাপ্রসূত একটা অন্তর্মুখী ভাব যে, উহা আমাকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়া স্তম্ভিত করিয়া রাখিল। যেন কিছু বলিবার অভিপ্রায়ে আমার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া তিনি ধীর পদক্ষেপে আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। উহাতে ভয়ে সহসা এমন অভিভূত হইয়া পড়িলাম যে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া আসন ত্যাগপূর্ব্বক দ্বার অর্গলমুক্ত করিলাম এবং দ্রুতপদে গৃহের বাহিরে চলিয়া আসিলাম। পরক্ষণেই মনে হইল, এত ভয় কিসের জন্য? সাহসে নির্ভর করিয়া সন্ন্যাসীর কথা শুনিবার জন্য পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না! তখন বিষণ্নমনে ভাবিতে লাগিলাম, তাঁহার কথা না শুনিয়া পলায়ন

করিবার দুবু দ্ধি আমার কেন আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী অনেক দেখিয়াছি কিন্তু অমন অপূর্ব্ব মুখের ভাব কাহারও কখনও নয়নগোচর করি নাই। সে মুখখানি চিরকালের নিমিত্ত আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। হইতে পারে ভ্রম, কিন্তু অনেক সময়ে মনে হয় বুদ্ধদেবের দর্শনলাভে আমি সেই দিন ধন্য হইয়াছিলাম!"

অষ্টম অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

সংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা

ঐরূপে নির্জ্জনবাস, অধ্যয়ন, তপস্যা ও দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন-পূর্ব্বক নরেন্দ্রের সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। ভবিষ্যৎ কল্যাণ চিন্তাপূর্ব্বক তাঁহার পিতা তাঁহাকে এই সময়ে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ এটর্নি নিমাইচরণ বসুর অধীনে এটর্নির ব্যবসায় শিখিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। পুত্রকে সংসারী করিবার আশায় শ্রীযুত বিশ্বনাথ উপযুক্ত পাত্রীর অন্বেষণেও এই সময়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহ করায় নরেন্দ্রের বিষম আপত্তি থাকায় এবং মনোমত পাত্রীর সন্ধান না পাওয়ায় তাঁহার ঐ আশা সফল হইতে বিলম্ব হইতে লাগিল।

এটর্নির কর্ম্ম শিক্ষা

রামতনু বসুর লেনস্থ নরেন্দ্রের পাঠগৃহে ঠাকুর কখন কখন সহসা আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং সাধন ভজন সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিতেন। পিতামাতার সকরুণ অনুরোধে পাছে নরেন্দ্র উদ্বাহ-বন্ধনে নিজ জীবন চিরকালের মত আবদ্ধ ও সঙ্কুচিত করিয়া বসেন এজন্য ঐ সময়ে তিনি তাঁহাকে সতর্ক করিয়া ব্রহ্মচর্য্য-পালনে সতত উৎসাহিত করিতেন। বলিতেন, "বার বৎসর অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য-পালনের ফলে মানবের মেধানাড়ি খুলিয়া যায়, তখন তাহার বুদ্ধি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সকলে প্রবেশ ও উহাদিগের ধারণা করিতে সমর্থ হয়; ঐরূপ বুদ্ধিসহায়েই ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ

অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য-পালনে ঠাকুরের নরেন্দ্রকে [illegible]দেশ

প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়; তিনি কেবলমাত্র ঐরূপ শুদ্ধবুদ্ধির গোচর।”

ঠাকুরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ফলেই নরেন্দ্র বিবাহ করিতে চাহে না—এইরূপ একটা ধারণা বাটীর স্ত্রীলোকদিগের ভিতর এই সময়ে উপস্থিত হইয়াছিল। নরেন্দ্র বলিতেন, “পাঠগৃহে উপস্থিত হইয়া ঠাকুর যখন একদিন পূর্ব্বোক্তভাবে ব্রহ্মচর্য্য-পালনে আমাকে উপদেশ দিতেছিলেন, তখন আমার মাতামহী আড়াল হইতে সকল কথা শ্রবণপূর্ব্বক পিতামাতার নিকটে বলিয়া দিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীর সহিত মিলিত হইয়া পাছে আমি সন্ন্যাসী হইয়া যাই—এই ভয়ে তাঁহারা ঐদিন হইতে আমার বিবাহ দিবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু করিলে কি হইবে, ঠাকুরের প্রবল ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাদিগের সকল চেষ্টা ভাসিয়া গিয়াছিল। সকল বিষয় স্থির হইবার পরেও কয়েকস্থলে সামান্য কথায় উভয় পক্ষের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়া বিবাহ-সম্বন্ধ সহসা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।”

নরেন্দ্রের বাটীর সকলের ভয়—সন্ন্যাসীর সহিত মিলিত হইয়া সন্ন্যাসী হইবে

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে গমনাগমন করাটা বাটীর সকলের রুচিকর না হইলেও নরেন্দ্রনাথকে ঐবিষয়ে কেহ কোন কথা বলিতে কখনও সাহস করেন নাই। কারণ জনক-জননীর পরম আদরের পুত্র নরেন্দ্র বাল্যকাল হইতে কখনও কাহারও নিষেধ মানিয়া চলিতেন না এবং যৌবনে পদার্পণ করিয়া অবধি আহার-বিহারাদি সকল বিষয়ে অসীম স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং বালক বা তরলমতি

ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রের পূর্ব্বের ন্যায় যাতায়াত

যুবককে আমরা যে ভাবে নিষেধ করিয়া থাকি, প্রখরবুদ্ধি নরেন্দ্রকে এখন সেই ভাবে কোন বিষয় নিষেধ করিলে ফল বিপরীত হইবার সম্ভাবনা, একথা তাঁহাদিগের সকলের জানা ছিল। সেজন্য পূর্ব্বের ন্যায় সমভাবেই নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সকাশে যাতায়াত করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের পুণ্যসঙ্গে শ্রীযুত নরেন্দ্র এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে যে সকল দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সেই সকলের মধুময় স্মৃতি তাঁহার অন্তর আজীবন অসীম উল্লাসে পূর্ণ করিয়া রাখিত। তিনি বলিতেন, "ঠাকুরের নিকটে কি আনন্দে দিন কাটিত, তাহা অপরকে বুঝান দুষ্কর। খেলা, রঙ্গরস প্রভৃতি সামান্য দৈনন্দিন ব্যাপারসকলের মধ্য দিয়া তিনি কি ভাবে নিরন্তর উচ্চশিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক আমাদিগের অজ্ঞাতসারে আমাদিগের আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা এখন ভাবিয়া বিস্ময়ের অবধি থাকে না। বালককে শিখাইবার কালে শক্তিশালী মল্ল যেরূপে আপনাকে সংযত রাখিয়া তদনুরূপ শক্তিমাত্র প্রকাশপূর্ব্বক কখন তাহাকে যেন অশেষ আয়াসে পরাভূত করিয়া এবং কখন বা তাহার নিকটে স্বয়ং পরাভূত হইয়া তাহার মনে আত্মপ্রত্যয় জন্মাইয়া দেয়, আমাদিগের সহিত ব্যবহারে ঠাকুর এইকালে অনেক সময়ে সেইরূপ ভাব অবলম্বন করিতেন। তিনি বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর বর্ত্তমানতা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেন; আমাদিগের প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতার বীজ ফুল-ফলায়িত হইয়া কালে যে আকার ধারণ করিবে, তাহা তখন হইতে ভাবমুখে প্রত্যক্ষ

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে যে ভাবে দিন কাটিত তদ্বিষয়ে নরেন্দ্রের কথা

করিয়া আমাদিগকে প্রশংসা করিতেন, উৎসাহিত করিতেন, এবং বাসনাবিশেষে আবদ্ধ হইয়া পাছে আমরা জীবনের ঐরূপ সফলতা হারাইয়া বসি, তজ্জন্য বিশেষ সতর্কতার সহিত আমাদিগের প্রতি আচরণ লক্ষ্য করিয়া উপদেশ প্রদানে আমাদিগকে সংযত রাখিতেন। কিন্তু তিনি যে ঐরূপে তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্যপূর্ব্বক আমাদিগকে নিত্য নিয়মিত করিতেছেন, একথা আমরা কিছুমাত্র জানিতে পারিতাম না। উহাই ছিল তাঁহার শিক্ষাপ্রদান এব জীবনগঠন করিয়া দিবার অপূর্ব্ব কৌশল। ধ্যান-ধারণাকালে কিছুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া মন অধিকতর একাগ্র হইবার অবলম্বন পাইতেছে না অনুভব করিয়া তাঁহাকে কি কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ঐরূপ স্থলে স্বয়ং কিরূপ করিয়াছিলেন তাহা আমাদিগকে জানাইয়া ঐ বিষয়ে নানা কৌশল বলিয়া দিতেন। আমার স্মরণ হয়, শেষ রাত্রিতে ধ্যান করিতে বসিয়া আলমবাজারে অবস্থিত চটের কলের বাঁশীর শব্দে মন লক্ষ্যভ্রষ্ট ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত। তাঁহাকে ঐ কথা বলায় তিনি ঐ বাঁশীর শব্দেতেই মন একাগ্র করিতে বলিয়াছিলেন এবং ঐরূপ করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছিলাম। আর এক সময়ে ধ্যান করিবার কালে শরীর ভুলিয়া মনকে লক্ষ্যে সমাহিত করিবার পথে বিশেষ বাধা অনুভব করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি বেদান্তোক্ত সমাধিসাধনকালে শ্রীমৎ তোতাপুরীর দ্বারা ভ্রূমধ্যে মন একাগ্র করিতে যে ভাবে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই কথার উল্লেখ পুরঃসর নিজ নখাগ্র দ্বারা আমার ভ্রূমধ্যে তীব্র আঘাত করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ঐ বেদনার উপর মনকে একাগ্র কর।' ফলে দেখিয়াছিলাম, ঐরূপে ঐ

আঘাতজনিত বেদনার অনুভবটা যতক্ষণ ইচ্ছা সমভাবে মনে ধারণ করিয়া রাখিতে পারা যায় এবং ঐকালে শরীরের অপর কোন অংশে মন বিক্ষিপ্ত হওয়া দূরে থাকুক ঐ অংশ-সকলের অস্তিত্বের কথা এককালে ভুলিয়া যাওয়া যায়। ঠাকুরের সাধনার স্থল, নির্জ্জন পঞ্চবটীতলই আমাদিগের ধ্যান-ধারণা করিবার বিশেষ উপযোগী স্থান ছিল। শুদ্ধ ধ্যান-ধারণা কেন, ক্রীড়াকৌতুকেও আমরা অনেক সময় ঐস্থানে অতিবাহিত করিতাম। ঐ সকল সময়েও ঠাকুর আমাদিগের সহিত যথাসম্ভব যোগদান করিয়া আমাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিতেন। আমরা তথায় দৌড়াদৌড়ি করিতাম, গাছে চড়িতাম, দৃঢ় রজ্জুর ন্যায় লম্বমান মাধবীলতার আবেষ্টনে বসিয়া দোল খাইতাম, এবং কখন কখন আপনারা রন্ধনাদি করিয়া ঐস্থলে চড়ুইভাতি করিতাম। চড়ুইভাতির প্রথম দিনে আমি স্বহস্তে পাক করিয়াছি দেখিয়া ঠাকুর স্বয়ং ঐ অন্নব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণেতর বর্ণের হস্তপক্ক অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন না জানিয়া আমি তাঁহার নিমিত্ত ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদী অন্নের বন্দোবস্ত করিতেছিলাম। কিন্তু তিনি ঐরূপ করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তোর মত শুদ্ধসত্ত্বগুণীর হাতে ভাত খেলে কোন দোষ হবে না।' আমি উহা দিতে বারংবার আপত্তি করিলেও তিনি আমার কথা না শুনিয়া আমার হস্তপক্ক অন্ন সেদিন গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

শ্রীযুত ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক একজন প্রিয়দর্শন ভক্তিমান্ যুবক ইতিমধ্যে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে আগমনপূর্ব্বক নরেন্দ্র-নাথের সহিত পরিচিত ও বিশেষ সৌহার্দ্দ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল।

বিনয়, নম্রতা, সরলতা ও বিশ্বাস-ভক্তির জন্য ভবনাথ ঠাকুরের বিশেষ প্রিয় হইয়াছিল। তাহার রমণীর ন্যায় কোমল স্বভাব এবং নরেন্দ্রনাথের সহিত অসাধারণ ভালবাসা দেখিয়া ঠাকুর কখন কখন রহস্য করিয়া বলিতেন, "জন্মান্তরে তুই নরেন্দ্রের জীবনসঙ্গিনী ছিলি বোধ হয়।" ভবনাথ বরাহনগরে থাকিত এবং সুবিধা পাইলেই নরেন্দ্রনাথকে নিজবাটীতে আনয়ন করিয়া আহারাদি করাইত। তাহার প্রতিবেশী সাতকড়ি লাহিড়ি নরেন্দ্রের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত এবং দাশরথি সান্ন্যাল তাঁহার সমপাঠী বন্ধু ছিলেন। ইঁহারাও নরেন্দ্রকে পাইলে দিবারাত্র তাঁহার সহিত অতিবাহিত করিতেন। ঐরূপে দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমনকালে এবং কখন কখন বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া নরেন্দ্রনাথ বরাহনগরের এই সকল বন্ধুবর্গের সহিত মধ্যে মধ্যে কয়েক ঘণ্টা কাল অথবা দুই-এক দিবস অতিবাহিত করিতেন।

ভবনাথ ও নরেন্দ্রের বরাহনগরের বন্ধুগণ

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে বি.এ. পরীক্ষার ফলাফল জানিতে পারিবার কিছু পূর্ব্বে ঘটনাচক্রে নরেন্দ্রনাথের জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হইল। অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁহার পিতা বিশ্বনাথের শরীর ইতিপূর্ব্বে অবসন্ন হইয়াছিল; এখন সহসা একদিবস রাত্রি আন্দাজ দশটার সময় তিনি হৃদ্‌রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। নরেন্দ্র সেই দিবস নিমন্ত্রিত হইয়া অপরাহ্ণে তাঁহার বরাহনগরের বন্ধুবর্গের নিকটে গমন করিয়াছিলেন এবং রাত্রি প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত ভজনাদিতে অতিবাহিত করিয়া

পিতার সহসা মৃত্যুর কথা নরেন্দ্রের বরাহনগরে শুনা

আহারান্তে তাঁহাদিগের সহিত এক ঘরে শয়নপূর্ব্বক নানাবিধ আলাপে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার বন্ধু 'হেমালী' রাত্রি প্রায় দুইটার সময় ঐস্থলে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে ঐ নিদারুণ বার্ত্তা শ্রবণ করাইলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় ফিরিলেন।

বাটীতে ফিরিয়া নরেন্দ্রনাথ পিতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন, পরে অনুসন্ধানে বুঝিতে পারিলেন তাঁহাদিগের সাংসারিক অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পিতা কিছু রাখিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, আয়ের অপেক্ষা নিত্য অধিক ব্যয় করিয়া কিছু ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন; আত্মীয়বর্গেরা তাঁহার পিতার সহায়তায় নিজ নিজ অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া লইয়া এখন সময় বুঝিয়া শত্রুতাসাধনে এবং বসতবাটী হইতে পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের উচ্ছেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে; সংসারে আয় একপ্রকার নাই বলিলেই হয়, অথচ পাঁচ-সাতটি প্রাণীর ভরণপোষণাদি নিত্য নির্ব্বাহ হওয়া আবশ্যক। চিরসুখপালিত নরেন্দ্রনাথ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া নানা স্থানে চাকরীর অন্বেষণে ফিরিতে লাগিলেন। কিন্তু সময় যখন মন্দ পড়ে মানবের শত চেষ্টাতেও তখন কিছুমাত্র ফলোদয় হয় না। নরেন্দ্র সর্ব্বত্র বিফলমনোরথ হইতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রের সাংসারিক অবস্থার শোচনীয় পরিবর্ত্তন

পিতার মৃত্যুর পরে এক দুই করিয়া তিন-চারি মাস গত হইল, কিন্তু দুঃখ দুর্দ্দিনের অবসান হওয়া দূরে থাকুক আশার রক্তিম ছটায় নরেন্দ্রনাথের জীবনাকাশ ঈষন্মাত্রও রঞ্জিত হইল না। বাস্তবিক, এমন নিবিড় অন্ধকারে তাঁহার জীবন আর কখনও আচ্ছন্ন হইয়াছিল

কিনা সন্দেহ। এই কালের আলোচনা করিয়া তিনি কখন কখন আমাদিগকে বলিয়াছেন—

"মৃতাশৌচের অবসান হইবার পূর্ব্ব হইতেই কর্ম্মের চেষ্টায় ফিরিতে হইয়াছিল। অনাহারে নগ্নপদে চাকরির আবেদন হস্তে লইয়া মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে আফিস হইতে আফিসান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম—অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের কেহ কেহ দুঃখের দুঃখী হইয়া কোন দিন সঙ্গে থাকিত, কোন দিন থাকিতে পারিত না, কিন্তু সর্ব্বত্রই বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। সংসারের সহিত এই প্রথম পরিচয়েই বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল, স্বার্থশূন্য সহানুভূতি এখানে অতীব বিরল—দুর্ব্বলের, দরিদ্রের এখানে স্থান নাই। দেখিতাম, দুই দিন পূর্ব্বে যাহারা আমাকে কোন বিষয়ে কিছুমাত্র সহায়তা করিবার অবসর পাইলে আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছে, সময় বুঝিয়া তাহারাই এখন আমাকে দেখিয়া মুখ বাঁকাইতেছে এবং ক্ষমতা থাকিলেও সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছে। দেখিয়া শুনিয়া কখন কখন সংসারটা দানবের রচনা বলিয়া মনে হইত। মনে হয়, এই সময়ে একদিন রৌদ্রে ঘুরিতে ঘুরিতে পায়ের তলায় ফোস্কা হইয়াছিল এবং নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের ছায়ায় বসিয়া পড়িয়াছিলাম। দুই-এক জন বন্ধু সেদিন সঙ্গে ছিল, অথবা ঘটনাক্রমে ঐ স্থানে আমার সহিত মিলিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একজন বোধ হয় আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য গাহিয়াছিল—

'বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিঃশ্বাস পবনে' ইত্যাদি।

ঐ অবস্থা সম্বন্ধে নরেন্দ্রের কথা—চাকরির অন্বেষণ, পরিচিত ধনী ব্যক্তিদিগের অবজ্ঞা

শুনিয়া মনে হইয়াছিল মাথায় যেন সে গুরুতর আঘাত করিতেছে। মাতা ও ভ্রাতাগণের নিতান্ত অসহায় অবস্থার কথা মনে উদয় হইয়া ক্ষোভে, নিরাশায়, অভিমানে বলিয়া উঠিয়াছিলাম, 'নে, নে, চুপ কর, ক্ষুধার তাড়নায় যাহাদিগের আত্মীয়বর্গকে কষ্ট পাইতে হয় না, গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব যাহাদিগকে কখন সহ্য করিতে হয় নাই, টানাপাখার হাওয়া খাইতে খাইতে তাহাদিগের নিকটে ঐরূপ কল্পনা মধুর লাগিতে পারে, আমারও একদিন লাগিত; কঠোর সত্যের সম্মুখে উহা এখন বিষম ব্যঙ্গ বলিয়া বোধ হইতেছে।'

"আমার ঐরূপ কথায় উক্ত বন্ধু বোধ হয় নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল—দারিদ্র্যের কিরূপ কঠোর পেষণে মুখ হইতে ঐ কথা নির্গত হইয়াছিল তাহা সে বুঝিবে কেমনে! প্রাতঃকালে উঠিয়া গোপনে অনুসন্ধান করিয়া যেদিন বুঝিতাম গৃহে সকলের প্রচুর আহার্য্য নাই এবং হাতে পয়সা নাই, সেদিন মাতাকে 'আমার নিমন্ত্রণ আছে' বলিয়া বাহির হইতাম এবং কোন দিন সামান্য কিছু খাইয়া, কোন দিন অনশনে কাটাইয়া দিতাম। অভিমানে, ঘরে বাহিরে কাহারও নিকটে ঐ কথা প্রকাশ করিতেও পারিতাম না। ধনী বন্ধুগণের অনেকে পূর্ব্বের ন্যায় আমাকে তাহাদিগের গৃহে বা উদ্যানে লইয়া যাইয়া সঙ্গীতাদি দ্বারা তাহাদিগের আনন্দবর্দ্ধনে অনুরোধ করিত। এড়াইতে না পারিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের সহিত গমনপূর্ব্বক তাহাদিগের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইতাম, কিন্তু অন্তরের কথা তাহাদিগের নিকটে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হইত না—তাহারাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঐ বিষয় জানিতে কখনও সচেষ্ট হয় নাই। তাহাদিগের মধ্যে বিরল দুই-এক জন

দারিদ্র্যের পেষণ

কখন কখন বলিত, 'তোকে আজ এত বিষণ্ণ ও দুর্ব্বল দেখিতেছি কেন, বল্ দেখি ?' একজন কেবল আমার অজ্ঞাতে অন্যের নিকট হইতে আমার অবস্থা জানিয়া লইয়া বেনামী পত্রমধ্যে মাতাকে সময়ে সময়ে টাকা পাঠাইয়া আমাকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়াছিল।

"যৌবনে পদার্পণপূর্ব্বক যে-সকল বাল্যবন্ধু চরিত্রহীন হইয়া অসদুপায়ে যৎসামান্য উপার্জ্জন করিতেছিল, তাহাদিগের কেহ কেহ আমার দারিদ্র্যের কথা জানিতে পারিয়া সময় বুঝিয়া দলে টানিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা ইতিপূর্ব্বে আমার ন্যায় অবস্থার পরিবর্ত্তনে সহসা পতিত হইয়া একরূপ বাধ্য হইয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য হীন পথ অবলম্বন করিয়াছিল, দেখিতাম তাহারা সত্যসত্যই আমার জন্য ব্যথিত হইয়াছে। সময় বুঝিয়া অবিদ্যারূপিণী মহামায়াও এই কালে পশ্চাতে লাগিতে ছাড়েন নাই। এক সঙ্গতিপন্না রমণীর পূর্ব্ব হইতে আমার উপর নজর পড়িয়াছিল। অবসর বুঝিয়া সে এখন প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল, তাহার সহিত তাহার সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া দারিদ্র্যদুঃখের অবসান করিতে পারি! বিষম অবজ্ঞা ও কঠোরতা প্রদর্শনে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে হইয়াছিল। অন্য এক রমণী ঐরূপ প্রলোভিত করিতে আসিলে তাহাকে বলিয়াছিলাম, 'বাছা, এই ছাই-ভস্ম শরীরটার তৃপ্তির জন্য এতদিন কত কি ত করিলে, মৃত্যু সম্মুখে—তখনকার সম্বল কিছু করিয়াছ কি ? হীন বুদ্ধি ছাড়িয়া ভগবানকে ডাক।'

রমণীর প্রলোভন

"যাহা হউক, এত দুঃখ কষ্টেও এতদিন আস্তিক্যবুদ্ধির বিলোপ অথবা 'ঈশ্বর মঙ্গলময়'—একথায় সন্দিহান হই নাই। প্রাতে

নিদ্রাভঙ্গে তাঁহাকে স্মরণ-মননপূর্ব্বক তাঁহার নাম করিতে করিতে শয্যা ত্যাগ করিতাম এবং আশায় বুক বাঁধিয়া উপার্জ্জনের উপায় অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। একদিন ঐরূপে শয্যা ত্যাগ করিতেছি এমন সময়ে পার্শ্বের ঘর হইতে মাতা শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'চুপ কর্ ছোঁড়া, ছেলেবেলা থেকে কেবল ভগবান্ ভগবান্—ভগবান্ ত সব কল্লেন!' কথাগুলিতে মনে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইলাম। স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, ভগবান্ কি বাস্তবিক আছেন, এবং থাকিলেও মানবের সকরুণ প্রার্থনা কি শুনিয়া থাকেন? তবে এত যে প্রার্থনা করি তাহার কোনরূপ উত্তর নাই কেন? শিবের সংসারে এত অ-শিব কোথা হইতে আসিল—মঙ্গলময়ের রাজত্বে এতপ্রকার অমঙ্গল কেন? বিদ্যাসাগর মহাশয় পরদুঃখে কাতর হইয়া এক সময় যাহা বলিয়াছিলেন—ভগবান্ যদি দয়াময় ও মঙ্গলময়, তবে দুর্ভিক্ষের করাল কবলে পতিত হইয়া লাখ লাখ লোক দুটি অন্ন না পাইয়া মরে কেন?—তাহা, কঠোর ব্যঙ্গস্বরে কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঈশ্বরের প্রতি প্রচণ্ড অভিমানে হৃদয় পূর্ণ হইল, অবসর বুঝিয়া সন্দেহ আসিয়া অন্তর অধিকার করিল।

ঈশ্বরের নাম লওয়ায় মাতার তিরস্কার

"গোপনে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। বাল্যকাল হইতে কখন ঐরূপ করা দূরে থাকুক, অন্তরের চিন্তাটি পর্য্যন্ত ভয়ে বা অন্য কোন কারণে কাহারও নিকটে কখনও লুকাইবার অভ্যাস করি নাই। সুতরাং ঈশ্বর নাই, অথবা যদি থাকেন ত তাঁহাকে ডাকিবার কোন সফলতা এবং প্রয়োজন নাই,

একথা হাঁকিয়া-ডাকিয়া লোকের নিকটে সপ্রমাণ করিতে এখন অগ্রসর হইব, ইহাতে বিচিত্র কি ? ফলে স্বল্প দিনেই রব উঠিল, আমি নাস্তিক হইয়াছি এবং দুশ্চরিত্র লোকের সহিত মিলিত হইয়া মদ্যপানে ও বেশ্যালয়ে পর্য্যন্ত গমনে কুণ্ঠিত নহি ! সঙ্গে সঙ্গে আমারও আবাল্য অনাশ্রব হৃদয় অযথা নিন্দায় কঠিন হইয়া উঠিল এবং কেহ জিজ্ঞাসা না করিলেও সকলের নিকটে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, এই দুঃখ-কষ্টের সংসারে নিজ দুরদৃষ্টের কথা কিছুক্ষণ ভুলিয়া থাকিবার জন্য যদি কেহ মদ্যপান করে, অথবা বেশ্যাগৃহে গমন করিয়া আপনাকে সুখী জ্ঞান করে, তাহাতে আমার যে কিছুমাত্র আপত্তি নাই তাহাই নহে, কিন্তু ঐরূপ করিয়া আমিও তাহাদিগের ন্যায় ক্ষণিক সুখভাগী হইতে পারি—একথা যেদিন নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিব সেদিন আমিও ঐরূপ করিব, কাহারও ভয়ে পশ্চাৎপদ হইব না।

অভিমানে নাস্তিক্য বুদ্ধি

"কথা কানে হাঁটে। আমার ঐসকল কথা নানারূপে বিকৃত হইয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে এবং তাহার কলিকাতাস্থ ভক্তগণের কাছে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। কেহ কেহ আমার স্বরূপ অবস্থা নির্ণয় করিতে দেখা করিতে আসিলেন এবং যাহা রটিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ না হইলেও কতকটা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত, ইঙ্গিতে ইসারায় জানাইলেন। আমাকে তাঁহারা এতদূর হীন ভাবিতে পারেন জানিয়া আমিও দারুণ অভিমানে স্ফীত হইয়া দণ্ড পাইবার ভয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা বিষম দুর্ব্বলতা, একথা প্রতিপন্নপূর্ব্বক হিউম্, বেন্, মিল, কোঁতে প্রভৃতি পাশ্চাত্য

নরেন্দ্রের অধঃপতনে ভক্তগণের বিশ্বাস হইলেও ঠাকুরের অন্যরূপ ধারণা।

দার্শনিক সকলের মতামত উদ্ধৃত করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই বলিয়া তাঁহাদিগের সহিত প্রচণ্ড তর্ক জুড়িয়া দিলাম। ফলে বুঝিতে পারিলাম আমার অধঃপতন হইয়াছে, এ কথায় বিশ্বাস দৃঢ়তর করিয়া তাঁহারা বিদায়গ্রহণ করিলেন বুঝিয়া আনন্দিত হইলাম এবং ভাবিলাম ঠাকুরও হয়ত ইহাদের মুখে শুনিয়া এরূপ বিশ্বাস করিবেন। ঐরূপ ভাবিবামাত্র আবার নিদারুণ অভিমানে অন্তর পূর্ণ হইল। স্থির করিলাম, তা করুন—মানুষের ভালমন্দ মতামতের যখন এতই অল্প মূল্য, তখন তাহাতে আসে যায় কি? পরে শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম, ঠাকুর তাঁহাদিগের মুখে ঐকথা শুনিয়া প্রথমে হাঁ, না কিছুই বলেন নাই; পরে ভবনাথ রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে ঐকথা জানাইয়া যখন বলিয়াছিল, 'মহাশয়, নরেন্দ্রের এমন হইবে একথা স্বপ্নেরও অগোচর!'—তখন বিষম উত্তেজিত হইয়া তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'চুপ্ কর্ শালারা, মা বলিয়াছেন সে কখনও ঐরূপ হইতে পারে না; আর কখন আমাকে ঐসব কথা বলিলে তোদের মুখ দেখিতে পারিব না!'

"ঐরূপে অহঙ্কারে অভিমানে নাস্তিকতার পোষণ করিলে হইবে কি? পরক্ষণেই বাল্যকাল হইতে, বিশেষতঃ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের পরে, জীবনে যে-সকল অদ্ভুত অনুভূতি উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সকলের কথা উজ্জ্বল বর্ণে মনে উদয় হওয়ায় ভাবিতে থাকিতাম—

ঘোর অশান্তি

ঈশ্বর নিশ্চয় আছেন এবং তাঁহাকে লাভ করিবার পথও নিশ্চয় আছে, নতুবা এই সংসারে প্রাণধারণের কোনই আবশ্যকতা নাই; দুঃখকষ্ট জীবনে যতই আসুক না কেন, সেই পথ খুঁজিয়া বাহির

করিতে হইবে। ঐরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং সংশয়ে চিত্ত নিরন্তর দোলায়মান হইয়া শান্তি সুদূরপরাহত হইয়া রহিল—সাংসারিক অভাবেরও হ্রাস হইল না।

"গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসিল। এখনও পূর্ব্বের ন্যায় কর্ম্মের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। একদিন সমস্ত দিবস উপবাসে ও বৃষ্টিতে ভিজিয়া রাত্রে অবসন্ন পদে এবং ততোধিক অবসন্ন মনে বাটীতে ফিরিতেছি, এমন সময়ে শরীরে এত ক্লান্তি অনুভব করিলাম যে, আর এক পদও অগ্রসর হইতে না পারিয়া পার্শ্বস্থ বাটীর রকে জড় পদার্থের ন্যায় পড়িয়া রহিলাম। কিছুক্ষণের জন্য চেতনার লোপ হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না। এটা কিন্তু স্মরণ আছে, মনে নানা বর্ণের চিন্তা ও ছবি তখন আপনা হইতে পর পর উদয় ও লয় হইতেছিল এবং উহাদিগকে তাড়াইয়া কোন এক চিন্তাবিশেষে মনকে আবদ্ধ রাখিব এরূপ সামর্থ্য ছিল না। সহসা উপলব্ধি করিলাম, কোন এক দৈবশক্তিপ্রভাবে একের পর অন্য এইরূপে ভিতরের অনেকগুলি পর্দ্দা যেন উত্তোলিত হইল এবং শিবের সংসারে অ-শিব কেন, ঈশ্বরের কঠোর ন্যায়পরতা ও অপার করুণার সামঞ্জস্য প্রভৃতি যে-সকল বিষয় নির্ণয় করিতে না পারিয়া মন এতদিন নানা সন্দেহে আকুল হইয়াছিল, সেই সকল বিষয়ের স্থির মীমাংসা অন্তরের নিবিড়তম প্রদেশে দেখিতে পাইলাম। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। অনন্তর বাটী ফিরিবার কালে দেখিলাম, শরীরে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নাই, মন অমিত বল ও শান্তিতে পূর্ণ এবং রজনী অবসান হইবার স্বল্পই বিলম্ব আছে।

অদ্ভুত দর্শনে নরেন্দ্রের শান্তি

"সংসারের প্রশংসা ও নিন্দায় এখন হইতে এককালে উদাসীন হইলাম এবং ইতরসাধারণের ন্যায় অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবারবর্গের সেবা ও ভোগসুখে কালযাপন করিবার জন্য আমার জন্ম হয় নাই—এ কথায় দৃঢ়বিশ্বাসী হইয়া পিতামহের ন্যায় সংসারত্যাগের জন্য গোপনে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। যাইবার দিন স্থির হইলে সংবাদ পাইলাম, ঠাকুর ঐদিন কলিকাতায় জনৈক ভক্তের বাটীতে আসিতেছেন। ভাবিলাম, ভালই হইল, গুরুদর্শন করিয়া চিরকালের মত গৃহ ত্যাগ করিব। ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি ধরিয়া বসিলেন, 'তোকে আজ আমার সহিত দক্ষিণেশ্বরে যাইতে হইবে।' নানা ওজর করিলাম, তিনি কিছুতেই ছাড়িলেন না। অগত্যা তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। গাড়ীতে তাঁহার সহিত বিশেষ কোন কথা হইল না। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া অন্য সকলের সহিত কিছুক্ষণ তাঁহার গৃহমধ্যে উপবিষ্ট রহিয়াছি এমন সময়ে ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। দেখিতে দেখিতে তিনি সহসা নিকটে আসিয়া আমাকে সস্নেহে ধারণপূর্ব্বক সজল নয়নে গাহিতে লাগিলেন—

সন্ন্যাসী হইবার সঙ্কল্প ও দক্ষিণেশ্বরে আগমনে ঠাকুরের অদ্ভুত আচরণ

কথা কহিতে ডরাই,
না কহিতেও ডরাই,
(আমার) মনে সন্দ হয়,
বুঝি তোমায় হারাই, হা—রাই !

"অন্তরের প্রবল ভাবরাশি এতক্ষণ সযত্নে রুদ্ধ রাখিয়াছিলাম, আর বেগ সম্বরণ করিতে পারিলাম না—ঠাকুরের ন্যায় আমারও

বক্ষ নয়নধারায় প্লাবিত হইতে লাগিল। নিশ্চয় বুঝিলাম, ঠাকুর সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন! আমাদিগের ঐরূপ আচরণে অন্য সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। প্রকৃতিস্থ হইবার পরে কেহ কেহ ঠাকুরকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'আমাদের ও একটা হয়ে গেল।' পরে রাত্রে অপর সকলকে সরাইয়া আমাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, 'জানি আমি, তুমি মার কাজের জন্য আসিয়াছ, সংসারে কখনই থাকিতে পারিবে না, কিন্তু আমি যতদিন আছি ততদিন আমার জন্য থাক।' —বলিয়াই ঠাকুর হৃদয়ের আবেগে রুদ্ধকণ্ঠে পুনরায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন!

ঠাকুরের অনুরোধে নিরুদ্দেশ হইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ

"ঠাকুরের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া পরদিন বাটীতে ফিরিলাম, সঙ্গে সঙ্গে সংসারের শত চিন্তা আসিয়া অন্তর অধিকার করিল। পূর্ব্বের ন্যায় নানা চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলাম। ফলে এটর্নির আফিসে পরিশ্রম করিয়া এবং কয়েকখানি পুস্তকের অনুবাদ প্রভৃতিতে সামান্য উপার্জ্জন হইয়া কোনরূপে দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল বটে, কিন্তু স্থায়ী কোনরূপ কর্ম্ম জুটিল না এবং মাতা ও ভ্রাতাদিগের ভরণপোষণের একটা সচ্ছল বন্দোবস্তও হইয়া উঠিল না। কিছুকাল পরে মনে হইল, ঠাকুরের কথা ত ঈশ্বর শুনেন—তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া মাতা ও ভ্রাতাদিগের খাওয়া পরার কষ্ট যাহাতে দূর হয় এরূপ প্রার্থনা করাইয়া লইব; আমার

দৈব সহায়তায় দারিদ্র্য মোচনের সঙ্কল্প ও ঐজন্য ঠাকুরকে জেদ করায় তাঁহার 'কালীঘরে' যাইয়া প্রার্থনা করিতে বলা

জন্য ঐরূপ করিতে তিনি কখনই অস্বীকার করিবেন না। দক্ষিণেশ্বরে ছুটিলাম এবং নাছোড়বান্দা হইয়া ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলাম, 'মা-ভাইদের আর্থিক কষ্ট নিবারণের জন্য আপনাকে মাকে জানাইতে হইবে।' ঠাকুর বলিলেন, 'ওরে, আমি যে ওসব কথা বল্‌তে পারি না। তুই জানা না কেন? মাকে মানিস্ না, সেই জন্যই তোর এত কষ্ট!' বলিলাম, আমি ত মাকে জানি না, আপনি আমার জন্য মাকে বলুন, বলতেই হবে, আমি কিছুতেই আপনাকে ছাড়ব না।' ঠাকুর সস্নেহে বলিলেন, 'ওরে, আমি যে কতবার বলেছি, মা নরেন্দ্রের দুঃখ কষ্ট দূর কর। তুই মাকে মানিস্ না, সেই জন্যই ত মা শুনে না। আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার, আমি বলছি আজ রাত্রে 'কালীঘরে' গিয়ে মাকে প্রণাম করে তুই যা চাইবি, মা তোকে তাই দিবেন। মা আমার চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তি, ইচ্ছায় জগৎ প্রসব করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারেন!'

"দৃঢ় বিশ্বাস হইল, ঠাকুর যখন ঐরূপ বলিলেন, তখন নিশ্চয় প্রার্থনামাত্র সকল দুঃখের অবসান হইবে। প্রবল উৎকণ্ঠায় রাত্রির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্রমে রাত্রি হইল। এক প্রহর গত হইবার পরে ঠাকুর আমাকে শ্রীমন্দিরে যাইতে বলিলেন। যাইতে যাইতে একটা গাঢ় নেশায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম, পা টলিতে লাগিল, এবং মাকে সত্যসত্য দেখিতে ও তাঁহার শ্রীমুখের বাণী শুনিতে পাইব, এইরূপ স্থির বিশ্বাসে মন অন্য সকল বিষয় ভুলিয়া বিষম একাগ্র ও তন্ময় হইয়া ঐ কথাই ভাবিতে লাগিল। মন্দিরে উপস্থিত হইয়া

জগদম্বার দর্শনে সংসার-বিস্মৃতি

দেখিলাম, সত্যসত্যই মা চিন্ময়ী, সত্যসত্যই জীবিতা এবং অনন্ত প্রেম ও সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণস্বরূপিণী। ভক্তি-প্রেমে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইল, বিহ্বল হইয়া বারম্বার প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলাম, 'মা বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, যাহাতে তোমার অবাধ-দর্শন নিত্য লাভ করি এইরূপ করিয়া দাও!' শান্তিতে প্রাণ আপ্লুত হইল, জগৎ সংসার নিঃশেষে অন্তর্হিত হইয়া একমাত্র মা-ই হৃদয় পূর্ণ করিয়া রহিলেন!

"ঠাকুরের নিকটে ফিরিবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, মা'র নিকটে সাংসারিক অভাব দূর করিবার প্রার্থনা করিয়াছিস্ ত?' তাঁহার প্রশ্নে চমকিত হইয়া বলিলাম, 'না মহাশয়, ভুলিয়া গিয়াছি! তাই ত, এখন কি করি?' তিনি বলিলেন, 'যা, যা, ফের যা, গিয়ে ঐকথা জানিয়ে আয়।' পুনরায় মন্দিরে চলিলাম এবং মা'র সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পুনরায় মোহিত হইয়া সকল কথা ভুলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণামপূর্ব্বক জ্ঞান ভক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করিয়া ফিরিলাম। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'কি রে, এবার বলিয়াছিস্ ত?' আবার চমকিত হইয়া বলিলাম, 'না মহাশয়, মাকে দেখিবামাত্র কি এক দৈবীশক্তি-প্রভাবে সব কথা ভুলিয়া কেবল জ্ঞান ভক্তি লাভের কথাই বলিয়াছি! কি হবে?' ঠাকুর বলিলেন, 'দূর ছোঁড়া, আপনাকে একটু সাম্‌লাইয়া ঐ প্রার্থনাটা করিতে পারিলি না? পারিস্ ত আর একবার গিয়ে ঐ কথাগুলো জানিয়ে আয়, শীঘ্র যা।' পুনরায় চলিলাম, কিন্তু মন্দিরে প্রবেশমাত্র দারুণ লজ্জা আসিয়া হৃদয়

তিন বার 'কালীঘরে' আর্থিক উন্নতি প্রার্থনা করিতে গমন ও ভিন্ন ভাবের আচরণ

অধিকার করিল। ভাবিলাম, একি তুচ্ছ কথা মাকে বলিতে আসিয়াছি! ঠাকুর যে বলেন, রাজার প্রসন্নতা লাভ করিয়া তাঁহার নিকটে 'লাউ কুমড়া ভিক্ষা করা' এ যে সেইরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা! এমন হীনবুদ্ধি আমার! লজ্জায় ঘৃণায় পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলাম, 'অন্য কিছু চাহি না মা, কেবল জ্ঞান ভক্তি দাও।' মন্দিরের বাহিরে আসিয়া মনে হইল ইহা নিশ্চয়ই ঠাকুরের খেলা, নতুবা তিন তিনবার মার নিকটে আসিয়াও বলা হইল না। অতঃপর তাঁহাকে ধরিয়া বসিলাম, আপনিই নিশ্চিত আমাকে ঐরূপে ভুলাইয়া দিয়াছেন, এখন আপনাকে বলিতে হইবে, আমার মা-ভাইদের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব থাকিবে না। তিনি বলিলেন, 'ওরে, আমি যে কাহারও জন্য ঐরূপ প্রার্থনা কখন করিতে পারি নাই, আমার মুখ দিয়া যে উহা বাহির হয় না। তোকে বল্লুম, মার কাছে যাহা চাহিবি তাহাই পাইবি; তুই চাহিতে পারিলি না, তোর অদৃষ্টে সংসারসুখ নাই, তা আমি কি করিব!' বলিলাম, 'তাহা হইবে না মহাশয়, আপনাকে আমার জন্য ঐকথা বলিতেই হইবে; আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি বলিলেই তাহাদের আর কষ্ট থাকিবে না।' ঐরূপে যখন তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িলাম না, তখন তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা যা, তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের কখন অভাব হবে না।'"

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, নরেন্দ্রনাথের জীবনে উহা যে একটি বিশেষ ঘটনা, তাহা বলিতে হইবে না। ঈশ্বরের মাতৃভাবের এবং প্রতীক ও প্রতিমায় তাঁহাকে উপাসনা করিবার গূঢ় মর্ম্ম এতদিন তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবদেবী মূর্ত্তিসকলকে

তিনি ইতিপূর্ব্বে অবজ্ঞা ভিন্ন কখন ভক্তিভরে দর্শন করিতে পারিতেন না। এখন হইতে ঐরূপ উপাসনার সম্যক্ রহস্য তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাসিত হইয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনে অধিকতর পূর্ণতা ও প্রসারতা আনয়ন করিল। ঠাকুর উহাতে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা বলিবার নহে। আমাদিগের জনৈক বন্ধু[১] ঐ ঘটনার পর দিবসে দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্ব্বক যাহা দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহা এখানে উল্লেখ করিলে পাঠক ঐ কথা বুঝিতে পারিবেন।

নরেন্দ্রের প্রতীক ও প্রতিমায় ঈশ্বরোপাসনায় বিশ্বাস ও ঠাকুরের ঐজন্য আনন্দ

"তারাপদ ঘোষ নামক এক ব্যক্তির সহিত এক আফিসে কর্ম্ম করায় ইতিপূর্ব্বে পরিচিত হইয়াছিলাম। তারাপদের সহিত নরেন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধুতা ছিল। সেজন্য আফিসে তারাপদের নিকটে নরেন্দ্রকে ইতিপূর্ব্বে কখন কখন দেখিয়াছিলাম। তারাপদ একদিন কথায় কথায় বলিয়াও ছিল, পরমহংসদেব নরেন বাবুকে বিশেষ ভালবাসেন; তথাপি আমি নরেন্দ্রের সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করি নাই। অদ্য মধ্যাহ্নে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া দেখিলাম, ঠাকুর একাকী গৃহে বসিয়া আছেন এবং নরেন্দ্র বাহিরে এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। ঠাকুরের মুখ যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া রহিয়াছে। নিকটে যাইয়া প্রণাম করিবামাত্র তিনি নরেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া বলিলেন, 'ওরে দেখ, ঐ ছেলেটি বড় ভাল, ওর নাম নরেন্দ্র, আগে মাকে মান্‌ত না, কাল মেনেছে। কষ্টে পড়েছে তাই মা-

ঠাকুরের ঐ বিষয়ক আনন্দ-সম্বন্ধে বৈকুণ্ঠনাথের কথা

১ শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল।

কাছে টাকা-কড়ি চাইবার কথা বলে দিয়াছিলাম, তা কিন্তু চাইতে পার্‌লে না, বলে, 'লজ্জা কর্‌লে!' মন্দির থেকে এসে আমাকে বল্‌লে মার গান শিখিয়ে দাও—'মা ত্বং হি তারা' গানটি[১] শিখিয়ে দিলাম। কাল সমস্ত রাত ঐ গানটা গেয়েছে! তাই এখন ঘুমুচ্ছে। (আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে) নরেন্দ্র কালী মেনেছে, বেশ হয়েছে, না?' তাঁহার ঐকথা লইয়া বালকের ন্যায় আনন্দ দেখিয়া বলিলাম, 'হাঁ, মহাশয় বেশ হইয়াছে।' কিছুক্ষণ পরে পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'নরেন্দ্র মাকে মেনেছে! বেশ হয়েছে —কেমন?' ঐরূপে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বারম্বার ঐকথা বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

"নিদ্রাভঙ্গে বেলা প্রায় ৪টার সময় নরেন্দ্র গৃহমধ্যে ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। মনে হইল এইবার তিনি তাঁহার

(আমার) মা ত্বং হি তারা।
তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।
তোরে জানি মা ও দীনদয়াময়ী,
তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা॥
তুমি জলে, তুমি স্থলে,
তুমিই আদ্যমূলে গো মা,
আছ সর্ব্বঘটে, অক্ষপুটে
সাকার আকার নিরাকারা॥
তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়ত্রী,
তুমিই জগদ্ধাত্রী গো মা,
তুমি অকুলের ত্রাণকর্ত্রী
সদাশিবের মনোহরা॥

নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিবেন। ঠাকুর কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াই ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহার গা ঘেঁসিয়া এক প্রকার তাঁহার ক্রোড়ে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, (আপনার শরীর ও নরেন্দ্রের শরীর পর পর দেখাইয়া) 'দেখছি কি এটা আমি, আবার এটাও আমি, সত্য বল্‌ছি—কিছুই তফাৎ বুঝ্‌তে পারচি না! যেমন গঙ্গার জলে একটা লাঠি ফেলায় দুটো ভাগ দেখাচ্ছে—সত্যসত্য কিন্তু ভাগাভাগি নেই, একটাই রয়েছে! বুঝ্‌তে পাচ্চ? তা মা ছাড়া আর কি আছে বল, কেমন?' ঐরূপে নানা কথা কহিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'তামাক খাব।' আমি ত্রস্ত হইয়া তামাক সাজিয়া তাঁহার হুঁকাটি তাঁহাকে দিলাম। দুই-এক টান টানিয়াই তিনি হুঁকাটি ফিরাইয়া দিয়া 'কল্কেতে খাব' বলিয়া কল্কেটি হাতে লইয়া টানিতে লাগিলেন। দুই-চারি টান টানিয়া উহা নরেন্দ্রের মুখের কাছে ধরিয়া বলিলেন, 'খা, আমার হাতেই খা।' নরেন্দ্র ঐ কথায় বিষম সঙ্কুচিত হওয়ায় বলিলেন, 'তোর ত ভারি হীন বুদ্ধি, তুই আমি কি আলাহিদা? এটাও আমি, ওটাও আমি।' ঐকথা বলিয়া নরেন্দ্রনাথকে তামাকু খাওয়াইয়া দিবার জন্য পুনরায় নিজ হাত দুইখানি তাঁহার মুখের সম্মুখে ধরিলেন। অগত্যা নরেন্দ্র ঠাকুরের হাতে মুখ লাগাইয়া দুই-তিন বার তামাক টানিয়া নিরস্ত হইলেন। ঠাকুর তাঁহাকে নিরস্ত দেখিয়া স্বয়ং পুনরায় তামাকু সেবন করিতে উদ্যত হইলেন। নরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'মহাশয়, হাতটা ধুইয়া তামাক খান।' কিন্তু সে কথা শুনে কে? 'দূর শালা, তোর ত ভারি ভেদবুদ্ধি' এই কথা বলিয়া

নরেন্দ্রকে ঠাকুরের বিশেষ আপনার জ্ঞানের পরিচায়ক দৃষ্টান্ত

ঠাকুর উচ্ছিষ্ট হস্তেই তামাক টানিতে ও ভাবাবেশে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। খাদ্যদ্রব্যের অগ্রভাগ কাহাকেও দেওয়া হইলে যে ঠাকুর উহা উচ্ছিষ্টজ্ঞানে কখন খাইতে পারিতেন না, নরেন্দ্রের উচ্ছিষ্ট সম্বন্ধে তাঁহাকে অদ্য ঐরূপ ব্যবহার করিতে দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, নরেন্দ্রনাথকে ইনি কতদূর আপনার জ্ঞান করেন।

"কথায় কথায় রাত্রি প্রায় ৮টা বাজিয়া গেল। তখন ঠাকুরের ভাবের উপশম দেখিয়া নরেন্দ্র ও আমি তাঁহার নিকটে বিদায়-গ্রহণপূর্ব্বক পদব্রজে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

নরেন্দ্রের সহিত বৈকুণ্ঠের কলিকাতায় আগমন

ইহার পরে কতদিন আমরা নরেন্দ্রনাথকে বলিতে শুনিয়াছি, 'একা ঠাকুরই কেবল আমাকে প্রথম দেখা হইতে সকল সময় সমভাবে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, আর কেহই নহে—নিজের মা-ভাইরাও নহে। তাঁহার ঐরূপ বিশ্বাস ভালবাসাই আমাকে চিরকালের মত বাঁধিয়া ফেলিয়াছে! একা তিনিই ভালবাসিতে জানিতেন ও পারিতেন—সংসারের অন্য সকলে স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভালবাসার ভান মাত্র করিয়া ফিরিয়া থাকে।' "

নবম অধ্যায়

ঠাকুরের ভক্তসঙ্ঘ ও নরেন্দ্রনাথ

ঠাকুর যোগদৃষ্টিসহায়ে যে সকল ভক্তের দক্ষিণেশ্বরে আসিবার কথা বহু পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহারা সকলেই ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ অতীত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার নিকটে আগমন করিয়াছিল। কারণ, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পূর্ণ তাঁহার নিকটে আসিয়াছিল এবং তাহাকে কৃপা করিবার পরে তিনি বলিয়াছিলেন, "এখানে আসিবে বলিয়া যাহাদিগকে দেখিয়াছিলাম, পূর্ণের আগমনে সেই শ্রেণীর ভক্তসকলের আসা সম্পূর্ণ হইল; অতঃপর ঐ শ্রেণীর আর কেহ এখানে আসিবে না!"

ঠাকুরের বিশেষ ভক্তসকলের আগমন—১৮৮৪ খৃঃর মধ্যে

পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর ভক্তদিগের মধ্যে অনেকেই আবার ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগের ভিতরে ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল। নরেন্দ্র তখন সাংসারিক অভাব অনটনের সহিত সংগ্রামে ব্যস্ত এবং রাখাল কিছুকালের জন্য শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। ঐ সকল ভক্তদিগের মধ্যে কাহারও আসিবার কথা, ঠাকুর সমীপস্থ ব্যক্তিদিগের নিকটে "আজ (উত্তর-দক্ষিণাদি কোন দিক্ দেখাইয়া) এই দিক্ হইতে এখানকার একজন আসিতেছে" এইরূপে পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিতেন। কেহ বা

ঐ সকল ভক্তের সহিত মিলনে ঠাকুরের আচরণ

উপস্থিত হইবামাত্র 'তুমি এখানকার লোক' বলিয়া পূর্ব্ব-পরিচিতের ন্যায় সাদরে গ্রহণ করিতেন। কোন ভাগ্যবানের সহিত প্রথম সাক্ষাতের পরে তাহাকে পুনরায় দেখিবার, খাওয়াইবার ও তাহার সহিত একান্তে ধর্ম্মালাপ করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিতেন। কোন ব্যক্তির স্বভাব সংস্কারাদি লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বাগত সমসংস্কার-সম্পন্ন কোন ভক্তবিশেষের সহিত তাহাকে পরিচিত করাইয়া তাহার সহিত ধর্ম্মালোচনায় যাহাতে সে অবসরকাল অতিবাহিত করিতে পারে, তদ্বিষয়ের সুযোগ করিয়া দিতেন। আবার কাহারও গৃহে অযাচিতভাবে উপস্থিত হইয়া সদালাপে অভিভাবকদিগের সন্তোষ উৎপাদনপূর্ব্বক যাহাতে তাঁহারা তাহাকে মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকটে আসিতে নিষেধ না করেন তদ্বিষয়ে পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেন।

অধিকারিভেদে ভক্তসকলকে দিব্যভাবাবিষ্ট ঠাকুরের স্পর্শ, মন্ত্রদান ইত্যাদি ও তাহার ফল

ঐসকল ভক্তের আগমনমাত্র অথবা আসিবার স্বল্পকাল পরে ঠাকুর তাহাদিগের প্রত্যেককে একান্তে আহ্বানপূর্ব্বক ধ্যান করিতে বসাইয়া তাহাদিগের বক্ষ, জিহ্বা প্রভৃতি শরীরের কোন কোন স্থান দিব্যাবেশে স্পর্শ করিতেন। ঐ শক্তিপূর্ণ স্পর্শে তাহাদিগের মন বাহিরের বিষয়সমূহ হইতে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে সংহৃত ও অন্তর্ম্মুখী হইয়া পড়িত এবং সঞ্চিত ধর্ম্মসংস্কারসকল অন্তরে সহসা সজীব হইয়া উঠিয়া সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের দর্শনলাভের জন্য তাহাদিগকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করিত। ফলে, উহার প্রভাবে কাহারও দিব্য-জ্যোতিমাত্রের অথবা দেব-দেবীর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিসমূহের দর্শন, কাহারও গভীর ধ্যান ও অভূতপূর্ব্ব

আনন্দ, কাহারও হৃদ্গ্রন্থিসকল সহসা উন্মোচিত হইয়া ঈশ্বরলাভের জন্য প্রবল ব্যাকুলতা, কাহারও ভাবাবেশ ও সবিকল্প সমাধি এবং বিরল কাহারও নির্ব্বিকল্প সমাধির পূর্ব্বাভাস আসিয়া উপস্থিত হইত। তাঁহার নিকটে আগমন করিয়া ঐরূপে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি প্রভৃতির দর্শন কত লোকের যে উপস্থিত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা হয় না। তারকের মনে ঐরূপে বিষম ব্যাকুলতা ও ক্রন্দনের উদয় হইয়া অন্তরের গ্রন্থিসকল একদিন সহসা উন্মোচিত হইয়াছিল এবং ছোট নরেন উহার প্রভাবে স্বল্পকালে নিরাকারের ধ্যানে সমাধিস্থ হইয়াছিল, একথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি। কিন্তু ঐরূপ স্পর্শে এককালে নির্ব্বিকল্প অবস্থার আভাস প্রাপ্ত হওয়া একমাত্র নরেন্দ্রনাথের জীবনেই হইতে দেখা গিয়াছিল। ভক্তদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে ঠাকুর ঐরূপে স্পর্শ করা ভিন্ন কখন কখন আনবী বা মন্ত্রদীক্ষাও প্রদান করিতেন। ঐ দীক্ষা-প্রদানকালে তিনি সাধারণ গুরুগণের ন্যায় শিষ্যের কোষ্ঠি-বিচারাদি নানাবিধ গণনা ও পূজাদিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। কিন্তু যোগদৃষ্টি-সহায়ে তাহার জন্মজন্মাগত মানসিক সংস্কারসমূহ অবলোকনপূর্ব্বক 'তোর এই মন্ত্র' বলিয়া মন্ত্রনির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। নিরঞ্জন, তেজচন্দ্র, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি কয়েকজনকে তিনি ঐরূপে কৃপা করিয়া-ছিলেন, একথা আমরা তাহাদিগের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি। শাক্ত বা বৈষ্ণব বংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে বলিয়াই তিনি কাহাকেও সেই মন্ত্রে দীক্ষাপ্রদান করিতেন না। কিন্তু অন্তঃসংস্কার নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক শক্ত্যুপাসক কোন কোন ব্যক্তিকে বিষ্ণুমন্ত্রে এবং বৈষ্ণব কাহাকেও বা শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিতেন। অতএব বুঝা যাইতেছে

যে ব্যক্তি যেরূপ অধিকারী তাহা লক্ষ্য করিয়াই তিনি তাহার উপযোগী ব্যবস্থা সর্ব্বদা প্রদান করিতেন।

ঠাকুরের দিব্যস্পর্শ যাহা প্রমাণ করে

ইচ্ছা ও স্পর্শমাত্রে মহাপুরুষগণ অন্তরের আধ্যাত্মিক শক্তি অপরে সংক্রমণপূর্ব্বক তাহার মনের গতি উচ্চপথে পরিচালিত করিয়া দিতে সমর্থ, এই কথা শাস্ত্রগ্রন্থসকলে লিপিবদ্ধ আছে। অন্তরঙ্গ শিষ্যবর্গের ত কথাই নাই—বেশ্যা লম্পটাদি দুষ্কৃতকারীদিগের জীবনও ঐরূপে মহাপুরুষদিগের শক্তিপ্রভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি যে-সকল মহাপুরুষগণ ঈশ্বরাবতার বলিয়া সংসারে অদ্যাবধি পূজিত হইতেছেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের জীবনেই ঐ শক্তির স্বল্পবিস্তর প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শাস্ত্রে ঐরূপ থাকিলে কি হইবে, ঐ শ্রেণীর পুরুষদিগের অলৌকিক কার্য্য-কলাপের সাক্ষাৎ পরিচয় বহুকাল পর্য্যন্ত হারাইয়া সংসার এখন ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছে। ঈশ্বরাবতারে বিশ্বাস করা ত দূরের কথা, ঈশ্বর-বিশ্বাসও এখন অনেক স্থলে কুসংস্কারপ্রসূত মানসিক দুর্ব্বলতার পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। মানব-সাধারণের চিত্ত হইতে ঐ অবিশ্বাস দূর করিয়া তাহাদিগকে আধ্যাত্মিকভাবসম্পন্ন করিতে ঠাকুরের ন্যায় অলৌকিক পুরুষের সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করা বর্ত্তমান যুগে একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত শক্তির প্রকাশ তাঁহাতে অবলোকন করিয়া আমরা এখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধেও ঐ বিষয়ে বিশ্বাসবান্ হইতেছি। ঈশ্বরাবতার বলিয়া ঠাকুরকে বিশ্বাস না করিলেও তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা ও চৈতন্যপ্রমুখ মহাপুরুষসকলের সমশ্রেণীভুক্ত

লোকোত্তর পুরুষ, এবিষয়ে উহা দেখিয়া কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ভক্তসকলের ঠাকুরকে নিজ নিজ ভাবের লোক বলিয়া ধারণা ও ঠাকুরের তাহাদিগের সহিত আচরণ

পূর্ব্বপরিদৃষ্ট ভক্তগণের মধ্যে বালক ও বৃদ্ধ, সংসারী ও অসংসারী, সাকার ও নিরাকারোপাসক, শাক্ত, বৈষ্ণব অথবা অন্য-ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত প্রভৃতি নানাবিধ অবস্থা ও অশেষ-প্রকার ভাবের লোক বিদ্যমান ছিল। ঐরূপ অশেষ প্রভেদ বিদ্যমান থাকিলেও এক বিষয়ে তাহারা সকলে সমভাবসম্পন্ন ছিল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত ও পথে আন্তরিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং নিষ্ঠাবান থাকিয়া ঈশ্বরলাভের নিমিত্ত অশেষ ত্যাগ স্বীকারে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিল। ঠাকুর তাহাদিগকে নিজ স্নেহপাশে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগের ভাব রক্ষাপূর্ব্বক সামান্য বা গুরুতর সকল বিষয়ে তাহাদিগের সহিত এমন ব্যবহার করিতেন যে, তাহারা প্রত্যেকেই অনুমান করিত তিনি সকল ধর্ম্মমতে পারদর্শী হইলেও সে যে পথে অগ্রসর হইতেছে তাহাতেই অধিকতর প্রীতিসম্পন্ন। ঐরূপ ধারণাবশতঃ তাঁহার উপর তাহাদিগের ভক্তি ও ভালবাসার অবধি থাকিত না। আবার তাঁহার সঙ্গগুণে এবং শিক্ষাদীক্ষাপ্রভাবে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি-সমূহ একে একে অতিক্রমপূর্ব্বক উদারভাবসম্পন্ন হইবামাত্র তাঁহাতেও ঐ ভাবের পূর্ণতা দেখিতে পাইয়া তাহারা প্রত্যেকে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপে এখানে সামান্য একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি—

কলিকাতা বাগবাজারনিবাসী শ্রীযুক্ত বলরাম বসু বৈষ্ণববংশে

জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং পরম বৈষ্ণব ছিলেন। সংসারে থাকিলেও ইনি অসংসারী ছিলেন এবং যথেষ্ট ধন-সম্পত্তির অধিকারী হইলেও ইঁহার হৃদয়ে অভিমান কখনও স্থান পায় নাই। ঠাকুরের নিকটে আসিবার পূর্ব্বে ইনি প্রাতে পূজা-পাঠে চারি-পাঁচ ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করিতেন। অহিংসাধর্ম্ম-পালনে তিনি এতদূর যত্নবান ছিলেন যে, কীট-পতঙ্গাদিকেও কখন কোন কারণে আঘাত করিতেন না। ঠাকুর ইঁহাকে দেখিয়াই পূর্ব্বপরিচিতের ন্যায় সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "ইনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সাঙ্গোপাঙ্গের অন্যতম—এখানকার লোক; শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুপাদদিগের সহিত সঙ্কীর্ত্তনে হরিপ্রেমের বন্যা আনিয়া কিরূপে মহাপ্রভু দেশের আবাল-বৃদ্ধ নরনারীকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, ভাবাবেশে তাহা দর্শন করিবার কালে ঐ অদ্ভুত সঙ্কীর্ত্তনদলের মধ্যে ইঁহাকে (বলরামকে) দেখিয়াছিলাম।"

ভক্তগণের অন্তরে উদারতা বৃদ্ধির সহিত ঠাকুরকে বুঝিতে পারিবার ---- বলরাম বসু

ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে বলরামের মন নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়াছিল। বাহ্যপূজাদি বৈধী ভক্তির সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক স্বল্পকালেই তিনি ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ও সদসদ্বিচারবান্ হইয়া সংসারে অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্ত্রী-পুত্র-ধন-জনাদি সর্ব্বস্ব তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন-পূর্ব্বক দাসের ন্যায় তাঁহার সংসারে থাকিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন এবং ঠাকুরের পূত সঙ্গে যতদূর সম্ভব কাল

ঠাকুরের দর্শন লাভে বলরামের উন্নতি ও আচরণ

অতিবাহিত করাই ক্রমে বলরামের জীবনোদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ঠাকুরের কৃপায় স্বয়ং শান্তির অধিকারী হইয়াই বলরাম নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। নিজ আত্মীয় পরিজন বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি সকলেই যাহাতে ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়া যথার্থ সুখের আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে অবসর অন্বেষণপূর্ব্বক তিনি সর্ব্বদা সুযোগ উপস্থিত করিয়া দিয়াছিলেন। ঐরূপে বলরামের আগ্রহে বহু ব্যক্তি ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রয়লাভে ধন্য হইয়াছিল।

বাহ্যপূজার ন্যায় অহিংসাধর্ম্মপালন সম্বন্ধীয় মতও বলরামের কিছুকাল পরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে অন্য সময়ের কথা দূরে থাকুক, উপাসনাকালেও মশকাদি দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে তিনি তাহাদিগকে আঘাত করিতে পারিতেন না; মনে হইত, উহাতে সমূহ ধর্ম্মহানি উপস্থিত হইবে। এখন ঐরূপ সময়ে সহসা একদিন তাঁহার মনে উদয় হইল,—সহস্রভাবে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে শ্রীভগবানে সমাহিত করাই ধর্ম্ম, মশকাদি কীটপতঙ্গের জীবনরক্ষায় উহাকে সতত নিযুক্ত রাখা নহে; অতএব দুই-চারিটা মশক নাশ করিয়া কিছুক্ষণের জন্যও যদি তাঁহাতে চিত্ত স্থির করিতে পারা যায় তাহাতে অধর্ম্ম হওয়া দূরে থাকুক সমধিক লাভই আছে। তিনি বলিতেন, "অহিংসাধর্ম্ম প্রতিপালনে মনের এত কালের আগ্রহ ঐরূপ ভাবনায় প্রতিহত হইলেও চিত্ত ঐবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সন্দেহ নির্ম্মুক্ত হইল না। সুতরাং ঠাকুরকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে দক্ষিণেশ্বরে চলিলাম। যাইবার কালে ভাবিতে লাগিলাম, অন্য সকলের ন্যায় তাঁহাকে কোন দিন মশকাদি মারিতে

বলরামের অহিংসা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মতের পরিবর্ত্তনে সংশয়

দেখিয়াছি কি? —মনে হইল না; স্মৃতির আলোকে যতদূর দেখিতে পাইলাম তাহাতে আমাপেক্ষাও তাঁহাকে অহিংসাব্রতপরায়ণ বলিয়া বোধ হইল। মনে পড়িল, দুর্ব্বাদলশ্যামল ক্ষেত্রের উপর দিয়া অপরকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া নিজবক্ষে আঘাত অনুভবপূর্ব্বক তিনি যন্ত্রণায় এক সময়ে অধীর হইয়াছিলেন—তৃণরাজিমধ্যগত জীবনীশক্তি ও চৈতন্য এত সুস্পষ্ট এবং পবিত্র ভাবে তাঁহার নয়নে প্রতিভাসিত হইয়াছিল! স্থির করিলাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই, আমার মনই আমাকে প্রতারণা করিতে পূর্ব্বোক্ত চিন্তার উদয় করিয়াছে। যাহা হউক তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসি, মন পবিত্র হইবে।

ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ব আচরণ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার

"দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া ঠাকুরের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে দূর হইতে তাঁহাকে যাহা করিতে দেখিলাম, তাহাতে স্তম্ভিত হইলাম। দেখিলাম, তিনি নিজ উপাধান হইতে ছারপোকা বাছিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছেন! নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করাতেই তিনি বলিলেন, 'বালিশটাতে বড় ছারপোকা হইয়াছে, দিবারাত্রি দংশন করিয়া চিত্তবিক্ষেপ এবং নিদ্রার ব্যাঘাত করে, সেজন্য মারিয়া ফেলিতেছি।' জিজ্ঞাসা করিবার আর কিছুই রহিল না, ঠাকুরের কথায় এবং কার্য্যে মন নিঃসংশয় হইল। কিন্তু স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, গত দুই-তিন বৎসরকাল ইঁহার নিকটে যখন তখন আসিয়াছি, দিনে আসিয়াছি রাত্রে ফিরিয়াছি, সন্ধ্যায় আসিয়া রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহরে বিদায় গ্রহণ করিয়াছি। প্রতি সপ্তাহে তিন-চারি

দিন ঐরূপে আসা যাওয়া করিয়াছি, কিন্তু একদিনও ইঁহাকে এইরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখি নাই—ঐরূপ কেমন করিয়া হইল ? তখন নিজ অন্তরেই ঐ বিষয়ের মীমাংসার উদয় হইয়া বুঝিলাম, ইতিপূর্ব্বে ইঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিলে আমার ভাব নষ্ট হইয়া ইঁহার উপরে অশ্রদ্ধার উদয় হইত—পরম কারুণিক ঠাকুর সে জন্য এই প্রকারের অনুষ্ঠান আমার সমক্ষে পূর্ব্বে কখনও করেন নাই !"

পূর্ব্বপরিদৃষ্ট ভক্তগণ ভিন্ন অন্য অনেক নরনারী এইকালে ঠাকুরকে দর্শনপূর্ব্বক শান্তি লাভের জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাদিগকেও তিনি সস্নেহে গ্রহণপূর্ব্বক কাহাকেও উপদেশ দানে, আবার কাহাকেও বা দিব্যাবেশে স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। ঐরূপে যত দিন যাইতেছিল ততই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এক বৃহৎ ভক্তসঙ্ঘ স্বতঃ গঠিত হইতেছিল। তন্মধ্যে বালক ও অবিবাহিত যুবকদিগের ধর্ম্মজীবনগঠনে তিনি অধিকতর লক্ষ্য রাখিতেন। ঐ বিষয়ের কারণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক তিনি বহুবার বলিয়াছেন, "ষোলআনা মন না দিলে ঈশ্বরের পূর্ণদর্শন কখনও লাভ হয় না। বালকদিগের সম্পূর্ণ মন তাহাদের নিকটে আছে—স্ত্রী পুত্র, ধন সম্পত্তি, মান যশ প্রভৃতি পার্থিব বিষয়সকলে ছড়াইয়া পড়ে নাই ; এখন হইতে চেষ্টা করিলে ইহারা ষোলআনা মন ঈশ্বরে অর্পণপূর্ব্বক তাঁহার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইতে পারিবে—ঐজন্যই ইহাদিগকে ধর্ম্মপথে পরিচালিত করিতে আমার অধিক আগ্রহ।" সুযোগ দেখিলেই ঠাকুর ইহাদিগের প্রত্যেককে একান্তে লইয়া যাইয়া যোগধ্যানাদি ধর্ম্মের উচ্চাঙ্গসকলের এবং বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ

ঠাকুরের ভক্তসঙ্ঘ ও বালক ভক্তগণ

না হইয়া অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালনে উপদেশ করিতেন। অধিকারী নির্ব্বাচন করিয়া ইহাদিগকেও তিনি ভিন্ন ভিন্ন উপাস্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন এবং শান্তদাস্যাদি যে ভাবের সম্বন্ধ ইষ্টদেবতার সহিত পাতাইলে তাহারা প্রত্যেকে উন্নতিপথে সহজে অগ্রসর হইতে পারিবে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন।

গৃহী ভক্তদিগকে ও নরনারী সাধারণকে ঠাকুর যেভাবে উপদেশ দিতেন

বালকদিগকে শিক্ষাপ্রদানে ঠাকুরের সমধিক আগ্রহের কথা শুনিয়া কেহ যেন না ভাবিয়া বসেন, সংসারী গৃহস্থ ভক্তদিগের প্রতি তাঁহার কৃপা ও করুণা স্বল্প ছিল। উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মতত্ত্বসকলের অভ্যাস ও অনুশীলনে তাহাদিগের অনেকের সময় ও সামর্থ্য নাই দেখিয়াই তিনি তাহাদিগকে ঐরূপ করিতে বলিতেন না। কিন্তু কাম-কাঞ্চন-ভোগবাসনা ধীরে ধীরে কমাইয়া ভক্তি-মার্গ দিয়া যাহাতে তাহারা কালে ঈশ্বরলাভে ধন্য হইতে পারে, ঐরূপে তাহাদিগকে নিত্য পরিচালিত করিতেন। ধনী ব্যক্তির গৃহে দাসদাসীদিগের ন্যায় মমতা বর্জ্জনপূর্ব্বক ঈশ্বরের সংসারে অবস্থান ও নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে তিনি তাহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে উপদেশ করিতেন। "দুই-একটি সন্তান জন্মিবার পরে ঈশ্বরে চিত্ত অর্পণ করিয়া ভ্রাতা-ভগ্নীর ন্যায় স্ত্রী-পুরুষের সংসারে থাকা কর্ত্তব্য"—ইত্যাদি বলিয়া যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। তদ্ভিন্ন নিত্য সত্যপথে থাকিয়া সকলের সহিত সরল ব্যবহার করিতে, বিলাসিতা বর্জ্জনপূর্ব্বক 'মোটা ভাত মোটা কাপড়' মাত্র লাভে সন্তুষ্ট থাকিয়া শ্রীভগবানের দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে এবং প্রত্যহ দুই সন্ধ্যা ঈশ্বরের

স্মরণ-মনন, পূজা, জপ ও সঙ্কীর্ত্তনাদি করিতে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতেন। গৃহস্থদিগের মধ্যে যাহারা ঐসকল করিতেও অসমর্থ বুঝিতেন, তাহাদিগকে সন্ধ্যাকালে একান্তে বসিয়া হাততালি দিয়া হরিনাম করিতে এবং আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত মিলিত হইয়া নাম-সঙ্কীর্ত্তনের উপদেশ করিতেন। সাধারণ নরনারীগণকে একত্রে উপদেশকালে আমরা তাঁহাকে অনেক সময়ে ঐকথা এইরূপে বলিতে শুনিয়াছি, কলিতে কেবলমাত্র নারদীয়-ভক্তি—উচ্চরোলে নামকীর্ত্তন করিলেই জীব উদ্ধার হইবে; কলির জীব অন্নগতপ্রাণ, অল্পায়ু, স্বল্পশক্তি—সেইজন্যই ধর্ম্মলাভের এত সহজ পথ তাহাদিগের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আবার যোগধ্যানাদি কঠোর সাধনমার্গের কথাসকল শুনিয়া পাছে তাহারা ভগ্নোৎসাহ হয়, এজন্য কখন কখন বলিতেন, "যে সন্ন্যাসী হইয়াছে সে ত ভগবানকে ডাকিবেই। কারণ, ঐ জন্যই ত সে সংসারের সকল কর্ত্তব্য ছাড়িয়া আসিয়াছে—তাহার ঐরূপ করায় বাহাদুরী বা অসাধারণত্ব কি আছে? কিন্তু যে সংসারে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্রাদির প্রতি কর্ত্তব্যের বিষম ভার ঘাড়ে করিয়া চলিতে চলিতে একবারও তাঁহাকে স্মরণ-মনন করে, ঈশ্বর তাহার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হন, ভাবেন, 'এত বড় বোঝা স্কন্ধে থাকা সত্বে এই ব্যক্তি যে আমাকে এতটুকুও ডাকিতে পারিয়াছে, ইহা স্বল্প বাহাদুরী নহে, এই ব্যক্তি বীরভক্ত।' "

নবাগত শ্রেণীভুক্ত নরনারীদের ত কথাই নাই, পূর্ব্বপরিদৃষ্ট ভক্তগণের ভিতরেও ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে কত উচ্চাসন প্রদান করিতেন তাহা বলা যায় না। উহাদিগের মধ্যে কয়েকজনকে নির্দ্দেশ করিয়া তিনি বলিতেন, ইহারা ঈশ্বরকোটী, অথবা শ্রীভগবানের

নরেন্দ্রনাথ
(স্বামী বিবেকানন্দ)

কার্য্যবিশেষ সাধন করিবার নিমিত্ত সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে। ঐ কয়েক ব্যক্তির সহিত নরেন্দ্রের তুলনা করিয়া তিনি এক দিবস আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "নরেন্দ্র যেন সহস্রদল কমল; এই কয়েক জনকে ঐ জাতীয় পুষ্প বলা যাইলেও, ইহাদিগের কেহ দশ, কেহ পনর, কেহ বা বড় জোর বিশদলবিশিষ্ট।" অন্য এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "এত সব লোক এখানে আসিল, নরেন্দ্রের মত একজনও কিন্তু আর আসিল না।" দেখাও যাইত, ঠাকুরের অদ্ভুত জীবনের অলৌকিক কার্য্যাবলীর এবং প্রত্যেক কথার যথাযথ মর্ম্ম গ্রহণ ও প্রকাশ করিতে তিনি যতদূর সমর্থ ছিলেন, অন্য কেহই তদ্রূপ ছিল না। এই কাল হইতেই নরেন্দ্রের নিকটে ঠাকুরের কথাসকল শুনিয়া আমরা সকলে সময়ে সময়ে স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতাম, তাই ত ঐ সকল কথা আমরাও ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি, কিন্তু উহাদিগের ভিতরে যে এত গভীর অর্থ রহিয়াছে তাহা ত বুঝিতে পারি নাই! দৃষ্টান্তস্বরূপে ঐরূপ একটি কথার এখানে উল্লেখ করিতেছি—

নরেন্দ্রকে ঠাকুরের সকল ভক্তাপেক্ষা উচ্চাসন প্রদান

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে আমাদিগের জনৈক বন্ধু দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঠাকুর গৃহমধ্যে ভক্তগণপরিবৃত হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। শ্রীযুত নরেন্দ্রও সেখানে উপস্থিত। নানা সদালাপ এবং মাঝে মাঝে নির্দ্দোষ রঙ্গরসের কথাবার্ত্তাও চলিয়াছে। কথাপ্রসঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্মের কথা উঠিল এবং ঐ মতের সারমর্ম্ম সমবেত সকলকে সংক্ষেপে বুঝাইয়া তিনি বলিলেন, "তিনটি বিষয় পালন করিতে নিরন্তর যত্নবান্ থাকিতে ঐ মতে উপদেশ

করে—নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব-পূজন। যেই নাম সেই ঈশ্বর—নাম-নামী অভেদ জানিয়া সর্ব্বদা অনুরাগের সহিত নাম করিবে; ভক্ত ও ভগবান্, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জানিয়া সর্ব্বদা সাধু-ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা, পূজা ও বন্দনা করিবে; এবং কৃষ্ণেরই জগৎ-সংসার একথা হৃদয়ে ধারণা করিয়া সর্ব্বজীবে দয়া" (প্রকাশ করিবে)। 'সর্ব্ব জীবে দয়া' পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি সহসা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন! কতক্ষণ পরে অর্দ্ধবাহ্যদশায় উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা! কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া কর্‌বি? দয়া কর্‌বার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা!"

ঠাকুরকে নরেন্দ্রের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুঝিতে পারিবার দৃষ্টান্ত—'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'

ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐকথা সকলে শুনিয়া যাইল বটে, কিন্তু উহার গূঢ় মর্ম্ম কেহই তখন বুঝিতে ও ধারণা করিতে পারিল না। একমাত্র নরেন্দ্রনাথই সেদিন ঠাকুরের ভাবভঙ্গের পরে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম! শুষ্ক, কঠোর ও নির্ম্মম বলিয়া প্রসিদ্ধ বেদান্তজ্ঞানকে ভক্তির সহিত সম্মিলিত করিয়া কি সহজ, সরস ও মধুর আলোকই প্রদর্শন করিলেন! অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সংসার ও লোকসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়া বনে যাইতে হইবে এবং ভক্তি ভালবাসা প্রভৃতি কোমল ভাবসমূহকে হৃদয় হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া চিরকালের মত দূরে নিক্ষেপ

ঠাকুরের ঐ কথায় নরেন্দ্রের অদ্ভুত আলোক দর্শন ও তাহা বুঝাইয়া বলা

করিতে হইবে—এই কথাই এতকাল শুনিয়া আসিয়াছি। ফলে ঐরূপে উহা লাভ করিতে যাইয়া জগৎ-সংসার ও তন্মধ্যগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধর্ম্মপথের অন্তরায় জানিয়া তাহাদিগের উপরে ঘৃণার উদয় হইয়া সাধকের বিপথে যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল—বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়। মানব যাহা করিতেছে, সে সকলই করুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল প্রাণের সহিত এই কথা সর্ব্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা করিলেই হইল—ঈশ্বরই জীব ও জগৎরূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছেন। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে সে যাহাদিগের সম্পর্কে আসিতেছে, যাহাদিগকে ভালবাসিতেছে, যাহাদিগকে শ্রদ্ধা, সম্মান অথবা দয়া করিতেছে, তাহারা সকলেই তাঁহার অংশ—তিনি। সংসারের সকল ব্যক্তিকে যদি সে ঐরূপে শিবজ্ঞান করিতে পারে, তাহা হইলে আপনাকে বড় ভাবিয়া তাহাদিগের প্রতি রাগ, দ্বেষ, দম্ভ অথবা দয়া করিবার তাহার অবসর কোথায়? ঐরূপে শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া সে স্বল্প-কালের মধ্যে আপনাকেও চিদানন্দময় ঈশ্বরের অংশ, শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাব বলিয়া ধারণা করিতে পারিবে।

"ঠাকুরের ঐ কথায় ভক্তিপথেও বিশেষ আলোক দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বভূতে ঈশ্বরকে যতদিন না দেখিতে পাওয়া যায়, ততদিন যথার্থ ভক্তি বা পরাভক্তি-লাভ সাধকের পক্ষে সুদূরপরাহত থাকে। শিব বা নারায়ণ জ্ঞানে জীবের সেবা করিলে ঈশ্বরকে সকলের ভিতর দর্শনপূর্ব্বক যথার্থ ভক্তিলাভে ভক্তসাধক স্বল্পকালেই

কৃতকৃতার্থ হইবে, একথা বলা বাহুল্য। কর্ম্ম বা রাজযোগ অবলম্বনে যে-সকল সাধক অগ্রসর হইতেছে তাহারাও ঐ কথায় বিশেষ আলোক পাইবে। কারণ, কর্ম্ম না করিয়া দেহী যখন একদণ্ডও থাকিতে পারে না, তখন শিবজ্ঞানে জীবসেবা রূপ কর্ম্মানুষ্ঠানই যে কর্ত্তব্য এবং উহা করিলেই তাহারা লক্ষ্যে আশু পৌছাইবে, একথা বলিতে হইবে না। যাহা হউক ভগবান্ যদি কখন দিন দেন ত আজি যাহা শুনিলাম এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্ব্বত্র প্রচার করিব —পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব।”

লোকোত্তর ঠাকুর ঐরূপে সমাধিরাজ্যে নিরন্তর প্রবিষ্ট হইয়া জ্ঞান, প্রেম, যোগ ও কর্ম্ম সম্বন্ধে অদৃষ্টপূর্ব্ব আলোক প্রতিনিয়ত আনয়নপূর্ব্বক মানবের জীবনপথ সমুজ্জ্বল করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমরা তাঁহার কথা তখন ধারণা করিতে পারিতাম না। মনস্বী নরেন্দ্রনাথই কেবল ঐসকল দেববাণী যথাসাধ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া সময়ে সময়ে প্রকাশপূর্ব্বক আমাদিগকে স্তম্ভিত করিতেন।

দশম অধ্যায়

পাণিহাটির মহোৎসব

পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট নিবারণের জন্য কিরূপে নরেন্দ্রনাথ অবশেষে ঠাকুরের শরণাপন্ন হইয়া 'মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব থাকিবে না'-রূপ বরলাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। উহার পর হইতে তাঁহার অবস্থা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং সচ্ছল না হইলেও পূর্ব্বের ন্যায় দারুণ অভাব সংসারে আর কখন হয় নাই। ঐ ঘটনার স্বল্পকাল পরে কলিকাতার চাঁপাতলা নামক পল্লীতে মেট্রোপলিটান্ বিদ্যালয়ের একটি শাখা স্থাপিত হয় এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুগ্রহে তিনি উহাতে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়েন। সম্ভবতঃ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মে মাস হইতে আরম্ভ করিয়া তিন-চারি মাস কাল তিনি ঐস্থানে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

নরেন্দ্রের শিক্ষকের পদ গ্রহণ

সাংসারিক অবস্থার সামান্য উন্নতি হইলেও জ্ঞাতিবর্গের শত্রুতাচরণে নরেন্দ্রনাথকে এই সময়ে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। সময় বুঝিয়া তাহারা পৈতৃক ভিটার উত্তম উত্তম গৃহ এবং স্থানগুলি ছলে বলে কৌশলে দখল করিয়াছিল। তজ্জন্য তাঁহাকে এখন কিছুকালের জন্য ঐ বাটী ত্যাগপূর্ব্বক রামতনু বসুর লেনস্থ তাঁহার মাতামহীর ভবনে বাস করিতে হইয়াছিল এবং

জ্ঞাতিগণের শত্রুতা, ঠাকুরের রোহিণী রোগ, শিক্ষকতা পরিত্যাগ

ন্যায্য অধিকারলাভের জন্য তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে অভিযোগ আনয়নপূর্ব্বক সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পিতৃবন্ধু এটর্নী নিমাইচরণ বসু মহাশয় তাঁহাকে ঐ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। মোকদ্দমার তদ্বিরে অনেক সময় অতিবাহিত করিতে হইবে বুঝিয়া এবং ওকালতি (বি.এল্.) পরীক্ষা প্রদানের কাল নিকটবর্ত্তী জানিয়া তিনি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে শিক্ষকতা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঐ বিষয়ের অন্য একটি গুরুতর কারণও বিদ্যমান ছিল—ঠাকুর এখন রোহিণী (গলরোগ) রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় নরেন্দ্র স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার চিকিৎসা ও সেবাদির বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন।

অধিক বরফ ব্যবহারে ঠাকুরের অসুস্থতা

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মাতিশয়ে ঠাকুরকে বিশেষ কষ্ট পাইতে দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে বরফ ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। বরফ খাইয়া তাঁহাকে স্বচ্ছন্দ বোধ করিতে দেখিয়া অনেকে এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে বরফ লইয়া যাইতে লাগিল এবং সরবৎ পানীয়াদির সহিত উহা সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া তিনি বালকের ন্যায় আনন্দ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুই-এক মাস ঐরূপ করিবার পরে তাঁহার গলদেশে বেদনা উপস্থিত হইল। বোধ হয় চৈত্র মাসের শেষ অথবা বৈশাখের প্রারম্ভে তিনি ঐরূপ বেদনা প্রথম অনুভব করিয়াছিলেন।

মাসাবধিকাল অতীত হইলেও ঐ বেদনার উপশম হইল না এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের অর্দ্ধেক যাইতে না যাইতে উহা এক নূতন আকার ধারণ করিল—অধিক কথা কহিলে এবং সমাধিস্থ হইবার পরে

উহার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ঠাণ্ডা লাগিয়া তাঁহার কণ্ঠতালুদেশ ঈষৎ স্ফীত হইয়াছে ভাবিয়া প্রথমে সামান্য প্রলেপের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু কয়েক দিবস ঔষধ প্রয়োগেও ফল পাওয়া গেল না দেখিয়া জনৈক ভক্ত বহুবাজারের রাখাল ডাক্তারের ঐরূপ ব্যাধি আরোগ্য করিবার দক্ষতার কথা শুনিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার রোগনির্ণয় করিয়া গলার ভিতরে এবং বাহিরে লাগাইবার জন্য ঔষধ ও মালিসের বন্দোবস্ত করিলেন এবং ঠাকুর যাহাতে কয়েক দিন অধিক কথা না বলেন ও বারম্বার সমাধিস্থ না হয়েন, তদ্বিষয়ে আমাদিগকে যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখিতে বলিলেন।

অধিক কথা কহায় ও ভাবাবেশে রোগবৃদ্ধি

ক্রমে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী আগতপ্রায় হইল। কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত গঙ্গাতীরবর্ত্তী পাণিহাটি গ্রামে প্রতি বৎসর ঐ দিবসে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষ মেলা হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রধান পার্ষদগণের অন্যতম শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর জ্বলন্ত ত্যাগ বৈরাগ্যের কথা বঙ্গে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। পরমা সুন্দরী স্ত্রী ও অতুল বৈভব ত্যাগপূর্ব্বক পিতার একমাত্র পুত্র রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয়-মানসে যখন প্রথম শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তখন তিনি তাহাকে 'মর্কট বৈরাগ্য'[1] পরিত্যাগ করিয়া কিছুকালের নিমিত্ত গৃহে অবস্থান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। রঘুনাথ, মহাপ্রভুর ঐ আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন এবং সংসার ত্যাগ করিবার

পাণিহাটির মহোৎসবের ইতিহাস

১ অর্থাৎ লোক-দেখান

প্রবল বাসনা অন্তরে লুক্কায়িত রাখিয়া ইতর-সাধারণের ন্যায় বিষয়-কার্য্যের পরিচালনা প্রভৃতি সাংসারিক সকল বিষয়ে পিতা ও পিতৃব্যকে সাহায্য করিতে থাকেন। ঐরূপে অবস্থান করিলেও তিনি মধ্যে মধ্যে শ্রীচৈতন্য-পার্ষদগণকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না এবং পিতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক কখন কখন তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া কয়েক দিবস তাঁহাদিগের পূতসঙ্গে অতিবাহিত করিয়া বাটীতে ফিরিয়া যাইতেন। ঐরূপে দিন যাইতে লাগিল এবং ত্যাগের অবসর অন্বেষণ করিয়া রঘুনাথ সংসারে কাল কাটাইতে লাগিলেন। ক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস লইয়া নীলাচলে বাস করিলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের ভার প্রাপ্ত হইয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী খড়দহ গ্রামকে প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া বঙ্গের নানা স্থানে পরিভ্রমণ ও নামসংকীর্ত্তনাদি দ্বারা বহু ব্যক্তিকে উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন।

সাঙ্গোপাঙ্গ-পরিবৃত শ্রীনিত্যানন্দ ধর্ম্মপ্রচারকল্পে এক সময়ে পাণিহাটি গ্রামে অবস্থান করিবার কালে রঘুনাথ তাঁহাকে দর্শন করিতে উপস্থিত হয়েন এবং চিড়া, দধি, দুগ্ধ, শর্করা, কদলী প্রভৃতি দেবতাকে নিবেদনপূর্ব্বক ভক্তমণ্ডলীসহ তাঁহাকে ভোজন করাইতে আদিষ্ট হয়েন। রঘুনাথ উহা সানন্দে স্বীকার করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে দর্শন করিতে সমাগত শত শত ব্যক্তিকে সেইদিন ভাগীরথী-তীরে ভোজনদানে পরিতৃপ্ত করেন। উৎসবান্তে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণামপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিতে যাইলে তিনি ভাবাবেশে রঘুনাথকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, 'কাল পূর্ণ হইয়াছে, সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক নীলাচলে শ্রীমহাপ্রভুর নিকট গমন করিলে তিনি

তোমাকে এখন আশ্রয় প্রদান করিবেন এবং ধর্ম্মজীবন সম্পূর্ণ করিবার জন্য সনাতন গোস্বামীর হস্তে তোমার শিক্ষার ভার অর্পণ করিবেন।' নিত্যানন্দ প্রভুপাদের ঐরূপ আদেশে রঘুনাথের উল্লাসের অবধি রহিল না এবং বাটীতে ফিরিবার অনতিকাল পরে তিনি চিরকালের মত সংসার ত্যাগ করিয়া নীলাচলে গমন করিলেন। রঘুনাথ চলিয়া যাইলেন কিন্তু বৈষ্ণব ভক্তগণ তাঁহার কথা চিরকাল স্মরণ রাখিয়া তদবধি প্রতি বৎসর ঐ দিবস পাণিহাটি গ্রামে গঙ্গাতীরে সমাগত হইয়া তাঁহার ন্যায় ভগবৎপ্রসন্নতা লাভের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুপাদের উদ্দেশ্যে ঐরূপ উৎসব সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। কালে উহা পাণিহাটির 'চিড়ার মহোৎসব' নামে ভক্ত-সমাজে খ্যাতি লাভ করিল।

ঠাকুরের উক্ত মহোৎসব দেখিতে যাইবার সংকল্প

ঠাকুর ইতিপূর্ব্বে পাণিহাটির মহোৎসবে অনেকবার যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার ইংরাজী শিক্ষিত ভক্তগণের আগমনের কাল হইতে নানা কারণে তিনি কয়েক বৎসর উহা করিতে পারেন নাই। নিজ ভক্তগণের সহিত ঐ উৎসব দর্শনে যাইতে তিনি এই বৎসর অভিলাষ প্রকাশ-পূর্ব্বক আমাদিগকে বলিলেন, "সেখানে ঐ দিন আনন্দের মেলা, হরিনামের হাট-বাজার বসে—তোরা সব 'ইয়ং বেঙ্গল', কখন ঐরূপ দেখিস্ নাই, চল্ দেখিয়া আসিবি।" রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভক্ত-দিগের মধ্যে একদল ঐ কথায় বিশেষ আনন্দিত হইলেও কেহ কেহ তাঁহার গলদেশে বেদনার কথা ভাবিয়া তাঁহাকে ঐ বিষয়ে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিল। তাহাদিগের সন্তোষের জন্য তিনি বলিলেন,

"এখান হইতে সকাল সকাল দুইটি খাইয়া যাইব এবং দুই-এক ঘণ্টা কাল তথায় থাকিয়া ফিরিব, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবে না; ভাবসমাধি অধিক হইলে গলার ব্যথাটা বাড়িতে পারে বটে, ঐ বিষয়ে একটু সাম্‌লাইয়া চলিলেই হইবে।" তাঁহার ঐরূপ কথায় সকল ওজর-আপত্তি ভাসিয়া গেল এবং ভক্তগণ তাঁহার পাণিহাটি যাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী—আজ পাণিহাটির মহোৎসব। প্রায় পঁচিশ জন ভক্ত দুইখানি নৌকা ভাড়া করিয়া প্রাতে নয় ঘটিকার ভিতরে দক্ষিণেশ্বরে সমাগত হইল। কেহ কেহ পদব্রজে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুরের নিমিত্ত একখানি পৃথক নৌকা ভাড়া হইয়া ঘাটে বাঁধা রহিয়াছে দেখা গেল। কয়েকজন স্ত্রীভক্ত অতি প্রত্যুষে আসিয়াছিলেন—শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সহিত মিলিতা হইয়া তাঁহারা ঠাকুরের ও ভক্তগণের আহারের বন্দোবস্ত করিলেন। বেলা দশটার ভিতরে সকলে ভোজন করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

উৎসব দিবসে যাত্রার পূর্ব্বে

ঠাকুরের ভোজনান্তে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী জনৈকা স্ত্রীভক্তের দ্বারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, তিনি (মা) যাইবেন কি না। ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "তোমরা ত যাইতেছ, যদি ওর (মা'র) ইচ্ছা হয় ত চলুক।" শ্রীশ্রীমা ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, "অনেক লোক সঙ্গে যাইতেছে, সেখানেও অত্যন্ত ভিড় হইবে, অত ভিড়ে নৌকা হইতে নামিয়া উৎসব দর্শন করা আমার পক্ষে দুষ্কর হইবে, আমি যাইব না।" শ্রীশ্রীমা যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন এবং দুই-তিন

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর না যাইবার কারণ

জন স্ত্রীভক্ত যাঁহারা যাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ভোজন করাইয়া ঠাকুরের নৌকায় গমন করিতে আদেশ করিলেন।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর আন্দাজ পাণিহাটিতে পৌঁছিয়া দেখা গেল গঙ্গাতীরে প্রাচীন বটগাছের চতুঃপার্শ্বে অনেক লোক সমাগত হইয়াছে এবং বৈষ্ণব ভক্তগণ স্থানে স্থানে সঙ্কীর্ত্তনে আনন্দ করিতেছেন। ঐরূপ করিলেও কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে ভগবৎনামগানে যথার্থ মগ্ন হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল না। সর্ব্বত্র একটা অভাব ও প্রাণহীনতা চক্ষে পড়িতে লাগিল।

যাত্রাকালে ও উৎসবস্থলে পৌঁছিয়া যাহা দেখা গেল

নৌকায় যাইবার কালে এবং তথায় উপস্থিত হইয়া নরেন্দ্রনাথ, বলরাম, গিরিশচন্দ্র, রামচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রধান ভক্তসকলে ঠাকুরকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন যাহাতে তিনি কোনও কীর্ত্তনসম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া মাতামাতি না করেন। কারণ, কীর্ত্তনে মাতিলে তাঁহার ভাবাবেশ হওয়া অনিবার্য্য হইবে এবং উহাতে গলদেশের বেদনা বৃদ্ধি পাইবে।

নৌকা হইতে নামিয়া ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বরাবর শ্রীযুক্ত মণি সেনের বাটীতে যাইয়া উঠিলেন। তাঁহার আগমনে আনন্দিত হইয়া মণি বাবুর বাটীর সকলে তাঁহাকে প্রণাম পুরঃসর বৈঠকখানায় লইয়া যাইয়া বসাইলেন। ঘরখানি টেবিল, চেয়ার, সোফা, কার্পেটাদি দ্বারা ইংরাজী ধরণে সুসজ্জিত। এখানে দশ-পনর মিনিট বিশ্রাম করিয়াই তিনি সকলকে সঙ্গে লইয়া ইঁহাদিগের ঠাকুরবাটীতে ৺রাধাকান্তজীকে দর্শন করিবার মানসে উঠিলেন।

মণি সেনের বাটী

বৈঠকখানাগৃহের পার্শ্বেই ঠাকুরবাটী। পার্শ্বের দরজা দিয়া আমরা একেবারে মন্দিরসংলগ্ন নাটমন্দিরের উপরে উপস্থিত হইয়া যুগলবিগ্রহ মূর্ত্তির দর্শন-লাভ করিলাম। মূর্ত্তি দুইটি সুন্দর। কিছুক্ষণ দর্শনান্তে ঠাকুর অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় প্রণাম করিতে লাগিলেন। নাটমন্দিরের মধ্যভাগ হইতে পাঁচ-সাতটি ধাপ নামিয়া ঠাকুরবাটীর চকমিলান প্রশস্ত উঠান ও সদর ফটক। ফটকটি এমন স্থানে বিদ্যমান যে ঠাকুরবাটীতে প্রবেশমাত্র বিগ্রহমূর্ত্তির দর্শন লাভ হয়। ঠাকুর যখন প্রণাম করিতেছিলেন তখন একদল কীর্ত্তন উক্ত ফটক দিয়া উঠানে প্রবেশপূর্ব্বক গান আরম্ভ করিল। বুঝা গেল মেলাস্থলে যত কীর্ত্তনসম্প্রদায় আসিতেছে তাহাদিগের প্রত্যেকে প্রথমে এখানে আসিয়া কীর্ত্তন করিয়া পরে গঙ্গাতীরে আনন্দ করিতে যাইতেছে। শিখা-সূত্রধারী, তিলকচক্রাঙ্কিত দীর্ঘ স্থূলবপু, গৌরবর্ণ, প্রৌঢ়বয়স্ক এক পুরুষ ঝুলিতে মালা জপিতে জপিতে ঐ সময়ে উঠানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার স্কন্ধে উত্তরীয়, পরিধানে ধোপদস্ত রেলির উনপঞ্চাশের থান ধুতি, সুন্দরভাবে গুছাইয়া পরা এবং ট্যাঁকে একগোছা পয়সা—দেখিলেই মনে হয় কোন গোস্বামিপুঙ্গব মেলার সুযোগে দুই পয়সা আদায়ের জন্য সাজিয়া-গুজিয়া বাহির হইয়াছেন। কীর্ত্তনসম্প্রদায়কে উত্তেজিত করিবার জন্য এবং বোধ হয় সমাগত ব্যক্তিবর্গকে নিজ মহত্ত্বে মুগ্ধ করিতে তিনি আসিয়াই কীর্ত্তনদলের সহিত মিলিত হইয়া ভাবাবিষ্টের ন্যায় অঙ্গভঙ্গী, হুঙ্কার ও নৃত্য করিতে লাগিলেন।

মণি বাবুর ঠাকুরবাটী

প্রণামান্তে ঠাকুর নাটমন্দিরের একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া

কীর্ত্তন শুনিতেছিলেন। গোস্বামীজীর বেশভূষার পারিপাট্য ও ভাবাবেশের ভান দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া তিনি নরেন্দ্রপ্রমুখ পার্শ্বস্থ ভক্তগণকে মৃদুস্বরে বলিলেন, "ঢং ছাখ্!" তাঁহার ঐরূপ পরিহাসে সকলের মুখে হাস্যের রেখা দেখা দিল এবং তিনি কিছুমাত্র ভাবাবিষ্ট না হইয়া আপনাকে বেশ সামলাইয়া চলিতেছেন ভাবিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল, ঠাকুর কেমন করিয়া তাহারা বুঝিবার পূর্ব্বে চক্ষের নিমেষে তাহাদিগের মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এক লম্ফে কীর্ত্তনদলের মধ্যভাগে সহসা অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং ভাবাবেশে তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞার লোপ হইয়াছে। ভক্তগণ তখন শশব্যস্তে নাটমন্দির হইতে নামিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল এবং তিনি কখন অর্দ্ধ-বাহ্যদশা লাভপূর্ব্বক সিংহ-বিক্রমে নৃত্য করিতে এবং কখন সংজ্ঞা হারাইয়া স্থির হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে যখন তিনি দ্রুতপদে তালে তালে কখন অগ্রসর এবং কখন পশ্চাতে পিছাইয়া আসিতে লাগিলেন, তখন মনে হইতে লাগিল তিনি যেন 'সুখময় সায়রে' মীনের ন্যায় মহানন্দে সন্তরণ ও ছুটাছুটি করিতেছেন। প্রতি অঙ্গের গতি ও চালনাতে ঐ ভাব পরিস্ফুট হইয়া তাঁহাতে যে অদৃষ্টপূর্ব্ব কোমলতা ও মাধুর্য্য-মিশ্রিত উদ্দাম উল্লাসময় শক্তির প্রকাশ উপস্থিত করিল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। স্ত্রীপুরুষের হাবভাবময় মনোমুগ্ধকারী নৃত্য অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু দিব্য ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া তাণ্ডবনৃত্য করিবার কালে ঠাকুরের দেহে যেরূপ রুদ্র-মধুর সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিত, তাহার আংশিক ছায়াপাতও

ঠাকুরের ভাবাবেশ ও নৃত্য

ঐ সকলে আমাদিগের নয়নগোচর হয় নাই। প্রবল ভাবোল্লাসে উদ্বেলিত হইয়া তাঁহার দেহ যখন হেলিতে দুলিতে ছুটিতে থাকিত তখন ভ্রম হইত, উহা বুঝি কঠিন জড় উপাদানে নির্ম্মিত নহে, বুঝি আনন্দসাগরে উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়া প্রচণ্ডবেগে সম্মুখস্থ সকল পদার্থকে ভাসাইয়া অগ্রসর হইতেছে—এখনই আবার গলিয়া তরল হইয়া উহার ঐ আকার লোকদৃষ্টির অগোচর হইবে। আসল ও নকল পদার্থের মধ্যে কত প্রভেদ কাহাকেও বুঝাইতে হইল না, কীর্ত্তন-সম্প্রদায় গোস্বামীজীর দিকে আর দৃষ্টিপাত না করিয়া ঠাকুরকে বেষ্টনপূর্ব্বক শতগুণ উৎসাহ-আনন্দে গান গাহিতে লাগিল।

রাঘব পণ্ডিতের বাটীতে যাইবার পথে

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল এইরূপে অতীত হইলে ঠাকুরকে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে কীর্ত্তনসম্প্রদায়ের মধ্য হইতে সরাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। স্থির হইল, এখান হইতে অল্প দূরে অবস্থিত মহাপ্রভুর পার্ষদ রাঘব পণ্ডিতের বাটীতে যাইয়া তিনি যে যুগলবিগ্রহ ও শালগ্রামশিলার নিত্য সেবা করিতেন তাহা দর্শনপূর্ব্বক নৌকায় ফিরিয়া যাইবে। ঠাকুর ঐ কথায় সম্মত হইয়া ভক্তবৃন্দ সঙ্গে মণি সেনের ঠাকুরবাটী হইতে বহির্গত হইলেন। কীর্ত্তনসম্প্রদায় কিন্তু তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না, মহোৎসাহে নামগান করিতে করিতে পশ্চাতে আসিতে লাগিল। ঠাকুর উহাতে দুই-চারি পদ অগ্রসর হইয়াই ভাবাবেশে স্থির হইয়া রহিলেন। অর্দ্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলে ভক্তগণ তাঁহাকে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিল, তিনিও দুই-চারি পদ চলিয়া পুনরায় ভাবাবিষ্ট হইলেন। পুনঃ পুনঃ ঐরূপ হওয়াতে ভক্তগণ অতি ধীরে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইল।

ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের শরীরে সেই দিন যে দিব্যোজ্জ্বল সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াছি সেইরূপ আর কখনও নয়নগোচর হইয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না। দেব-দেহের সেই অপূর্ব্ব শ্রী যথাযথ বর্ণনা করা মনুষ্যশক্তির পক্ষে অসম্ভব। ভাবাবেশে দেহের অতদূর পরিবর্ত্তন নিমেষে উপস্থিত হইতে পারে এ কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে কখনও কল্পনা করি নাই। তাঁহার উন্নত বপুঃ প্রতিদিন যেমন দেখিয়াছি তদপেক্ষা অনেক দীর্ঘ এবং স্বপ্নদৃষ্ট শরীরের ন্যায় লঘু বলিয়া প্রতীত হইতেছিল, শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল হইয়া গৌরবর্ণে পরিণত হইয়াছিল; ভাবপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া চতুঃপার্শ্ব আলোকিত করিয়াছিল, এবং মহিমা করুণা শান্তি ও আনন্দপূর্ণ মুখের সেই অনুপম হাসি দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় জনসাধারণকে কিছুক্ষণের জন্য সকল কথা ভুলাইয়া তাঁহার পদানুসরণ করাইয়াছিল! উজ্জ্বল গৈরিকবর্ণের পরিধেয় গরদখানি ঐ অপূর্ব্ব অঙ্গকান্তির সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্যে মিলিত হইয়া তাঁহাকে অগ্নিশিখাপরিব্যাপ্ত বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছিল।

ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের অপূর্ব্ব শ্রী

মণি বাবুর ঠাকুরবাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজপথে আসিবামাত্র কীর্ত্তনসম্প্রদায় তাঁহার দিব্যোজ্জ্বল শ্রী, মনোহর নৃত্য ও পুনঃ পুনঃ গভীর ভাবাবেশ দর্শনে নবীন উৎসাহে পূর্ণ হইয়া গান ধরিল—

ঠাকুরের দিব্যদর্শনে কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের উৎসাহ ও উল্লাস

সুরধুনীর তীরে হরি বলে কে রে,
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।

ওরে হরি বলে কে রে,
জয় রাধে বলে কে রে,
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে—
(আমাদের) প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।
নিতাই নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে—
(এই আমাদের) প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।

শেষ ছত্রটি গাহিবার কালে তাহারা ঠাকুরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক বারংবার 'এই আমাদের প্রেমদাতা' বলিয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহাদিগের ঐ উৎসাহ উৎসবস্থলে সমাগত জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্ব্বক তাহাদিগকে তথায় আনয়ন করিতে লাগিল এবং যাহারা আসিয়া একবার ঠাকুরকে দর্শন করিল তাহারা মোহিত হইয়া মহোল্লাসে কীর্ত্তনে যোগদান করিল অথবা প্রাণে অনির্ব্বচনীয় দিব্য ভাবোদয়ে স্তব্ধ হইয়া নীরবে ঠাকুরকে অনিমেষে দেখিতে দেখিতে সঙ্গে যাইতে লাগিল। জনসাধারণের উৎসাহ ক্রমে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং অন্য কয়েকটি কীর্ত্তনসম্প্রদায় আসিয়া পূর্ব্বোক্ত দলের সহিত যোগদান করিল। ঐরূপে এক বিরাট জনসঙ্ঘ ভাবাবিষ্ট ঠাকুরকে বেষ্টন করিয়া রাঘব পণ্ডিতের কুটীরাভিমুখে ধীরপদে অগ্রসর হইতে লাগিল।

জনসাধারণের আকৃষ্ট হওয়া

গঙ্গাতীরবর্ত্তী বটবৃক্ষের নিম্নে শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়ের উদ্দেশে কয়েক মালসা ফলাহার উৎসর্গ করাইয়া স্ত্রীভক্তেরা ঠাকুরের নিমিত্ত আনয়ন করিতেছিলেন। রাঘব পণ্ডিতের বাটীতে উপস্থিত

হইবার কিছু পূর্ব্বে একজন ভেকধারী কুৎসিত কদাকার বাবাজী সহসা কোথা হইতে আসিয়া এক মালসা প্রসাদ জনৈকা স্ত্রীভক্তের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইল এবং যেন ভাবে প্রেমে গদ্‌গদ হইয়া উহার কিয়দংশ ঠাকুরের মুখে স্বহস্তে প্রদান করিল। ঠাকুর তখন ভাবাবেশে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বাবাজী স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সহসা শিহরিয়া উঠিয়া ভাবভঙ্গ হইল এবং মুখে প্রদত্ত খাদ্যদ্রব্য থু থু করিয়া নিক্ষেপপূর্ব্বক মুখ ধৌত করিলেন। ঐ ঘটনায় বাবাজীকে ভণ্ড বলিয়া বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না এবং সকলে তাহার উপর বিরক্তি ও বিদ্রূপের সহিত কটাক্ষ করিতেছে দেখিয়া সে দূরে পলায়ন করিল। ঠাকুর তখন অন্য এক ভক্তের নিকট হইতে প্রসাদকণিকা গ্রহণপূর্ব্বক ভক্তগণকে অবশিষ্টাংশ খাইতে দিলেন।

মালসা ভোগ

ঐরূপে ঐ পথ অতিক্রম করিয়া রাঘব পণ্ডিতের বাটীতে পৌঁছিতে প্রায় তিন ঘণ্টা কাল লাগিল। এখানে আসিয়া মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দর্শন, স্পর্শন ও বিশ্রামাদি করিতে ঠাকুরের অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অতীত হইল এবং সঙ্গের সেই বিরাট জনসঙ্ঘ ধীরে ধীরে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িল। ভিড় কমিয়াছে দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে নৌকায় লইয়া আসিল। কিন্তু এখানেও এক অদ্ভুত ব্যাপার উপস্থিত হইল। কোন্নগরনিবাসী নবচৈতন্য মিত্র উৎসবস্থলে ঠাকুর আসিয়াছেন শুনিয়া দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিতেছিল। এখন নৌকামধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া এবং নৌকা ছাড়িবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া সে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার

নৌকায় প্রত্যাবর্ত্তন ও নবচৈতন্যকে কৃপা

পদপ্রান্তে আছাড় খাইয়া পড়িল এবং 'কৃপা করুন' বলিয়া প্রাণের আবেগে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ঠাকুর তাহার ব্যাকুলতা ও ভক্তি দর্শনে তাহাকে ভাবাবেশে স্পর্শ করিলেন। উহাতে কি অপূর্ব্ব দর্শন উপস্থিত হইল বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার ব্যাকুল ক্রন্দন নিমেষের মধ্যে অসীম উল্লাসে পরিণত হইল এবং বাহ্যজ্ঞানশূন্যের ন্যায় সে নৌকার উপরে তাণ্ডব নৃত্য ও ঠাকুরকে নানারূপে স্তবস্তুতিপূর্ব্বক বারংবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে লাগিল! ঐরূপে কিছুক্ষণ অতীত হইলে ঠাকুর তাহার পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়া নানা-প্রকারে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক শান্ত করিলেন। নবচৈতন্য ইতিপূর্ব্বে অনেকবার ঠাকুরকে দর্শন করিলেও এতদিন তাঁহার কৃপালাভ করিতে পারে নাই, অদ্য তল্লাভে কৃতার্থ হইয়া সংসারের ভার পুত্রের উপর অর্পণপূর্ব্বক নিজগ্রামে গঙ্গাতীরে পর্ণকুটীরে জীবনের অবশিষ্ট কাল বানপ্রস্থের ন্যায় সাধন-ভজন ও ঠাকুরের নামগুণগানে অতীত করিয়াছিল। এখন হইতে সংকীর্ত্তনকালে বৃদ্ধ নবচৈতন্যের ভাবাবেশ উপস্থিত হইত এবং তাহার ভক্তি ও আনন্দময় মূর্ত্তি দর্শনে অনেকে তাহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। ঐরূপে নবচৈতন্য ঠাকুরের কৃপায় পরজীবনে বহুব্যক্তির হৃদয়ে ভগবদ্‌ভক্তি উদ্দীপনে সমর্থ হইয়াছিল।

নবচৈতন্য বিদায় গ্রহণ করিলে ঠাকুর নৌকা ছাড়িতে আদেশ করিলেন। কিছুদূর আসিতে না আসিতে সন্ধ্যা হইল এবং রাত্রি সাড়ে আটটা আন্দাজ আমরা দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত হইলাম। অনন্তর ঠাকুর গৃহমধ্যে উপবিষ্ট হইলে ভক্তগণ তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক কলিকাতায় ফিরিবার জন্য বিদায় গ্রহণ করিল।

সকলে নৌকারোহণ করিতেছে এমন সময়ে একব্যক্তির মনে হইল জুতা ভুলিয়া আসিয়াছে এবং উহা আনিবার জন্য সে পুনরায় ঠাকুরের গৃহাভিমুখে ছুটিল। তাহাকে দেখিয়া ঠাকুর ফিরিবার কারণ জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক পরিহাস করিয়া বলিলেন, "ভাগ্যে ঐ কথা নৌকা ছাড়িবার পূর্ব্বে মনে হইল, নতুবা আজিকার সমস্ত আনন্দটা ঐ ঘটনায় পণ্ড হইয়া যাইত!" যুবক ঐ কথায় হাসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিবার উপক্রম করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কেমন দেখিলি বল্ দেখি? যেন হরিনামের হাটবাজার বসিয়া গিয়াছে—না?" সে ঐ কথায় সায় দিলে তিনি নিজ ভক্তগণের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তির উৎসবস্থলে ভাবাবেশ হইয়াছিল তদ্বিষয়ের উল্লেখপূর্ব্বক ছোট নরেন্দ্রের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "কেলে ছোঁড়াটা অল্পদিন হইল এখানে আসা-যাওয়া করিতেছে, ইহার মধ্যেই তাহার ভাব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সেদিন তাহার ভাব আর ভাঙ্গে না —এক ঘণ্টার উপর বাহ্যসংজ্ঞা ছিল না! সে বলে তাহার মন আজকাল নিরাকারে লীন হইয়া যায়! ছোট নরেন বেশ ছেলে—না? তুই একদিন তাহার বাটীতে যাইয়া আলাপ করিয়া আসিবি—কেমন?" যুবক তাহার সকল কথায় সায় দিয়া বলিল, "কিন্তু মশায়! বড় নরেনকে আমার যেমন ভাল লাগে এমন আর কাহাকেও না, সেজন্য ছোট নরেনের বাটীতে যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না।" ঠাকুর উহাতে তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুই ছোঁড়া ত ভারি একঘেয়ে, একঘেয়ে হওয়াটা হীন বুদ্ধির

দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছান—বিদায়কালে জনৈক ভক্তের সহিত ঠাকুরের কথা

কাজ, ভগবানের পাঁচ ফুলে সাজি—নানা প্রকারের ভক্ত, তাহাদের সকলের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ করিতে না পারাটা বিষম হীন বুদ্ধির কাজ; তুই ছোট নরেনের নিকটে একদিন নিশ্চয় যাইবি—কেমন, যাইবি ত?” সে অগত্যা সম্মত হইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিল। পরে জানা গিয়াছিল, ঐ ব্যক্তি কয়েক দিন পরে ঠাকুরের কথামত ছোট নরেনের সহিত আলাপ করিতে যাইয়া তাহার কথায় জীবনের গুরুতর জটিল এক সমস্যার সমাধান লাভপূর্ব্বক ধন্য হইয়াছিল। নৌকা সেইদিন কলিকাতায় পৌঁছিতে রাত্রি প্রায় দশটা বাজিয়াছিল।

স্ত্রীভক্তেরা সেই রাত্রি শ্রীশ্রীমার নিকটে অবস্থান করিলেন এবং স্নানযাত্রার দিবসে ৺দেবীপ্রতিষ্ঠার বাৎসরিক উপলক্ষে কালীবাটীতে বিশেষ সমারোহ হইবে জানিতে পারিয়া ঐ পর্ব্বদর্শনান্তে কলিকাতায় ফিরিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। রাত্রে আহার করিতে বসিয়া ঠাকুর পাণিহাটির উৎসবের কথা-প্রসঙ্গে তাঁহাদের একজনকে বলিলেন, “অত ভিড়—তাহার উপর ভাবসমাধির জন্য আমাকে সকলে লক্ষ্য করিতেছিল—ও (শ্রীশ্রীমা) সঙ্গে না যাইয়া ভালই করিয়াছে, ওকে সঙ্গে দেখিলে লোকে বলিত ‘হংস-হংসী এসেছে!’ ও খুব বুদ্ধিমতী।” শ্রীশ্রীমার অসামান্য বুদ্ধির দৃষ্টান্ত-স্বরূপে পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “মাড়োয়ারী ভক্ত[১] যখন দশ-হাজার টাকা দিতে চাহিল তখন আমার মাথায় যেন করাত

রাত্রে আহারকালে শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে জনৈকা স্ত্রীভক্তের সহিত কথা

১ ইহার নাম লছমীনারায়ণ ছিল।

বসাইয়া দিল ; মাকে বলিলাম, 'মা, এতদিন পরে আবার প্রলোভন দেখাইতে আসিলি !' সেই সময়ে ওর মন বুঝিবার জন্য ডাকাইয়া বলিলাম, 'ওগো, এই টাকা দিতে চাহিতেছে, আমি লইতে পারিব না বলায় তোমার নামে দিতে চাহিতেছে, তুমি উহা লও না কেন—কি বল ?' শুনিয়াই ও বলিল, 'তা কেমন করিয়া হইবে ? টাকা লওয়া হইবে না, আমি লইলে ঐ টাকা তোমারই লওয়া হইবে। কারণ, আমি উহা রাখিলে তোমার সেবা ও অন্যান্য আবশ্যকে উহা ব্যয় না করিয়া থাকিতে পারিব না ; সুতরাং ফলে উহা তোমারই গ্রহণ করা হইবে। তোমাকে লোকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে তোমার ত্যাগের জন্য—অতএব টাকা কিছুতেই লওয়া হইবে না।' ওর (শ্রীশ্রীমার) ঐ কথা শুনিয়া আমি হাঁপ ফেলিয়া বাঁচি !"

শ্রীশ্রীমার সহিত উক্ত ভক্তের কথা

ঠাকুরের ভোজন সাঙ্গ হইলে স্ত্রীভক্তগণ নহবতে মাতাঠাকুরাণীর নিকটে যাইয়া তাঁহার সম্বন্ধে ঠাকুর যাহা বলিতেছিলেন তাহা শুনাইলে শ্রীশ্রীমা বলিলেন, "প্রাতে উনি (ঠাকুর) আমাকে যে ভাবে যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন তাহাতেই বুঝিতে পারিলাম—উনি মন খুলিয়া ঐ বিষয়ে অনুমতি দিতেছেন না। তাহা হইলে বলিতেন—হাঁ, যাবে বৈ কি। ঐরূপ না করিয়া উনি ঐ বিষয়ের মীমাংসার ভার যখন আমার উপরে ফেলিয়া বলিলেন, 'ওর ইচ্ছা হয় ত চলুক,' তখন স্থির করিলাম যাইবার সংকল্প ত্যাগ করাই ভাল।"

গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়া সে রাত্রে ঠাকুরের নিদ্রা হইল না। উৎসবস্থলে নানাপ্রকার চরিত্রের লোক তাঁহার দেব-অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় ঐরূপ হইয়াছিল। কারণ দেখা

যাইত, অপবিত্র অশুদ্ধমনা ব্যক্তিগণ ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে অথবা অন্যপ্রকার সকামভাবে তাঁহার অঙ্গস্পর্শ-পূর্ব্বক পদধূলি গ্রহণ করিলে ঐরূপ দাহে তিনি অনেক সময়ে প্রপীড়িত হইতেন। পাণিহাটি উৎসবের একদিন পরে স্নানযাত্রার পর্ব্ব উপস্থিত হইল। ঐ দিবসে আমরা দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইতে পারি নাই। স্ত্রীভক্তদিগের নিকটে শুনিয়াছি

স্নানযাত্রার দিবসে নানা লোকের সংসর্গে ঠাকুরের ভাবভঙ্গ ও বিরক্তি

ঐ দিবসে অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষ ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছিল। তন্মধ্যে অ—র মা নাম্নী জনৈকা নিজ বিষয়সম্পত্তির বন্দোবস্ত করাইয়া লইবার আশয়ে তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিয়া তাঁহার আনন্দের বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিল। মধ্যাহ্নে ভোজন করিবার কালে তাহাকে নিকটে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া কথা কহেন নাই এবং অন্য দিবসের ন্যায় খাইতেও পারেন নাই। পরে ভোজনান্তে আমাদের পরিচিতা জনৈকা তাঁহাকে আচমনার্থ জল দিতে যাইলে তাহাকে একান্তে বলিয়াছিলেন, “এখানে লোক আসে ভক্তি প্রেম হইবে বলিয়া—এখান হইতে ওর বিষয়ের কি বন্দোবস্ত হইবে বল দেখি? মাগী কামনা করিয়া আঁব সন্দেশাদি আনিয়াছে—উহার একটুও মুখে তুলিতে পারিলাম না। আজ স্নানযাত্রার দিন, অন্য বৎসর এই দিনে কত ভাবসমাধি হইত, দুই-তিন দিন ভাবের ঘোর থাকিত, আজ কিছুই হইল না—নানাভাবের লোকের হাওয়া লাগিয়া উচ্চ ভাব আসিতে পারিল না!” অ—র মা সেই রাত্রি দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করায় রাত্রিকালেও ঠাকুরের বিরক্তির ভাব প্রশমিত হইল না। রাত্রিতে

আহার করিবার কালে একজন স্ত্রীভক্তকে বলিলেন, "এখানে স্ত্রীলোকদিগের এত ভিড় ভাল নয়, মথুর বাবুর পুত্র ত্রৈলোক্য বাবু এখানে রহিয়াছে—কি মনে করিবে বল দেখি? দুই-এক জন মধ্যে মধ্যে আসিলে, এক-আধ দিন থাকিয়া চলিয়া যাইল—তাহা নহে, একেবারে ভিড় লাগিয়া গিয়াছে! স্ত্রীলোকদিগের অত হাওয়া আমি সইতে পারি না।" ঠাকুরের বিরক্তির কারণ হইয়াছেন ভাবিয়া স্ত্রীভক্তগণ সেদিন বিশেষ বিষণ্ণা হইয়াছিলেন এবং রজনী প্রভাত হইলেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। স্নানযাত্রা উপলক্ষে কালীবাটীতে বিশেষ সমারোহে পূজা এবং যাত্রাদি হইয়াছিল, তাঁহারা কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে সেদিন কিছুমাত্র আনন্দ লাভ করিতে পারেন নাই। নিরন্তর উচ্চ ভাবভূমিতে থাকিলেও ঠাকুরের দৈনন্দিন প্রত্যেক ব্যাপারে কতদূর লক্ষ্য ছিল এবং ভক্তদিগের কল্যাণের জন্য তিনি তাহাদিগকে কিরূপে শাসন ও পরিচালনা করিতেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে পাঠক কতকটা বুঝিতে পারিবেন।

একাদশ অধ্যায়

ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন

পাণিহাটি মহোৎসবে যোগদান করিয়া ঠাকুরের গলায় বেদনা বৃদ্ধি হইল। সেদিন মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইয়াছিল। বৃষ্টিতে ভিজিয়া আর্দ্রপদে বহুক্ষণ ভাবাবেশে অতিবাহিত করিবার ফলেই রোগ বাড়িয়াছে বলিয়া ডাক্তার ভক্তগণকে বারম্বার অনুযোগ করিলেন এবং পুনরায় ঐরূপ অত্যাচার হইলে উহা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেও ছাড়িলেন না। ভক্তগণ উহাতে এখন হইতে সতর্ক থাকিতে দৃঢ়সংকল্প করিলেন এবং বালক-স্বভাব ঠাকুর ঐ দিবসের অত্যাচারের সমস্ত দোষ রামচন্দ্রপ্রমুখ কয়েকজন প্রবীণ ভক্তের উপর চাপাইয়া বলিলেন, "উহারা যদি একটু জোর করিয়া আমাকে নিষেধ করিত তাহা হইলে কি আমি পাণিহাটিতে যাইতে পারিতাম।" চিকিৎসা-ব্যবসায়ী না হইলেও রাম বাবু ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে পড়িয়া ডাক্তারী পাশ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব মতের প্রতি অনুরাগবশতঃ পাণিহাটির উৎসবে যাইবার জন্য তিনিই ঠাকুরকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনিই এখন ঐ বিষয়ে সমধিক দোষভাগী বলিয়া বিবেচিত হইলেন। আমাদিগের জনৈক বন্ধু একদিন এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঠাকুর গলদেশে প্রলেপ লাগাইয়া গৃহমধ্যে ছোট তক্তাখানির উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। তিনি বলেন,

পাণিহাটিতে যাইয়া গলায় বেদনা বৃদ্ধি ও বালক-স্বভাব ঠাকুরের আচরণ

"বালককে শাসন করিবার জন্য কোন কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়া একস্থানে আবদ্ধ রাখিলে সে যেমন বিষণ্ণ হইয়া থাকে, ঠাকুরের মুখে অবিকল সেই ভাব দেখিতে পাইলাম। প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হইয়াছে? তিনি তাহাতে গলার প্রলেপ দেখাইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, 'এই ত্যাখ্ না, ব্যথা বাড়িয়াছে, ডাক্তার বেশী কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছে।' বলিলাম, তাই ত মশায়, শুনিলাম সেদিন আপনি পেণেটি গিয়াছিলেন, বোধ হয় সে জন্যই ব্যথাটা বাড়িয়াছে। তিনি তাহাতে বালকের ন্যায় অভিমানভরে বলিতে লাগিলেন, 'হাঁ, ত্যাখ্ দেখি, এই উপরে জল নীচে জল, আকাশে বৃষ্টি—পথে কাদা, আর রাম কিনা আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে সমস্ত দিন নাচিয়ে নিয়ে এলো! সে পাশকরা ডাক্তার, যদি ভাল করে বারণ করতো তা হলে কি আমি সেখানে যাই।' আমি বলিলাম, 'তাই ত মশায়, রামের ভারি অন্যায়। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখন কয়েকটা দিন একটু সাবধানে থাকুন, তাহা হইলেই সারিয়া যাইবে।' শুনিয়া তিনি খুশী হইলেন এবং বলিলেন, 'তা বলে একেবারে কথা বন্ধ করে কি থাকা যায়? এই ত্যাখ্ দেখি—তুই কতদূর থেকে এলি, আর আমি তোর সঙ্গে একটিও কথা কইব না, তা কি হয়?' বলিলাম, 'আপনাকে দেখিলেই আনন্দ হয়, কথা না-ই বা কহিলেন, আমাদের কোন কষ্ট হইবে না—ভাল হউন, আবার কত কথা শুনিব।' কিন্তু সেকথা শুনে কে? ডাক্তারের নিষেধ, নিজের কষ্ট প্রভৃতি সকল বিষয় ভুলিয়া তিনি পূর্ব্বের ন্যায় আমার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।"

ক্রমে আষাঢ় অতীত হইল। মাসাধিক চিকিৎসাধীন থাকিয়াও

ঠাকুরের গলার বেদনার উপশম হইল না। অন্য সময়ে স্বল্প অনুভূত হইলেও একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা প্রভৃতি তিথিতে উহার বিশেষ বৃদ্ধি হইত। তখন কোনরূপ কঠিন খাদ্য ও তরিতরকারি গলাধঃকরণ করা একপ্রকার অসাধ্য হইয়া উঠিত। সুতরাং দুধ ভাত ও সুজির পায়স মাত্র ভোজন করিয়া ঠাকুর ঐ সকল দিন অতিবাহিত করিতেন। ডাক্তারেরা পরীক্ষা-পূর্ব্বক স্থির করিলেন, তাঁহার Clergyman's sore-throat হইয়াছে অর্থাৎ লোককে দিবারাত্র ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে বাগ্‌যন্ত্রের অত্যধিক ব্যবহার হইয়া গলদেশে ক্ষত হইবার উপক্রম হইয়াছে; ধর্ম্মপ্রচারকদিগের ঐরূপ ব্যাধি হইবার কথা চিকিৎসাশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। রোগনির্ণয় করিয়া ডাক্তারেরা ঔষধপথ্যাদির যেরূপ ব্যবস্থা করিলেন, ঠাকুর তাহা সম্যক্ মানিয়া চলিলেও দুইটি বিষয়ে উহার ব্যতিক্রম হইতে লাগিল। প্রগাঢ় ঈশ্বরপ্রেম এবং সংসারতপ্ত জনগণের প্রতি অপার করুণায় অবশ হইয়া তিনি সমাধি ও বাক্যসংযমের দিকে যথাযথ লক্ষ্য রাখিতে সমর্থ হইলেন না। কোনরূপ ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই তিনি দেহবুদ্ধি হারাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন এবং অজ্ঞানান্ধকারে নিপতিত, শোকে তাপে মুহ্যমান জনগণ পথের সন্ধান ও শান্তির প্রয়াসী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র করুণায় আত্মহারা হইয়া তিনি পূর্ব্বের মত তাহাদিগকে উপদেশাদিপ্রদানে কৃতার্থ করিতে লাগিলেন।

গলায় ক্ষত হওয়া ও ডাক্তারের নিষেধ না মানিয়া ঠাকুরের সমীপাগত জনসাধারণকে পূর্ব্ববৎ উপদেশ দান

ঠাকুরের নিকটে এখন ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিসকলের আগমন বড়

স্বল্প হইতেছিল না। পুরাতন ভক্তসকল ভিন্ন পাঁচ-সাত বা ততোধিক নূতন ব্যক্তিকে ধর্ম্মলাভের আশয়ে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার দ্বারে এখন নিত্য উপস্থিত হইতে দেখা যাইত। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুত কেশবের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের কিছুকাল পর হইতে প্রতিদিন ঐরূপ হইতেছিল। সুতরাং লোকশিক্ষা প্রদানের জন্য গত একাদশ বৎসরে ঠাকুরের নিয়মিতকালে স্নান, আহার এবং বিশ্রামের সত্য-সত্যই অনেক সময়ে ব্যাঘাত উপস্থিত হইতেছিল। তদুপরি মহাভাবের প্রেরণায় তাঁহার নিদ্রা স্বল্পই হইত। দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকটে অবস্থানকালে আমরা কত দিন দেখিয়াছি, রাত্রি প্রায় ১১টার সময় শয়ন করিবার অনতিকাল পরেই তিনি উঠিয়া ভাবাবেশে পাদচারণ করিতেছেন —কখন পশ্চিমের, কখন উত্তরের দরজা খুলিয়া বাহিরে যাইতেছেন, আবার কখন বা শয্যাতে স্থির হইয়া শয়ন করিয়া থাকিলেও সম্পূর্ণ জাগ্রত রহিয়াছেন। ঐরূপে রাত্রের ভিতর তিন-চারি বার শয্যাত্যাগ করিলেও রাত্র ৪টা বাজিবামাত্র তিনি নিত্য উঠিয়া শ্রীভগবানের স্মরণ, মনন, নাম-গুণ-গান করিতে করিতে উষার আলোকের অপেক্ষা করিতেন এবং পরে আমাদিগকে ডাকিয়া তুলিতেন। অতএব দিবসে বহু ব্যক্তিকে উপদেশ দিবার অত্যধিক পরিশ্রমে এবং রাত্রের অনিদ্রায় তাঁহার শরীর যে এখন অবসন্ন হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি!

বহু ব্যক্তিকে ধর্ম্মোপদেশ দানের অত্যধিক শ্রম ও মহাভাবে নিদ্রারাহিত্যাদি ব্যাধির কারণ

অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁহার শরীর যে ক্রমে অবসন্ন হইতেছিল, ঠাকুর তদ্বিষয় আমাদিগের কাহাকে না বলিলেও উহার পরিচয়

শ্রীশ্রীজগদম্বার সহিত তাঁহার প্রেমের কলহে আমরা কখন কখন শুনিতে পাইতাম, কিন্তু সম্যক্ বুঝিতে পারিতাম না। পীড়িত হইবার কিছুকাল পূর্ব্বে এক দিবস দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া আমাদিগের জনৈক দেখিয়াছিল, তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া ছোট তক্তাখানির উপর বসিয়া কাহাকে সম্বোধন করিয়া আপন মনে বলিতেছেন, "যত সব এঁদো লোককে এখানে আন্‌বি, এক সের দুধে একেবারে পাঁচ সের জল, ফুঁ দিয়ে জ্বাল ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে আমার চোক্ গেল, হাড় মাটি হল,—অত করতে আমি পারব না, তোর সখ থাকে তুই কর্‌গে যা! ভাল লোক সব নিয়ে আয়, যাদের দুই-এক কথা বলে দিলেই (চৈতন্য) হবে!" অন্য এক দিবসে তিনি সমীপাগত ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, "মাকে আজ বলিতেছিলাম—বিজয়, গিরিশ, কেদার, রাম, মাষ্টার এই কয়জনকে একটু একটু শক্তি দে, যাতে নূতন কেহ আসিলে ইহাদের দ্বারা কতকটা তৈয়ারী হইয়া আমার নিকটে আসে।" ঐরূপে লোকশিক্ষায় সহায়তাপ্রদানের বিষয়ে ভক্তিমতী জনৈকা স্ত্রীভক্তকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "তুই জল ঢাল, আমি কাদা করি।" ধর্ম্মপিপাসুগণের জনতা দক্ষিণেশ্বরে প্রতিদিন বাড়িতেছে দেখিয়া তাঁহার গলদেশে প্রথম বেদনা অনুভবের কয়েক দিন পরে এক দিবস ভাবাবিষ্ট হইয়া তিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে বলিয়াছিলেন, "এত লোক কি আন্‌তে হয়? একেবারে ভিড় লাগিয়ে দিয়েছিস্! লোকের ভিড়ে নাইবার খাবার সময় পাই না! একটা ত এই ফুটো ঢাক

ভাবাবেশ কালে জগন্মাতার সহিত কলহে ঠাকুরের শারীরিক অবসন্নতার কথা প্রকাশ

(নিজ শরীর লক্ষ্য করিয়া), রাতদিন এটাকে বাজালে আর কয়দিন টিকবে ?"

বাস্তবিক, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কলিকাতার জনসাধারণের মধ্যে ঠাকুরের লোকোত্তর ভাব, প্রেম, সমাধি ও অমৃতময়ী বাণীর কথা মুখে মুখে এতদূর প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাঁহার পুণ্যদর্শনলাভের আশয়ে নিত্যই দলে দলে লোক দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইতেছিল এবং যাহারা একবার আসিতেছিল তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই মোহিত হইয়া তদবধি পুনঃ পুনঃ আগমন করিতেছিল। কিন্তু ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ঠাকুরের কণ্ঠপীড়া হইবার পূর্ব্বে ঐরূপে কত লোক তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল তাহার পরিমাণ হওয়া সুকঠিন। কারণ, এক স্থানে একই দিনে তাহাদিগের সকলের একত্রিত হইবার সুযোগ কখনও উপস্থিত হয় নাই। ঐরূপ সুযোগ উপস্থিত না হওয়ায় একপ্রকার ভালই হইয়াছিল, নতুবা আমার পূজ্য দেশপূজ্য হইতেছেন, আমার প্রিয়তমকে সকলে ভালবাসিতেছে ভাবিয়া ঠাকুরের অন্তরঙ্গগণ তাঁহার ভক্তসংখ্যার বৃদ্ধিতে এতদিন যে আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন, তাহা ঐ সংখ্যার বাহুল্যদর্শনে বহু পূর্ব্বে বিষাদ ও ভীতিতে পরিণত হইত; কারণ, তাঁহার নিজমুখে তাঁহারা বারম্বার শ্রবণ করিয়াছিলেন, "অধিক লোক যখন (আমাকে) দেবজ্ঞানে মানিবে, শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে, তখনই ইহার (শরীরের) অন্তর্দ্ধান হইবে।"

দক্ষিণেশ্বরে কত ধর্ম্মপিপাসু উপস্থিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য

তাঁহার দেহরক্ষা করিবার কালনিরূপণ সম্বন্ধে অনেক ইঙ্গিত ঠাকুর সময়ে সময়ে আমাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু

তাঁহার প্রেমে অন্ধ আমরা সে সকল কথা তখন শুনিয়াও শুনি নাই, বুঝিয়াও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। তাঁহার অলৌকিক কৃপা লাভে আমরা যেরূপ ধন্য হইয়াছি, আমাদিগের আত্মীয় বন্ধু ও পরিচিত সকলে তদ্রূপ কৃপা লাভে শান্তির অধিকারী হউক—এই বিষয়েই তখন সকলের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সুতরাং তাঁহার অদর্শনের কথা ভাবিবার অবসর কোথায়? কণ্ঠরোগ হইবার চারি-পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ঠাকুর ঐবিষয়ে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে বলিয়াছিলেন, "যখন যাহার তাহার হস্তে ভোজন করিব, কলিকাতায় রাত্রিযাপন করিব এবং খাদ্যের অগ্রভাগ কাহাকেও প্রদান করিয়া অবশিষ্টাংশ স্বয়ং গ্রহণ করিব, তখন জানিবে দেহরক্ষা করিবার অধিক বিলম্ব নাই।" কণ্ঠরোগ হইবার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে ঘটনাও বাস্তবিক ঐরূপ হইয়া আসিতেছিল। কলিকাতার নানা স্থানে নানা লোকের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া ঠাকুর অন্ন ভিন্ন অপর সকল ভোজ্যপদার্থ যাহার তাহার হস্তে ভোজন করিতেছিলেন—কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক ঘটনাচক্রে শ্রীযুত বলরামের বাটীতে ইতিপূর্ব্বে রাত্রিবাসও মধ্যে মধ্যে করিয়া গিয়াছিলেন এবং অজীর্ণ-রোগে আক্রান্ত হইয়া নরেন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বে এক সময়ে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকটে পথ্যের বন্দোবস্ত হইবে না বলিয়া বহুদিবস না আসিলে, ঠাকুর একদিন তাহাকে প্রাতঃকালে আনাইয়া আপনার জন্য প্রস্তুত ঝোল-ভাতের অগ্রভাগ নরেন্দ্রনাথকে সকাল সকাল ভোজন করাইয়া অবশিষ্টাংশ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী ঐ বিষয়ে আপত্তি করিয়া তাঁহার নিমিত্ত পুনরায় রন্ধন

নিজদেহরক্ষার কালনিরূপণ সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা

করিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "নরেন্দ্রকে অগ্রভাগ প্রদানে মন সঙ্কুচিত হইতেছে না। উহাতে কোন দোষ হইবে না, তোমার পুনরায় রাঁধিবার প্রয়োজন নাই।" শ্রীশ্রীমা বলিতেন, "ঠাকুর ঐরূপে বুঝাইলেও তাঁহার পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া আমার মন খারাপ হইয়া গিয়াছিল।"

লোকশিক্ষাপ্রদানের অত্যধিক পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন হইলেও ঠাকুরের মনের উৎসাহ ঐবিষয়ে কখনও স্বল্প দেখা যায় নাই।

ঠাকুরের শিবজ্ঞানে জীবসেবানুষ্ঠান

অধিকারী ব্যক্তি উপস্থিত হইবামাত্র তিনি কেমন করিয়া প্রাণে প্রাণে উহা বুঝিতে পারিতেন এবং কোন্ এক দৈবশক্তির আবেশে আত্মহারা হইয়া তাহাকে উপদেশ প্রদান এবং স্পর্শাদি করিয়া তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেন। সে যে ভাবের ভাবুক তাঁহার মনে তখন সেই ভাব প্রবল হইয়া অন্য সকল ভাবকে কিছুক্ষণের জন্য প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত এবং উক্ত ভাবে সিদ্ধিলাভ করিবার দিকে ঐ ব্যক্তি কতদূর যাইয়া আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, তাহা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়া তিনি তাহার পথের বাধাসকল সরাইয়া তাহাকে উচ্চতর ভাবভূমিতে আরূঢ় করাইতেন। ঐরূপে দেহ-পাতের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি শিবজ্ঞানে জীবসেবার সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান বলিয়া যাহা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, সেই অভয় পদবীর দিব্য জ্যোতিতে অভিষিক্ত করিয়া আবালবৃদ্ধ-বনিতার জন্মজন্মাগত বাসনাপিপাসা চিরকালের মত মিটাইয়া দিয়াছেন!

লোকের মনের নিগূঢ়ভাব ও সংস্কারসমূহ ধরিবার ক্ষমতা আমরা

তাঁহাতে চিরকাল সমুজ্জ্বল দেখিয়াছি। শরীরের সুস্থতা বা অসুস্থতা তাঁহার মনকে যে কখন স্পর্শ করিত না, উহা তদ্বিষয়ের এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিতে পারা যায়। কিন্তু অপরের অন্তরের রহস্য সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিলেও, নিজ অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিবার জন্য তিনি উহা কখনও প্রকাশ করিতেন না। যখন যতটুকু প্রকাশ করিলে কাহারও যথার্থ কল্যাণ সাধিত হইত, তখন ততটুকু মাত্র প্রকাশপূর্ব্বক তাহাকে উচ্চপথ দেখাইয়া দিতেন। অথবা কোন সৌভাগ্যবানের হৃদয়ে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব অচল অটল করিবার জন্য তাহার নিকটে পূর্ব্বোক্ত শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেন। পাঠকের বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া ঐ বিষয়ক সামান্য একটি দৃষ্টান্ত এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি—

লোকের মনের গূঢ়ভাব ও সংস্কার ধরিবার ঠাকুরের ক্ষমতা

ঠাকুরের কণ্ঠের বেদনাবৃদ্ধি হইয়াছে শুনিয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের শ্রাবণের শেষে আমাদিগের সুপরিচিতা জনৈকা তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছিলেন। পল্লীবাসিনী অন্য এক রমণী ঐ কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ঠাকুরকে দিবার মত আজ বাটীতে দুধ ভিন্ন অন্য কিছু নাই যাহা তোর হাতে পাঠাই; এক ঘটি দুধ লইয়া যাইবি?" পূর্ব্বোক্ত রমণী তাহাতে স্বীকৃতা না হইয়া বলিলেন, "দক্ষিণেশ্বরে ভাল দুধের অভাব নাই, তাঁহার জন্য দুধ বরাদ্দও আছে জানি এবং উহা লইয়া যাওয়াও হাঙ্গাম, অতএব দুধ লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই।"

ঐ বিষয়ক দৃষ্টান্ত

দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া তিনি দেখিলেন, গলার ব্যথার জন্য দুধ-

ভাত ভিন্ন কোনরূপ তরিতরকারি ঠাকুরের খাওয়া চলিতেছে না এবং কোন কারণে গয়লানী সেদিন নিত্য বরাদ্দ দুধ দিতে না পারায় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বিশেষ চিন্তিতা রহিয়াছেন। কলিকাতা হইতে দুধ না লইয়া আসায় তিনি তখন বিশেষ অনুতপ্তা হইলেন এবং পাড়ায় কোনস্থানে দুধ পাওয়া যায় কি না সন্ধান করিতে করিতে জানিতে পারিলেন, ঠাকুরবাটীর অনতিদূরে 'পাঁড়ে গিন্নি' নামে পরিচিতা এক হিন্দুস্থানী রমণীর গাভী আছে এবং সে দুগ্ধ বিক্রয়ও করিয়া থাকে। তাহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া জানিলেন, তাহার সকল দুগ্ধ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে; কেবল দেড়পোয়া আন্দাজ উদ্বৃত্ত থাকায় সে উহা জ্বাল দিয়া রাখিয়াছে। বিশেষ প্রয়োজন বলায় সে ঐ দুগ্ধ তাঁহাকে বিক্রয় করিল এবং তিনি উহা লইয়া আসিলে ঠাকুর উহার সাহায্যেই সেদিন ভাত খাইলেন। আহারান্তে আচমন করিতে উঠিলে তিনি তাঁহার হাতে জল ঢালিয়া দিলেন। অনন্তর ঠাকুর তাঁহাকে সহসা একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো, আমার গলাটায় বড় বেদনা হয়েছে, তুমি রোগ আরাম করিবার যে মন্ত্রটি জান তাহা উচ্চারণ করিয়া একবার হাত বুলাইয়া দাও তো।" রমণী ঐ কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অনন্তর ঠাকুরের অভিপ্রায় মত তাঁহার গলদেশে হাত বুলাইয়া দিবার পরে শ্রীশ্রীমার নিকটে আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি যে ঐ মন্ত্র জানি, উনি একথা কিরূপে জানিতে পারিলেন? ঘোষপাড়ার সম্প্রদায়ভুক্তা কোন রমণীর নিকটে আমি উহা সকাম কর্ম্মসকল সাধনে বিশেষ সিদ্ধিদ জানিয়া বহুপূর্ব্বে শিখিয়া লইয়াছিলাম, পরে নিষ্কাম হইয়া ঈশ্বরকে ডাকাই জীবনের কর্ত্তব্য জানিয়া

উহা ত্যাগ করিয়াছি। জীবনের সকল কথাই ঠাকুরকে বলিয়াছি, কিন্তু কর্ত্তাভজা মন্ত্রগ্রহণের কথা শুনিলে পাছে উনি ঘৃণা করেন ভাবিয়া ঐ বিষয় তাঁহার নিকটে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম—কেমন করিয়া উনি তাহা টের পাইলেন!" শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তাঁহার ঐকথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওগো, উনি সকল কথা জানিতে পারেন, অথচ মনমুখ এক করিয়া সদুদ্দেশ্যে যে যাহা করিয়াছে, তাহার নিমিত্ত তাহাকে কখন ঘৃণা করেন না; তোমার ভয় নাই; আমিও ইঁহার (ঠাকুরের) নিকটে আসিবার পূর্ব্বে ঐ মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম, এখানে আসিয়া ঐকথা উঁহাকে বলায় উনি বলিয়াছিলেন, 'মন্ত্র লইয়াছ তাহাতে ক্ষতি নাই, উহা এখন ইষ্টপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া দাও।'"

ব্যাধির বৃদ্ধিতে ঠাকুরের গলার ক্ষত হইতে রুধির নির্গত হওয়া ও ভক্তগণের তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়নের পরামর্শ

শ্রাবণ যাইয়া ক্রমে ভাদ্রেরও কিছুদিন গত হইল, কিন্তু ঠাকুরের গলার বেদনা ক্রমে বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস দেখা গেল না। ভক্তগণ ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, এমন সময়ে সহসা একদিন এক ঘটনার উদয় হইয়া তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্যের পথ স্পষ্ট দেখাইয়া দিল। বাগবাজার-বাসিনী জনৈকা রমণী সেদিন তাঁহার বাটীতে ভক্তগণকে সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরকে আনিবার তাঁহার বিশেষ আকিঞ্চন ছিল, কিন্তু তাঁহার শরীর অসুস্থ জানিয়া সেই আশা একপ্রকার ত্যাগ করিয়াছিলেন।

তথাপি যদি তিনি কোনরূপে কিছুক্ষণের জন্য একবার বেড়াইয়া যাইতে পারেন ভাবিয়া জনৈক ভক্তকে অনুরোধ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে

প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাত্রি নয়টা হইলেও ঐ ব্যক্তি ফিরিয়া না আসায় আর বিলম্ব না করিয়া তিনি সমবেত ব্যক্তিদিগকে ভোজনে বসাইতেছেন, এমন সময়ে সে সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিল—ঠাকুরের কণ্ঠতালুদেশ হইতে আজ রুধির নির্গত হইয়াছে, সেইজন্য আসিতে পারিলেন না। নরেন্দ্রনাথ, রাম, গিরিশ, দেবেন্দ্র, মাষ্টার (মহেন্দ্র) প্রভৃতি উপস্থিত সকলে বিশেষ চিন্তিত হইলেন এবং পরামর্শে স্থির হইল কলিকাতায় একখানি বাটী ভাড়া লইয়া অচিরে ঠাকুরকে আনয়নপূর্ব্বক চিকিৎসা করাইতে হইবে। ভোজনকালে নরেন্দ্রনাথকে বিষণ্ণ দেখিয়া জনৈক যুবক কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "যাঁহাকে লইয়া এত আনন্দ তিনি বুঝি এইবার সরিয়া যান—আমি ডাক্তারি গ্রন্থ পড়িয়া এবং ডাক্তার বন্ধুগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, ঐরূপ কণ্ঠরোগ ক্রমে 'ক্যান্সারে' (Cancer) পরিণত হয়; অদ্য রক্তপড়ার কথা শুনিয়া রোগ উহাই বলিয়া সন্দেহ হইতেছে; ঐ রোগের ঔষধ এখনও আবিষ্কার হয় নাই।"

ঠাকুরের চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আগমন ও বলরামের ভবনে অবস্থান

পরদিবস ভক্তদিগের মধ্যে প্রবীণ কয়েকজন দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ঠাকুরকে কলিকাতায় থাকিয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি সম্মত হইলেন। বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখার্জ্জি ষ্ট্রীটের ক্ষুদ্র একখানি বাটীর ছাদ হইতে গঙ্গাদর্শন হয় দেখিয়া ভক্তগণ উহা ভাড়া লইয়া অনতিকাল পরে তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। কিন্তু ভাগীরথীতীরে কালীবাটীর প্রশস্ত উদ্যানের মুক্ত বায়ুতে থাকিতে অভ্যস্ত ঠাকুর ঐ স্বল্পপরিসর বাটীতে প্রবেশ করিয়াই ঐ স্থানে বাস করিতে পারিবেন

না বলিয়া তৎক্ষণাৎ পদব্রজে রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটে বলরাম বসুর ভবনে চলিয়া আসিলেন। বলরাম তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং মনোমত বাটী যতদিন না পাওয়া যায় ততদিন তাঁহার নিকটে থাকিতে অনুরোধ করায়, তিনি ঐস্থানে থাকিয়া যাইলেন।

প্রসিদ্ধ বৈদ্যগণকে আনয়ন করিয়া ঠাকুরের রোগ নিরূপণ ও শ্যামপুকুরের বাটী ভাড়া

বাটীর অনুসন্ধান হইতে লাগিল। বৃথা সময় নষ্ট করা বিধেয় নহে ভাবিয়া ভক্তগণ ইতিমধ্যে এক দিবস কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যগণকে আনয়ন করিয়া ঠাকুরের ব্যাধিসম্বন্ধে মতামত গ্রহণ করিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ, গোপীমোহন, দ্বারিকানাথ, নবগোপাল প্রভৃতি অনেকগুলি কবিরাজ সেদিন আহূত হইয়া ঠাকুরকে পরীক্ষা করিলেন এবং তাঁহার রোহিণী নামক দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি হইয়াছে বলিয়া স্থির করিলেন। যাইবার কালে একান্তে জিজ্ঞাসিত হইয়া গঙ্গাপ্রসাদ জনৈক ভক্তকে বলিলেন, "ডাক্তারেরা যাহাকে 'ক্যান্সার' বলে, রোহিণী তাহাই; শাস্ত্রে উহার চিকিৎসার বিধান থাকিলেও উহা অসাধ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।" কবিরাজদিগের নিকটে বিশেষ কোন আশা না পাইয়া এবং অধিক ঔষধ ব্যবহার ঠাকুরের ধাতুতে কোনকালে সহে না জানিয়া, ভক্তগণ তাঁহার হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করানই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। সপ্তাহকালের মধ্যেই শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে অবস্থিত গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বৈঠকখানা-ভবনটি ঠাকুরের থাকিবার জন্য ভাড়া লওয়া হইল এবং কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চিকিৎসাধীনে কিছুদিন তাঁহাকে রাখা সর্ব্ববাদিসম্মত হইল।

এদিকে চিকিৎসার্থ ঠাকুরের কলিকাতা আগমন সহরের সর্ব্বত্র লোকমুখে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং পরিচিত অপরিচিত বহু ব্যক্তি তাঁহার দর্শনমানসে যখন তখন দলে দলে উপস্থিত হইয়া বলরামের ভবনকে উৎসবস্থলের ন্যায় আনন্দময় করিয়া তুলিল। ডাক্তারের নিষেধ ও ভক্তগণের সকরুণ প্রার্থনায় সময়ে সময়ে নীরব থাকিলেও ঠাকুর যেরূপ উৎসাহে তাহাদিগের সহিত ধর্ম্মালাপে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহাতে বোধ হইল তিনি যেন ঐ উদ্দেশ্যেই এখানে আগমন করিয়াছেন, যেন দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত যাওয়া যাহাদের পক্ষে সুগম নহে তাহাদিগকে ধর্ম্মালোকপ্রদানের জন্যই তিনি কিছুকালের জন্য তাহাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন! প্রাতঃকাল হইতে ভোজনকাল পর্য্যন্ত এবং ভোজনান্তে ঘণ্টা দুই আন্দাজ বিশ্রামের পরেই রাত্রির আহার এবং শয়নকাল পর্য্যন্ত প্রতিদিন তিনি ঐ সপ্তাহকাল মধ্যে বহুলোকের ব্যক্তিগত জীবনের জটিল প্রশ্নসকল সমাধান করিয়া দিয়াছিলেন, নানাভাবে ঈশ্বরীয় কথার আলোচনায় বহু ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক পথে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন এবং ভজনসঙ্গীতাদি শ্রবণে গভীর সমাধিরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহু পিপাসুর প্রাণ শান্তি ও আনন্দের প্লাবনে পূর্ণ ও উচ্ছলিত করিয়াছিলেন। সকল দিবস সকল সময়ে উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য আমাদিগের কাহারও ঘটে নাই, গৃহস্বামীকেও ঠাকুরের এবং ভক্তগণের সম্বন্ধে নানা বন্দোবস্ত করিতে অনেক সময়ে স্থানান্তরে ব্যস্ত থাকিতে হইত, সুতরাং ঐ সপ্তাহের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। অতএব কি ভাবে ঠাকুর

ঠাকুরকে দেখিবার জন্য বলরাম ভবনে বহু ব্যক্তির জনতা

বলরামের ভবনে এই কয়দিন যাপন করিয়াছিলেন, তাহা পাঠককে বুঝাইবার জন্য নিম্নে একটিমাত্র ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা নিরস্ত হইব।

আমরা তখন কলেজে পড়িতাম, সুতরাং সপ্তাহের মধ্যে দুই-একদিন মাত্র ঠাকুরকে দেখিতে আসিবার অবসর পাইতাম।

বলরাম ভবনে একদিনের ঘটনা

একদিবস অপরাহ্ণে ঐরূপে বলরামের ভবনে আসিয়া দেখি, দ্বিতলের বৃহৎ ঘরখানি লোকে পূর্ণ ও গিরিশচন্দ্র এবং কালীপদ[১] মহোৎসাহে গান ধরিয়াছেন—

আমায় ধর নিতাই।
আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন।

গৃহমধ্যে কোনরূপে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ঘরের পশ্চিম প্রান্তে পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট থাকিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন। তাঁহার মুখে প্রসন্নতা ও আনন্দের অপূর্ব্ব হাসি, দক্ষিণ চরণ উত্থিত ও প্রসারিত এবং সম্মুখে উপবেশন করিয়া এক ব্যক্তি পরম প্রেমের সহিত ঐ চরণখানি অতি সন্তর্পণে বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ঠাকুরের পদপ্রান্তে যে ঐরূপে উপবিষ্ট রহিয়াছে, তাহার চক্ষু নিমীলিত এবং মুখ ও বক্ষ নয়নধারায় সিক্ত হইতেছে। গৃহ নিস্তব্ধ এবং একটা দিব্যাবেশে জম্ জম্ করিতেছে। গান চলিতে লাগিল—

আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন,
আমায় ধর নিতাই।

১ শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীকালীপদ ঘোষ।

(নিতাই) জীবকে হরিনাম বিলাতে
উঠ্‌ল যে ঢেউ প্রেমনদীতে
সেই তরঙ্গে এখন আমি ভাসিয়ে যাই।
(নিতাই) খত লিখেছি আপন হাতে
অষ্ট সখী সাক্ষী তাতে
(এখন) কি দিয়ে শুধিব আমি প্রেমের মহাজন।
(আমার) সঞ্চিত ধন ফুরাইল
তবু ঋণের শোধ না হ'ল,
প্রেমের দায়ে এখন আমি বিকাইয়ে যাই।

গীত সাঙ্গ হইলে কতক্ষণ পরে ঠাকুর অর্দ্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া সম্মুখস্থ ব্যক্তিকে বলিলেন, "বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।" ঐরূপে উপর্য্যুপরি তিন বার তাহাকে ঐ নাম উচ্চারণ করাইবার কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইয়া অন্যের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া পরে আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম, ঐ ব্যক্তির নাম নৃত্যগোপাল গোস্বামী, ঢাকার কোন কলেজে তিনি অধ্যয়ন করাইয়া থাকেন, ঠাকুরের পীড়ার কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। গোস্বামী যেমন ভক্তিমান্, দেখিতেও তেমনি সুপুরুষ ছিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়—প্রথম পাদ

ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান

ঠাকুরের জন্য যে বাটীখানি এখন ভাড়া লওয়া হইল, উহা পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের উত্তরপার্শ্বে অবস্থিত। উত্তরমুখে বাটীতে প্রবেশ করিয়াই বামে ও দক্ষিণে বসিবার চাতাল ও স্বল্পপরিসর 'রক' দেখা যাইত। উহা ছাড়াইয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই ডাহিনে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি ও সম্মুখে উঠান। উঠানের পূর্ব্বদিকে দুই-তিনখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়াই দক্ষিণভাগে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একখানি লম্বা ঘর, উহাই সর্ব্বসাধারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং বামে পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ঘরগুলিতে যাইবার পথ। উক্ত পথ দিয়া প্রথমেই 'বৈঠকখানা' ঘর নামে অভিহিত সুপ্রশস্ত ঘরখানিতে ঢুকিবার দ্বার—এই ঘরে ঠাকুর থাকিতেন। উহার উত্তরে ও দক্ষিণে বারাণ্ডা, তন্মধ্যে উত্তরের বারাণ্ডা প্রশস্ততর ছিল এবং পশ্চিমে ছোট ছোট দুইখানি ঘর—একখানিতে ভক্ত-দিগের কেহ কেহ রাত্রিতে শয়ন করিত এবং অপরখানি শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর রাত্রিবাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। তদ্ভিন্ন সাধারণের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ঘরখানির পশ্চিমে স্বল্পপরিসর বারাণ্ডা, ঠাকুরের ঘরে যাইবার পথের পূর্ব্বপার্শ্বে ছাদে উঠিবার সিঁড়ি এবং ছাদে যাইবার দরজার পার্শ্বে চারি হাত আন্দাজ লম্বা ও ঐরূপ প্রশস্ত একটি আচ্ছাদনযুক্ত চাতাল ছিল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ঐ চাতালটিতেই

শ্যামপুকুরের বাটীর পরিচয়

সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিতেন এবং ঐ স্থানেই ঠাকুরের জন্য প্রয়োজনীয় পথ্যাদি রন্ধন করিতেন। ভাদ্র মাসের শেষার্দ্ধের কোন সময়ে ইংরেজী ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের প্রারম্ভে ঠাকুর বলরামের বাটী হইতে এখানে আসিয়া কিঞ্চিদধিক তিন মাস কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং অগ্রহায়ণ শেষ হইবার দুই-এক দিন থাকিতে কাশীপুরের বাগানবাটীতে উঠিয়া গিয়াছিলেন।

শ্যামপুকুরের বাটীতে আসিবার কয়েক দিন পরেই ভক্তগণ পূর্ব্বপরামর্শমত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে ঠাকুরের চিকিৎসার্থ আনয়ন করিল। মথুর বাবু জীবিত থাকিবার কালে তাঁহার পরিবারবর্গের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরের সহিত সামান্যভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে অনেক দিনের কথা, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তারের উহা মনে না থাকাই সম্ভব, ঐ জন্য কাহাকে দেখিতে আসিতেছেন তাহা না বলিয়াই ভক্তগণ তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। দেখিবামাত্র তিনি কিন্তু ঠাকুরকে চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং বহু যত্নে পরীক্ষা ও রোগ-নির্ণয়পূর্ব্বক ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিবার পরে দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটী সম্বন্ধীয় কথা ও ধর্ম্মালাপে স্বল্পকাল অতিবাহিত করিয়া তাঁহার নিকটে সেদিন বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যতদূর স্মরণ আছে, ডাক্তার ঐদিন ভক্তগণকে প্রত্যহ প্রাতে ঠাকুরের শারীরিক অবস্থার সংবাদ তাঁহাকে জানাইয়া আসিতে বলিয়াছিলেন এবং যাইবার কালে তাঁহারা তাঁহাকে নিয়মিত পারিশ্রমিক প্রদান করিলে উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিবস ঠাকুরকে

ডাক্তার মহেন্দ্র-লাল সরকারের চিকিৎসার ভার গ্রহণ

দেখিতে আসিয়া যখন তিনি কথায় কথায় জানিতে পারিলেন, ভক্তগণই তাঁহাকে চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আনয়নপূর্ব্বক ব্যয়-নির্ব্বাহ করিতেছে, তখন তাহাদিগের গুরুভক্তিদর্শনে প্রীত হইয়া আর পারিশ্রমিক গ্রহণ করিলেন না—বলিলেন, "আমি বিনা পারিশ্রমিকে যথাসাধ্য চিকিৎসা করিয়া তোমাদিগের সৎকার্য্যে সহায়তা করিব।"

পথ্য ও রাত্রে সেবার বন্দোবস্তের পরামর্শ

ঐরূপে সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের সহায়তালাভ করিয়াও ভক্তগণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। কয়েক দিনের মধ্যেই তাহারা বুঝিতে পারিল বিশেষ সতর্কতার সহিত পথ্য প্রস্তুত করিবার এবং দিবসের ন্যায় রাত্রিকালেও ঠাকুরের আবশ্যক মত সেবা করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করা প্রয়োজন। কেবলমাত্র ব্যয়নির্ব্বাহ করিয়া ঐ দুই অভাবের একটিও যথাযথ নিবারিত হইবার নহে ভাবিয়া তাহারা তখন দক্ষিণেশ্বর হইতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে আনয়নপূর্ব্বক প্রথমটি এবং ঠাকুরের বালক-ভক্তগণের সহায়তায় দ্বিতীয়টি মোচনের পরামর্শ স্থির করিল। ঐ অভাবদ্বয়ের ঐরূপে নিরাকরণের পথে কিন্তু বিষম অন্তরায় দেখা যাইল। কারণ, বাটীতে স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট অন্দরমহল না থাকায় শ্রীশ্রীমা এখানে কিরূপে একাকিনী আসিয়া থাকিবেন তদ্বিষয় বুঝিয়া উঠা দুষ্কর হইল এবং স্কুল-কলেজের ছাত্র বালক-ভক্তগণ ঠাকুরের সেবার নিমিত্ত এখানে আসিয়া নিত্য রাত্র-জাগরণাদি করিলে অভিভাবকদিগের বিষম অসন্তোষের উদয় হইবে, একথা হৃদয়ঙ্গম করিতে কাহারও বিলম্ব হইল না।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অপূর্ব্ব লজ্জাশীলতার কথা স্মরণ করিয়াও ভক্তগণের অনেকে তাঁহার আগমন সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান হইল।

শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর লজ্জাশীলতার দৃষ্টান্ত

দক্ষিণেশ্বর উদ্যানের উত্তরের নহবতখানায় অবস্থান-পূর্ব্বক ঠাকুরের সেবায় নিত্য নিযুক্তা থাকিলেও দুই-চারি জন বালক-ভক্ত ভিন্ন—যাহাদিগের সহিত ঠাকুর স্বয়ং তাঁহাকে পরিচিতা করাইয়া দিয়াছিলেন—অপর কেহ এতকাল কখন তাঁহার শ্রীচরণদর্শন অথবা বাক্যালাপ শ্রবণ করে নাই। ঐ স্বল্পপরিসর স্থানে সমস্ত দিবস থাকিয়া ঠাকুরের ও ভক্তগণের নিমিত্ত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি খাদ্যদ্রব্যসকল দুই বেলা প্রস্তুত করিয়া দিলেও, ঐ স্থানে কেহ যে ঐরূপ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাহা কেহই বুঝিতে পারিত না। রাত্রি ৩টা বাজিবার স্বল্পকাল পরে অন্য কেহ উঠিবার বহু পূর্ব্বে প্রতিদিন শয্যাত্যাগপূর্ব্বক শৌচ-স্নানাদি সমাপন করিয়া তিনি সেই যে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেন, সমস্ত দিবস আর বহির্গত হইতেন না—নীরবে, নিঃশব্দে অদ্ভুত ত্রস্ততার সহিত সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পূজা-জপ-ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতেন। অন্ধকার রাত্রে নহবতখানার সম্মুখস্থ বকুলতলার ঘাটের সিঁড়ি বাহিয়া গঙ্গায় অবতরণ করিবার কালে তিনি একদিবস এক প্রকাণ্ড কুম্ভীরের গাত্রে প্রায় পদার্পণ করিয়াছিলেন—কুম্ভীর ডাঙ্গায় উঠিয়া সোপানের উপর শয়ন করিয়াছিল, তাঁহার সাড়া পাইয়া জলে লাফাইয়া পড়িল! তদবধি সঙ্গে আলো না লইয়া তিনি কখন ঘাটে নামিতেন না।

এতকাল ঐস্থানে থাকিয়াও যিনি ঐরূপে কখন কাহারও দৃষ্টি-মুখে পতিতা হয়েন নাই, সর্ব্বপ্রকার সঙ্কোচ ও লজ্জা সহসা পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি কিরূপে এই বাটীতে পুরুষদিগের মধ্যে

আসিয়া সর্ব্বক্ষণ বাস করিবেন—ইহা ভক্তগণের কেহই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। অথচ উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে আনিবার প্রস্তাব ঠাকুরের নিকট উপস্থিত করিতে বাধ্য হইল। ঠাকুর তাহাতে শ্রীশ্রীমার পূর্ব্বোক্ত প্রকার স্বভাবের কথা স্মরণ করাইয়া বলিলেন, "সে কি এখানে আসিয়া থাকিতে পারিবে? যাহা হউক, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, সকল কথা জানিয়া শুনিয়া সে আসিতে চাহে ত আসুক।" দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকটে লোক প্রেরিত হইল।

শ্রীশ্রীমাকে শ্যামপুকুরে আনিবার প্রস্তাব

'যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাহাকে যেমন তাহাকে তেমন'—ঠাকুর বলিতেন, ঐরূপে দেশকাল-পাত্র-ভেদ বিবেচনাপূর্ব্বক সংসারে সকল বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে এবং আপনাকে না চালাইতে পারিলে শান্তি লাভে, অথবা নিজ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিতে কেহ সমর্থ হয় না। সঙ্কোচ ও লজ্জারূপ আবরণের দুর্ভেদ্য অন্তরালে সর্ব্বথা অবস্থান করিলেও শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী ঠাকুরের নিকটে পূর্ব্বোক্ত উপদেশ লাভ করিয়া নিজজীবন নিয়মিত করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তিনি পূর্ব্ব সংস্কার ও অভ্যাসের আবরণসমূহ হইতে আপনাকে নিষ্ক্রান্ত করিয়া নির্ভয়ে যথাযথ আচরণে কতদূর সমর্থা ছিলেন, তাহা তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে প্রথমাগমনের বিবরণে[১] এবং নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে পাঠকের সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে—

শ্রীশ্রীমার দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী কার্য্য করিবার শক্তি

১ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—সাধকভাব'—বিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

স্বল্পব্যয়সাধ্য যানাভাব, অর্থাভাব প্রভৃতি নানা কারণে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে তৎকালে অনেক সময়ে জয়রামবাটী ও কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে পদব্রজে আসিতে হইত। ঐরূপে আসিতে হইলে জাহানাবাদ (আরামবাগ) পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া পথিকগণকে চারি-পাঁচ ক্রোশব্যাপী তেলোভেলোর মাঠ উত্তীর্ণ হইয়া ৺তারকেশ্বরে, এবং তথা হইতে কৈকলার মাঠ উত্তীর্ণ হইয়া বৈদ্যবাটীতে আসিয়া গঙ্গা পার হইতে হইত। ঐ বিস্তীর্ণ প্রান্তরদ্বয়ে তখন ডাকাইতগণের ঘাঁটি ছিল। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, প্রদোষে অনেক পথিকের এখানে তাহাদিগের হস্তে প্রাণ হারাইবার কথা এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। প্রায় পাশাপাশি অবস্থিত তেলো-ভেলো নামক ক্ষুদ্র গ্রামদ্বয়ের এক ক্রোশ আন্দাজ দূরে প্রান্তরের মধ্যভাগে করালবদনা, সুভীষণা এক ৺কালীমূর্ত্তির এখনও দর্শন মিলিয়া থাকে। জনসাধারণের নিকট ইনি তেলোভেলোর 'ডাকাতে কালী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। লোকে বলে, ইঁহাকে পূজা করিয়া ডাকাইতেরা নরহত্যারূপ নৃশংস কার্য্যে অগ্রসর হইত। ডাকাইতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পথিকেরা ঐসময়ে দলবদ্ধ না হইয়া এই প্রান্তরদ্বয় অতিক্রম করিতে সাহসী হইত না।

কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে আসিবার পথ

ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ রামেশ্বরের কন্যা ও কনিষ্ঠ পুত্র এবং অপর কয়েকটি স্ত্রী-পুরুষের সহিত শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এক সময়ে পদব্রজে কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিতেছিলেন। আরাম-বাগে পৌঁছিয়া তেলোভেলোর প্রান্তর সন্ধ্যার পূর্ব্বে পার হইবার যথেষ্ট সময় আছে ভাবিয়া তাঁহার সঙ্গিগণ ঐ স্থানে অবস্থান ও

রাত্রিযাপনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল। পথশ্রমে ক্লান্তি অনুভব করিলেও শ্রীশ্রীমা তজ্জন্য ঐ বিষয়ে কাহাকেও না বলিয়া তাহাদিগের সহিত অগ্রসর হইলেন। কিন্তু দুই ক্রোশ পথ যাইতে না যাইতেই দেখা গেল, তিনি সঙ্গীদিগের সহিত সমভাবে চলিতে না পারিয়া পিছাইয়া পড়িতেছেন। তখন তাঁহার নিমিত্ত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া এবং তিনি নিকটে আসিলে তাঁহাকে দ্রুত চলিতে বলিয়া তাহারা পুনরায় গন্তব্য পথে চলিতে লাগিল। অনন্তর প্রান্তর মধ্যে আসিয়া তাহারা দেখিল, তিনি আবার সকলের বহু পশ্চাতে ধীরে ধীরে আগমন করিতেছেন। আবার তাহারা তাঁহার নিমিত্ত এখানে অপেক্ষা করিয়া রহিল এবং তিনি নিকটে আসিলে বলিল, এইরূপে চলিলে এক প্রহর রাত্রির মধ্যেও প্রান্তর পার হইতে পারা যাইবে না ও সকলকে ডাকাইতের হস্তে পড়িতে হইবে। এতগুলি লোকের অসুবিধা ও আশঙ্কার কারণ হইয়াছেন দেখিয়া শ্রীশ্রীমা তখন তাহাদিগকে তাঁহার নিমিত্ত পথিমধ্যে অপেক্ষা করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "তোমরা একেবারে ৺তারকেশ্বরের চটিতে পৌঁছিয়া বিশ্রাম কর গে, আমি যত শীঘ্র পারি তোমাদিগের সহিত মিলিত হইতেছি।" বেলা অধিক নাই দেখিয়া এবং তাঁহার ঐকথার উপর নির্ভর করিয়া সঙ্গিগণ আর কালবিলম্ব করিল না, অধিকতর বেগে পথ অতিক্রম-পূর্ব্বক শীঘ্রই দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া যাইল।

শ্রীশ্রীমার পদব্রজে তারকেশ্বরে আগমনকালে ঘটনা

শ্রীশ্রীমা তখন যথাসাধ্য দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন, কিন্তু শরীর নিতান্ত অবসন্ন হওয়ায় তাঁহার প্রান্তরমধ্যে পৌঁছিবার কিছুক্ষণ

পরেই সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। বিষম চিন্তিতা হইয়া তিনি কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন দীর্ঘাকার ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ এক পুরুষ যষ্টি স্কন্ধে লইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছে। তাহার পশ্চাতে দূরে তাহার সঙ্গীর ন্যায় এক ব্যক্তিও আসিতেছে বলিয়া বোধ হইল। পলায়ন বা চীৎকার করা বৃথা বুঝিয়া শ্রীশ্রীমা তখন স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া উহাদিগের আগমন সশঙ্কচিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

তেলোভেলোর প্রান্তরে

কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যে ঐ পুরুষ নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কর্কশস্বরে প্রশ্ন করিল, "কে গা এ সময়ে এখানে দাঁড়াইয়া আছ?" শ্রীশ্রীমা তখন তাহাকে প্রসন্ন করিবার আশয়ে পিতৃসম্বোধন-পূর্ব্বক একেবারে তাহার শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন, "বাবা, আমার সঙ্গিগণ আমাকে ফেলিয়া গিয়াছে, বোধ হয় আমি পথও ভুলিয়াছি, তুমি আমাকে সঙ্গে করিয়া যদি তাহাদিগের নিকটে পৌছাইয়া দাও। তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাটীতে থাকেন, আমি তাঁহার নিকটেই যাইতেছি, তুমি যদি সেখান পর্য্যন্ত আমাকে লইয়া যাও তাহা হইলে তিনি তোমাকে বিশেষ সমাদর করিবেন।" ঐ কথাগুলি বলিতে না বলিতে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় ব্যক্তিও তথায় উপস্থিত হইল এবং শ্রীশ্রীমা দেখিলেন সে পুরুষ নহে রমণী, প্রথমাগত পুরুষের পত্নী। ঐ রমণীকে দেখিয়া বিশেষ আশ্বস্তা হইয়া শ্রীশ্রীমা তখন তাহার হস্তধারণ ও মাতৃ-সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা, সঙ্গীরা ফেলিয়া যাওয়ায় বিষম বিপদে

বাগ্‌দি পাইক ও তাহার পত্নী

পড়িয়াছিলাম ; ভাগ্যে বাবা ও তুমি আসিয়া পড়িলে, নতুবা কি করিতাম বলিতে পারি না।"

শ্রীশ্রীমার ঐরূপ নিঃসঙ্কোচ সরল ব্যবহার, একান্ত বিশ্বাস ও মিষ্ট কথায় বাগ্‌দি পাইক ও তাহার পত্নীর প্রাণ এককালে বিগলিত হইল। সামাজিক আচার ও জাতির কথা ভুলিয়া তাহারা সত্যসত্যই আপনাদিগের কন্যার ন্যায় দেখিয়া তাঁহাকে অশেষ সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিল! পরে তাঁহার শারীরিক অবসন্নতার কথা আলোচনা করিয়া তাহারা তাঁহাকে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে না দিয়া সমীপবর্ত্তী তেলোভেলো গ্রামের এক ক্ষুদ্র দোকানে লইয়া যাইয়া রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত করিল। রমণী নিজ বস্ত্রাদি বিছাইয়া তাঁহার নিমিত্ত শয্যা প্রস্তুত করিল এবং পুরুষ দোকান হইতে মুড়িমুড়কি কিনিয়া তাঁহাকে ভোজন করিতে দিল। ঐরূপে পিতা-মাতার ন্যায় আদর ও স্নেহে তাঁহাকে ঘুম পাড়াইয়া ও রক্ষা করিয়া তাহারা সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিল এবং প্রত্যূষে উঠাইয়া সঙ্গে লইয়া দুই-চারি দণ্ড বেলা হইলে তারকেশ্বরে উপস্থিত হইয়া এক দোকানে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে বলিল। অনন্তর রমণী তাহার স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমার মেয়ে কাল কিছুই খাইতে পায় নাই, বাবার (৺তারকনাথের) পূজাদি শীঘ্রই সারিয়া বাজার হইতে মাছ, তরিতরকারি লইয়া আইস, আজ তাহাকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে হইবে।"

তেলোভেলোয় রাত্রিবাস এবং পাইক ও তাহার পত্নীর যত্ন

পুরুষ ঐসকল কর্ম্ম করিতে চলিয়া যাইলে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণ তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় আসিয়া

উপস্থিত হইল এবং তিনি নিরাপদে পৌঁছিয়াছেন দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল! তখন শ্রীশ্রীমা তাঁহার রাত্রে আশ্রয়দাতা পিতামাতার সহিত তাহাদিগকে পরিচিত করাইয়া বলিলেন, "ইহারা আসিয়া আমাকে না রক্ষা করিলে কাল রাত্রে কি যে করিতাম তাহা বলিতে পারি না।" অনন্তর পূজা, রন্ধন ও ভোজনাদি শেষ করিয়া কিছুক্ষণ ঐস্থানে বিশ্রামপূর্ব্বক সকলে বৈগুবাটী অভিমুখে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলে শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী ঐ পুরুষ ও রমণীকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। শ্রীশ্রীমা বলেন, "এক রাত্রের মধ্যে আমরা পরস্পরকে এতদূর আপনার করিয়া লইয়াছিলাম যে, বিদায় গ্রহণকালে ব্যাকুল হইয়া অজস্র ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। অবশেষে সুবিধামত দক্ষিণেশ্বরে আমাকে দেখিতে আসিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধপূর্ব্বক ঐকথা স্বীকার করাইয়া লইয়া অতি কষ্টে তাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিলাম। আসিবার কালে তাহারা অনেক দূর পর্য্যন্ত আমাদিগের সঙ্গে আসিয়াছিল, এবং রমণী পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্র হইতে কতকগুলি কলাইশুঁটি তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমার অঞ্চলে বাঁধিয়া কাতরকণ্ঠে বলিয়াছিল, 'মা সারদা, রাত্রে যখন মুড়ি খাইবি তখন এইগুলি দিয়া খাস্।' পূর্ব্বোক্ত অঙ্গীকার তাহারা রক্ষা করিয়াছিল। মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া আমাকে দেখিতে মধ্যে মধ্যে কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। উনিও (ঠাকুর) আমার নিকট হইতে সকল কথা শুনিয়া ঐ সময়ে তাহাদিগের সহিত জামাতার ন্যায় ব্যবহারে ও

তারকেশ্বরে পৌঁছিবার পরে ও পাইকের সহিত বিদায় কালে

আদর-আপ্যায়নে তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। এখন সরল ও সচ্চরিত্র হইলেও আমার ডাকাত-বাবা পূর্ব্বে কখন কখন ডাকাইতি যে করিয়াছিল একথা কিন্তু আমার মনে হয়।”

শ্রীশ্রীমা শ্যামপুকুরে আগমনপূর্ব্বক যে ভাবে বাস করিয়াছিলেন

ডাক্তারের উপদেশমত সুপথ্য প্রস্তুত করিবার লোকাভাবে ঠাকুরের রোগবৃদ্ধির সম্ভাবনা হইয়াছে, শুনিবামাত্র শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী আপনার থাকিবার সুবিধা অসুবিধার কথা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া শ্যামপুকুরের বাটীতে আসিয়া ঐ ভার সানন্দে গ্রহণ করিলেন। একমহল বাটীতে, অপরিচিত পুরুষসকলের মধ্যে, সকল প্রকার শারীরিক অসুবিধা সহ্য করিয়া এখানে তিন মাস অবস্থানপূর্ব্বক তিনি যে ভাবে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। স্নানাদি করিবার একটি মাত্র স্থান সকলের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট থাকায় রাত্রি ৩টার পূর্ব্বে শয্যাত্যাগপূর্ব্বক তিনি কখন যে ঐ সকল কর্ম্ম সমাপন করিয়া ত্রিতলে ছাদের সিঁড়ির পার্শ্বস্থ চাতালে উঠিয়া যাইতেন তাহা কেহ জানিতে পারিত না। সমস্ত দিবস তথায় অতিবাহিত করিয়া যথাসময়ে ঠাকুরের নিমিত্ত পথ্যাদি প্রস্তুতপূর্ব্বক তিনি বৃদ্ধ স্বামী অদ্বৈতানন্দ (অধুনা পরলোকগত), অথবা স্বামী অদ্ভুতানন্দের দ্বারা ঐ সংবাদ নিম্নে প্রেরণ করিতেন—তখন সুবিধা হইলে লোক সরাইয়া তাঁহাকে উহা আনয়নপূর্ব্বক ঠাকুরকে খাওয়াইতে বলা হইত, নতুবা আমরাই উহা লইয়া আসিতাম। মধ্যাহ্নে তিনি ঐস্থানে স্বয়ং আহার ও বিশ্রাম করিতেন এবং রাত্রি ১১টার সময় সকলে নিদ্রিত হইলে ঐস্থান হইতে নামিয়া দ্বিতলে তাঁহার নিমিত্ত

নির্দ্দিষ্ট গৃহে আসিয়া রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত শয়ন করিয়া থাকিতেন। ঠাকুরকে রোগমুক্ত করিবার আশায় বুক বাঁধিয়া তিনি দিনের পর দিন ঐরূপে কাটাইয়া দিতেন এবং এরূপ নীরবে নিঃশব্দে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেন যে, যাহারা প্রত্যহ এখানে আসা যাওয়া করিত তাহাদিগের অনেকেও জানিতে পারিত না তিনি এখানে থাকিয়া ঠাকুরের সর্ব্বপ্রধান সেবাকার্য্যের ভারগ্রহণ করিয়া রহিয়াছেন।

পথ্যের বিষয় ঐরূপে মীমাংসিত হইলে রাত্রিকালে ঠাকুরের সেবা করিবার লোকাভাব দূর করিবার জন্য ভক্তগণ মনোনিবেশ করিল। শ্রীযুত নরেন্দ্র তখন ঐ বিষয়ের ভার স্বয়ং গ্রহণপূর্ব্বক রাত্রিকালে এখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং নিজ দৃষ্টান্তে উৎসাহিত করিয়া গোপাল (ছোট), কালী, শশী প্রভৃতি কয়েকজন কর্ম্মঠ যুবক-ভক্তকে ঐরূপ করিতে আকৃষ্ট করিলেন। ঠাকুরের প্রতি প্রেমে তাঁহার অসীম স্বার্থত্যাগ, প্রবল উত্তেজনাপূর্ণ পূত আলাপ ও পবিত্র সঙ্গে তাহারা সকলেও নিজ নিজ স্বার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগুরুর সেবা এবং ঈশ্বরলাভরূপ উচ্চ উদ্দেশ্যে জীবন নিয়মিত করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প করিল। তাহাদিগের অভিভাবকেরা যতদিন ঐকথা বুঝিতে না পারিলেন ততদিন পর্য্যন্ত শ্যামপুকুরের বাটীতে আসিয়া তাহা-দিগের ঠাকুরের সেবা করিবার বিষয়ে আপত্তি করিলেন না। কিন্তু ঠাকুরের রোগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহারা সেবাকার্য্যে সমগ্র প্রাণ ঢালিয়া দিয়া কলেজে অধ্যয়ন এবং নিজ নিজ বাটীতে আহার করিতে যাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করিল, তখন তাঁহাদিগের প্রাণে প্রথমে সন্দেহ এবং পরে আতঙ্ক উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা তাহাদিগকে

বালক ভক্তগণের ঠাকুরের সেবার ভার গ্রহণ

ফিরাইবার জন্য ন্যায্য অন্যায্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত, উত্তেজনা এবং উৎসাহ ভিন্ন তাহারা ঐ সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্যপথে কখনই যে অচল অটল হইয়া থাকিতে পারিত না, একথা বলা বাহুল্য। ঐরূপে শ্যামপুকুরের বাটীতে চারি-পাঁচ জন মাত্র জীবনোৎসর্গ করিয়া এই সেবাব্রত আরম্ভ করিলেও কাশীপুরের উদ্যানে উহার পূর্ণানুষ্ঠানকালে ব্রতধারিগণের সংখ্যা প্রায় চতুর্গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

দ্বাদশ অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান

গৃহী ভক্তগণের সেবার ভার গ্রহণ ও ঠাকুরের ভিতর মধ্যে মধ্যে অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক প্রকাশ দেখা

ঔষধ, পথ্য ও দিবারাত্র সেবার পূর্ব্বোক্তভাবে বন্দোবস্ত হইবার পরে ভক্তগণ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, একথা বলিতে পারা যায় না। কারণ, কলিকাতার প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের মতামত গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহারা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, ঠাকুরের কণ্ঠরোগ এককালে চিকিৎসার অসাধ্য না হইলেও বিশেষ কষ্টসাধ্য সন্দেহ নাই এবং তাঁহার আরোগ্য হওয়া দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত সেবা চালাইবার ব্যয় কিরূপে নির্ব্বাহ হইবে, ইহাই এখন তাঁহাদিগের চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। ঐরূপ হইবারই কথা—কারণ বলরাম, সুরেন্দ্র, রামচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতি যাঁহারা ঠাকুরকে কলিকাতায় আনিয়া চিকিৎসাদির ভার লইয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই ধনী ছিলেন না। নিজ পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্ব্বাহপূর্ব্বক সেবকগণের সহিত ঠাকুরের ভার একাকী বহন করেন, এরূপ সামর্থ্য তাঁহাদিগের কাহারও ছিল না। ঠাকুরের অসাধারণ অলৌকিকত্ব তাঁহাদিগের প্রাণে যে দিব্য আশা, আলোক, আনন্দ ও শান্তির ধারা প্রবাহিত করিয়াছিল, কেবলমাত্র তাহারই প্রেরণায় তাঁহারা ভবিষ্যতের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ পূতধারা যে সর্ব্বক্ষণ একটানে

বহিতে থাকিবে এবং ভবিষ্যতের ভাবনা উহার ভাটার সময়ে তাঁহাদিগকে বিকল করিবে না, একথা বলিতে যাওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক। ফলে ঐরূপ হয়ও নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐরূপ সময় উপস্থিত হইলেই তাঁহারা ঠাকুরের ভিতরে এমন নবীন আধ্যাত্মিক প্রকাশসকল দেখিতে পাইতেন যে, ঐ দুর্ভাবনা কোথায় বিলীন হইয়া যাইত এবং তাঁহাদিগের অন্তর পুনরায় নূতন উৎসাহ ও বলে পূর্ণ হইয়া উঠিত। তখন আনন্দের উদ্দাম উল্লাসে যেন বিচারবুদ্ধির অতীত ভূমিতে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহারা দিব্যালোকে দেখিতে পাইতেন যে, যাঁহাকে তাঁহারা জীবনপথের পরম অবলম্বন স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি কেবলমাত্র অতিমানব নহেন কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের আশ্রয়, জীবকুলের পরমগতি—দেবমানব নারায়ণ! তাঁহার জন্ম, কর্ম্ম, তপস্যা, আহার, বিহার—এমন কি দেহের অসুস্থতা-নিবন্ধন যন্ত্রণাভোগ পর্য্যন্ত সকলই বিশ্বমানবের কল্যাণের নিমিত্ত। নতুবা জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষাদির অতীত সত্যসঙ্কল্প পুরুষোত্তমের দেহের অসুস্থতা কোথায়? সেবাধিকার প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ করিবেন বলিয়াই তিনি অধুনা ব্যাধিগ্রস্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন! দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত গমন করিয়া যাঁহাদিগের তাঁহাকে দর্শন করিবার অবসর ও সুযোগ নাই, তাঁহাদিগের প্রাণে দিব্যালোকের উন্মেষ উপস্থিত করিবার জন্যই তিনি সম্প্রতি তাঁহাদিগের নিকটে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন! পাশ্চাত্য শিক্ষাসম্পন্ন জড়বাদী মানব, যে বিজ্ঞানের ছায়ায় দাঁড়াইয়া আপনাকে নিরাপদ ও সর্ব্বজ্ঞপ্রায় ভাবিয়া ভোগবাসনার তৃপ্তিসাধনকেই জীবনের লক্ষ্য করিতেছে,

ঈশ্বরসাক্ষাৎকারূপ দিব্য বিজ্ঞানের উচ্চতর আলোকে উহার অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রতিপাদনপূর্ব্বক তাহার জীবন ত্যাগের পথে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্যই তিনি এখন ঐরূপ হইয়া রহিয়াছেন!—তবে কেন এই আশঙ্কা, অর্থাভাব হইবে বলিয়া কি জন্য দুর্ভাবনা? যিনি সেবাধিকার প্রদান করিয়াছেন, উহা সম্পূর্ণ করিবার সামর্থ্য তিনিই তাহাদিগকে প্রদান করিবেন।

ভাবুকতার উচ্ছ্বাসে অতিরঞ্জিত করিয়া আমরা উপরোক্ত কথাগুলি বলিতেছি, পাঠক যেন ইহা মনে না করেন। ঠাকুরের সঙ্গগুণে ভক্তগণকে ঐরূপ অনুভব ও আলোচনা করিতে নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়াই আমাদিগকে ঐ সকল কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইতেছে। দেখিয়াছি, অর্থাভাববশতঃ ঠাকুরের সেবার ত্রুটি হইবার আশঙ্কায় মন্ত্রণা করিতে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ভাবের প্রেরণায় আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। কেহ বা বলিয়াছেন, "ঠাকুর নিজের জোগাড় নিজেই করিয়া লইবেন, যদি না করেন তাহাতেই বা ক্ষতি কি? (নিজ বাটী দেখাইয়া) যতক্ষণ ইটের উপরে ইট রহিয়াছে ততক্ষণ ভাবনা কি?—বাটী বন্ধক দিয়া তাঁহার সেবা চালাইব।" কেহ বা বলিয়াছেন, "পুত্রকন্যার বিবাহ বা অসুস্থতা কালে যেরূপে চালাইয়া থাকি সেইরূপে চালাইব, স্ত্রীর গাত্রে দুই-চারি খানা অলঙ্কার যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ভাবনা কি?" আবার কেহ বা মুখে ঐরূপ প্রকাশ না করিলেও আপন সংসারের ব্যয় কমাইয়া অকাতরে ঠাকুরের সেবার ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া ঐ বিষয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ঐরূপ ভাবের প্রেরণাতেই

গৃহী ভক্তগণের ঠাকুরের জন্য স্বার্থত্যাগের কথা

সুরেন্দ্রনাথ বাটীভাড়ার সমস্ত ব্যয় একাকী বহন করিয়াছিলেন এবং বলরাম, রাম, মহেন্দ্র, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি সকলে মিলিত হইয়া ঠাকুরের ও তাঁহার সেবকগণের নিমিত্ত এইকালে যাহা কিছু প্রয়োজন হইয়াছিল সেই সমস্ত যোগাইয়া আসিয়াছিলেন।

ভক্তসঙ্ঘ গঠন করাই ঠাকুরের ব্যাধির কারণ

ভক্তগণ ঐরূপে যে দিব্যোল্লাস প্রাণে অনুভব করিতেন, তাহা এখন ঠাকুরকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট এবং সহানুভূতিসম্পন্ন করিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তসঙ্ঘরূপ মহীরুহ দক্ষিণেশ্বরে অঙ্কুরিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও শ্যামপুকুরে ও কাশীপুর-উদ্যানে উহা নিজ আকার ধারণপূর্ব্বক এত দ্রুত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, ভক্তগণের অনেকে তখন স্থির করিয়াছিলেন, ঐ বিষয়ের সাফল্য আনয়নই ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধির অন্যতম কারণ।

ভক্তগণের ঠাকুরের সম্বন্ধে ধারণার শ্রেণীবিভাগ—যুগাবতার, গুরু, অতিমানব ও দেবমানব

যতই দিন গিয়াছিল ততই ঠাকুরের অসুস্থ হইবার কারণ এবং কতদিনে তাঁহার আরোগ্য হওয়া সম্ভবপর ইত্যাদি বিষয় লইয়া নানা জল্পনা ও বিশ্বাস ভক্তগণের মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে যেন কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। তাঁহার অতীত জীবনের অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনাবলীর আলোচনাই যে উহাদিগের মূলে থাকিয়া ভক্তগণকে অদ্ভুত মীমাংসাসকলে আনয়ন করিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। একদল ভাবিতেন—শুদ্ধ ভাবনা কেন, সকলের নিকটে প্রকাশও করিতেন—যুগাবতার ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধিটা মিথ্যা ভানমাত্র;

উদ্দেশ্যবিশেষ সংসাধনের জন্য তিনি উহা জানিয়া বুঝিয়া অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন; যখনই ইচ্ছা হইবে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় আমাদিগের নিকটে প্রকাশিত হইবেন। বিশাল কল্পনাশক্তি লইয়া শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রই এই দলের নেতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। অন্য একদল বলিতেন, যাঁহার বিরাট্ ইচ্ছার সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া অবস্থান ও সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে ঠাকুর অভ্যস্ত হইয়াছেন, সেই জগদম্বাই জনকল্যাণসাধনকর নিজ গূঢ় অভিপ্রায়-বিশেষ সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাকে কিছুকালের জন্য ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছেন; উহার সম্যক্ রহস্যভেদ ঠাকুরও স্বয়ং করিতে পারিয়াছেন কি না বলা যায় না; তাঁহার ঐ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইলেই ঠাকুর পুনরায় সুস্থ হইবেন। অপর একদল প্রকাশ করিতেন—জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি এ সকল শরীরের ধর্ম্ম, শরীর থাকিলে ঐ সকল নিশ্চয় উপস্থিত হইবে, ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধিও ঐরূপে উপস্থিত হইয়াছে, অতএব উহার একটা অলৌকিক গূঢ় কারণ আছে ভাবিয়া এত জল্পনার প্রয়োজন কি? যত দিন না স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতেছি, তত দিন পর্য্যন্ত ঠাকুর সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ক মীমাংসা আমরা তর্কযুক্তির দ্বারা বিশেষরূপে বিশ্লেষণ না করিয়া গ্রহণ করিতে স্বীকৃত নহি; আমরা তাঁহাকে আরোগ্য করিবার জন্য প্রাণপণে সেবা করিব এবং তিনি মানবজীবনের যে উচ্চাদর্শ সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন, সেই ছাঁচে নিজ নিজ জীবন গঠন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা ও সাধন-ভজনে নিযুক্ত থাকিব। বলা বাহুল্য, শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথই ঠাকুরের যুবকশিষ্যবর্গের প্রতিনিধিস্বরূপে শেষোক্ত মত প্রচার করিতেন।

ঠাকুরের বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট শিষ্যবর্গ তাঁহার সম্বন্ধে ঐরূপ নানা ভাব ও মত পোষণ করিলেও, তাঁহার মহদুদার শিক্ষানুসারে জীবন অতিবাহিত করিলে এবং সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলে তাহাদিগের পরম মঙ্গল হইবে, একথায় পূর্ণ বিশ্বাসবান্ ছিল। ঐজন্যই একদল তাঁহাকে যুগাবতার বলিয়া, অন্যদল গুরু ও অতিমানব বলিয়া এবং অপরদল দেবমানব বলিয়া বিশ্বাস করিলেও তাহাদিগের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব কোনদিন উপস্থিত হয় নাই।

ভক্তগণের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা

যাহা হউক, কিরূপ আধ্যাত্মিক প্রকাশসকল ঠাকুরকে অবলম্বন করিয়া এখন ভক্তগণের নিত্য প্রত্যক্ষগোচর হইতেছিল, পাঠককে উহা বুঝাইবার জন্য আমরা যাহা দেখিয়াছি, এইরূপ কয়েকটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করিব। ঘটনাগুলি ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ ভিন্ন অন্য যে-সকল লোক তাঁহাকে ঐকালে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

ভক্তগণপরিদৃষ্ট ঠাকুরের আধ্যাত্মিক প্রকাশের দৃষ্টান্তসকল

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, ঠাকুরের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়া ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার পরম উৎসাহে তাঁহাকে আরোগ্য করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, বৈকালে ঠাকুরের শরীর কিরূপ থাকে তাহা উপর্য্যুপরি কয়েক দিবস আসিয়া দেখিয়া তিনি ঔষধাদির ব্যবস্থা স্থির করিয়াছিলেন এবং চিকিৎসকের কর্ত্তব্য শেষ করিবার পরে ঐসকল দিবসে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানাপ্রকার প্রসঙ্গে কিছুকাল ঠাকুরের সহিত অতিবাহিত

করিয়াছিলেন। ফলে ঠাকুরের উদার আধ্যাত্মিকতায় তিনি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়া অবসর পাইলেই এখন হইতে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতে ও দুই-চারি ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার মূল্যবান সময়ের এত অধিক ভাগ এখানে কাটাইবার জন্য ঠাকুর একদিন তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইবার উপক্রম করিলে তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওহে, তুমি কি ভাব কেবল তোমারই জন্য আমি এখানে এতটা সময় কাটাইয়া যাই? ইহাতে আমারও স্বার্থ রহিয়াছে। তোমার সহিত আলাপে আমি বিশেষ আনন্দ পাইয়া থাকি। পূর্ব্বে তোমাকে দেখিলেও এমন ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়া তোমাকে জানিবার অবসর ত পাই নাই—তখন এটা করিব, ওটা করিব, ইহা লইয়াই ব্যস্ত থাকা গিয়াছিল। কি জান, তোমার সত্যানুরাগের জন্যই তোমায় এত ভাল লাগে; তুমি যেটা সত্য বলিয়া বুঝ তার একচুল এদিক ওদিক করিয়া চলিতে বলিতে পার না; অন্যস্থলে দেখি তারা বলে এক, করে এক; ঐটে আমি আদৌ সহ্য করিতে পারি না। মনে করিও না, তোমার খোশামুদি করৃচি, এমন চাষা আমি নই; বাপের কুপুত্র!—বাপ অন্যায় কর্‌লে তাঁকেও স্পষ্ট কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না; ঐজন্য আমার দুর্ম্মুখ বলে নামটা খুব রটিয়া গিয়াছে।"

ডাক্তার সরকারের ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ও আচরণ এবং এক দিবসের কথোপকথন

ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তা শুনিয়াছি বটে; কিন্তু এই ত এতদিন এখানে আস্‌চ, আমি ত তার কিছুরই পরিচয় পাইলাম না।"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "সেটা আমাদের উভয়ের সৌভাগ্য! নতুবা অন্যায় বলিয়া কোন বিষয় ঠেকিলে, দেখিতে মহেন্দ্র সরকার চুপ করিয়া থাক্‌বার বান্দা নয়। যাহা হ'ক, সত্যের প্রতি অনুরাগ আমাদের নাই, একথা যেন ভাবিও না। সত্য বলে যেটা বুঝেছি, সেইটা প্রতিষ্ঠা করতেই ত আজীবন ছুটাছুটি করেছি, ঐজন্যই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসারম্ভ, ঐজন্যই বিজ্ঞানচর্চ্চার মন্দিরনির্ম্মাণ—ঐরূপ আমার সকল কাজেই।"

ডাক্তারের সত্যানুরাগে সকল প্রকার অনুষ্ঠান

যতদূর মনে হয়, আমাদিগের মধ্যে কেহ এই সময়ে ইঙ্গিত করিয়াছিল, সত্যানুরাগ থাকিলেও ডাক্তার বাবুর অপরা বিদ্যার শ্রেণীভুক্ত আপেক্ষিক (relative) সত্যাবিষ্কারের দিকেই অনুরাগ—ঠাকুরের কিন্তু পরাবিদ্যার প্রতিই চিরকাল ভালবাসা।

ডাক্তার উহাতে একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "ঐ তোমাদের এক কথা; বিদ্যার আবার পরা, অপরা কি? যা হ'তে সত্যের প্রকাশ হয়, তার আবার উঁচু নীচু কি? আর যদিই একটা ঐরূপ মনগড়া ভাগ কর, তাহা হইলে এটা ত স্বীকার করিতেই হইবে, অপরা বিদ্যার ভিতর দিয়াই পরাবিদ্যা লাভ করিতে হইবে—বিজ্ঞানের চর্চ্চা দ্বারা আমরা যে সকল সত্য প্রত্যক্ষ করি, তাহা হইতেই জগতের আদি কারণের বা ঈশ্বরের কথা আরও বিশেষভাবে বুঝিতে পারি। আমি নাস্তিক বৈজ্ঞানিক ব্যাটাদের ধরিতেছি না! তাদের কথা বুঝিতেই পারি না—চক্ষু থাকিতেও তারা অন্ধ। তবে একথাও যদি কেহ বলেন যে, অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের সবটা তিনি বুঝে ফেলেছেন, তা

অপরা বিদ্যার সহায়ে পরাবিদ্যালাভ

হলে তিনি মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর—তাঁর জন্য পাগলা-গারদের ব্যবস্থা করা উচিত।"

ঠাকুর ডাক্তারের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ঠিক বলেছ, ঈশ্বরের 'ইতি' যারা করে তারা হীনবুদ্ধি, তাদের কথা সহ্য করতে পারি না।"

ঈশ্বরের 'ইতি' করাটা হীন বুদ্ধি

ঐ বলিয়া ঠাকুর আমাদিগের জনৈককে ভক্তাগ্রণী শ্রীরাম-প্রসাদের 'কে জানে মন কালী কেমন, ষড়দর্শনে না পায় দরশন'[১] গীতটি গাহিতে বলিলেন এবং উহা শুনিতে শুনিতে উহার ভাবার্থ মৃদুস্বরে ডাক্তারকে মধ্যে মধ্যে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। 'আমার প্রাণ বুঝেছে মন বোঝে না, ধর্‌বে শশী হয়ে বামন' গীতের এই অংশটি গাহিবার কালে ঠাকুর গায়ককে বাধা দিয়া বলিলেন, "উঁ হুঁ, উল্টোপাল্টা হচ্ছে ; 'আমার মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না'—এইরূপ হইবে ; মন তাঁকে (ঈশ্বরকে) জান্‌তে গিয়ে সহজেই বুঝে যে, অনাদি অনন্ত

মন বুঝে প্রাণ বুঝে না

১ কে জানে মন কালী কেমন।
ষড়দর্শনে না পায় দরশন॥
কালী পদ্মবনে হংস সনে, হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁকে মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন॥
আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রয়োগ লক্ষ এমন।
তারা ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম, অন্য কেবা জানে তেমন॥
প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধুগমন।
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বোঝে না ধর্‌বে শশী হয়ে বামন॥

ঈশ্বরকে ধরা তার কর্ম্ম নয়,' প্রাণ কিন্তু ঐকথা বুঝিতেই চাহে না, সে কেবলি বলে—কি করে আমি তাঁকে পাব।"

ডাক্তার ঐকথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "ঠিক্ বলেছ, মন ব্যাটা ছোট লোক, একটুতেই পারব না, হবে না বলে বসে; কিন্তু প্রাণ ঐকথায় সায় দেয় না বলেই ত যত কিছু সত্যের আবিষ্কার হয়েছে ও হচ্ছে।"

ভাবাবিষ্ট যুবকের নাড়ী পরীক্ষা

গান শুনিতে শুনিতে দুই-একজন যুবকভক্তের ভাবাবেশে বাহ্য-চৈতন্যের লোপ হইতে দেখিয়া ডাক্তার তাহাদের নিকটে যাইয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "মূর্চ্ছিতের ন্যায় বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান নাই বলিয়া বোধ হইতেছে।" বুকে হাত বুলাইয়া মৃদুস্বরে নাম শুনাইবার পরে তাহা-দিগকে পূর্ব্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ হইতে দেখিয়া তিনি ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বলিলেন, "এ সব তোমারই খেলা, বোধ হইতেছে।" ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমার নয় গো, এসব তাঁরি (ঈশ্বরের) ইচ্ছায়। ইহাদের মন এখনও স্ত্রী পুত্র, টাকা কড়ি, মান যশাদিতে ছড়াইয়া পড়ে নাই বলিয়াই তাঁর নামগুণ শ্রবণে তন্ময় হইয়া ঐরূপ হইয়া থাকে।"

বিদ্যার গরম

পূর্ব্ব প্রসঙ্গ পুনরায় উঠাইয়া এইবার ডাক্তারকে বলা হইল, তিনি ঈশ্বরকে মানিলেও এবং তাঁহার 'ইতি' না করিলেও যাঁহারা বিজ্ঞানচর্চ্চায় রত রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একদল ঈশ্বরকে একেবারে উড়াইয়া দেন এবং অপর দল ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তিনি এইরূপ ভিন্ন অপর কোনরূপ হইতে বা করিতে পারেন না, এই কথা উচ্চৈঃস্বরে প্রচার

করিয়া থাকেন। ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ, ঐ কথা অনেকটা সত্য বটে; কিন্তু ওটা কি জান?—ওটা হচ্চে বিদ্যার গরম বা বদহজম—ঈশ্বরের সৃষ্টির দুই-চারিটা বিষয় বুঝিতে পারিয়াছে বলিয়া তারা মনে করে, দুনিয়ার সব ভেদটাই তারা মেরে দিয়েছে। যারা অধিক পড়েছে দেখেছে, ও দোষটা তাদের হয় না; আমি ত ঐ কথা কখনও মনে আনিতে পারি না।"

ঠাকুর তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ, বিদ্যালাভের সঙ্গে সঙ্গে আমি পণ্ডিত, আমি যা জেনেছি বুঝেছি তাহাই সত্য, অপরের কথা মিথ্যা—এইরূপ একটা অহঙ্কার আসে। মানুষ নানা পাশে আবদ্ধ রয়েছে, বিদ্যাভিমান তাহারই ভিতরের একটা; এত লেখাপড়া শিখেও তোমার ঐরূপ অহঙ্কার নাই, ইহাই তাঁর কৃপা।"

পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার

ডাক্তার ঐকথায় উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "অহঙ্কার হওয়া দূরে থাক্, মনে হয় যা জেনেছি বুঝেছি তা যৎসামান্য, কিছু নয় বলিলেই হয়—শিখিবার এত বিষয় পড়িয়া রহিয়াছে, মনে হয়, শুধু মনে কেন, আমি দেখিতে পাই—প্রত্যেক মানুষেই এমন অনেক বিষয় জানে, যাহা আমি জানি না; সেজন্য কাহারও নিকট হইতে কিছু শিখিতে আমার অপমান বোধ হয় না। মনে হয়, ইহাদের নিকটেও (আমাকে দেখাইয়া) আমার শিখিবার মত অনেক জিনিস থাকিতে পারে, ঐ হিসাবে আমি সকলের পায়ের ধুলা লইতেও প্রস্তুত।"

ডাক্তারের নিরভিমানতা

ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "আমিও ইহাদিগকে বলি, (আমাদিগকে দেখাইয়া) 'সখি, যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি!'" পরে ডাক্তারকে দেখাইয়া আমাদিগকে বলিলেন, "কেমন নিরভিমান দেখ্‌ছিস্? ভিতরে মাল (পদার্থ) আছে কিনা, তাই ঐরূপ বুদ্ধি।"

ভিতরে মাল আছে

ঐরূপ নানা কথাবার্ত্তার পরে ডাক্তার সেদিন বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল ঐরূপে দিন দিন ঠাকুরের প্রতি যেমন শ্রদ্ধা ও প্রীতিসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছিলেন, ঠাকুরও তেমনি তাঁহাকে ধর্ম্মপথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য যত্নপর হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন গুণী ব্যক্তির সহিত আলাপেই গুণীর সমধিক প্রীতি জানিয়া ঠাকুর তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ বাছা বাছা লোকসকলকে মধ্যে মধ্যে সুবিদ্বান্ ডাক্তারের সহিত আলাপ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের সহিত পরিচিত হইবার পরে ডাক্তার একদিন 'বুদ্ধচরিতে'র অভিনয় দর্শন করিয়া উহার শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং তৎকৃত অন্য কয়েকখানি নাটকেরও অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। ঐরূপে নরেন্দ্রনাথের সহিত আলাপে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন এবং সঙ্গীতবিদ্যাতেও তাঁহার অধিকার আছে জানিয়া একদিন ভজন শুনাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। উহার কয়েক দিন পরে ডাক্তার একদিবস অপরাহ্ণে ঠাকুরকে দেখিতে আসিলে নরেন্দ্রনাথ

ঠাকুরের ডাক্তারকে ধর্ম্মপথে অগ্রসর করিয়া দিবার চেষ্টা

তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষাপূর্ব্বক দুই-তিন ঘণ্টা কাল তাঁহাকে ভজন শুনাইয়াছিলেন। ডাক্তার সেইদিন উহাতে এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, বিদায়গ্রহণের পূর্ব্বে নরেন্দ্রকে পুত্রের ন্যায় স্নেহে আশীর্ব্বাদ, আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, "এর মত ছেলে ধর্ম্মলাভ করিতে আসিয়াছে দেখিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত; এ একটি রত্ন, যাতে হাত দিবে সেই বিষয়েরই উন্নতিসাধন করিবে।" ঠাকুর উহাতে নরেন্দ্রনাথের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "কথায় বলে অদ্বৈতের হুঙ্কারেই গৌর নদীয়ায় আসিয়াছিলেন, সেইরূপ ওঁর (নরেন্দ্রের) জন্যই তো সব গো!" এখন হইতে ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়া নরেন্দ্রকে সেখানে উপস্থিত দেখিলেই ডাক্তার তাঁহার নিকট হইতে কয়েকটি ভজন না শুনিয়া ছাড়িতেন না।

ঐরূপে ভাদ্র-আশ্বিনের কিয়দংশ অতীত হইয়া ক্রমে ৺দুর্গা-পূজার কাল উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুরের অসুস্থতা ঐ সময়ে কোন কোন দিন কিছু অধিক এবং অন্য সকল দিনে অল্প, এইভাবে চলিয়াছিল। ঔষধে সম্যক্ ফল পাওয়া যাইতেছিল না। ডাক্তার একদিন আসিয়া রোগ বাড়িয়াছে দেখিয়া বলিয়া বসিলেন, "নিশ্চয় পথ্যের কোন অনিয়ম হইতেছে; আচ্ছা বল দেখি, আজ কি কি খাইয়াছ?"

ঔষধে সম্যক্ ফল না পাওয়ায় ডাক্তারের চিন্তা ও আচরণের দৃষ্টান্ত

প্রাতে ভাতের মণ্ড, ঝোল ও দুধ এবং সন্ধ্যায় দুধ ও যবের মণ্ডাদি তরল খাদ্যই ঠাকুর খাইতেছিলেন, সুতরাং ঐ কথাই বলিলেন। ডাক্তার বলিলেন, "তথাপি নিশ্চয় কোন নিয়মের

ব্যতিক্রম হইয়াছিল। আচ্ছা বল ত, কোন্ কোন্ আনাজ দিয়া ঝোল রাঁধা হইয়াছিল?" ঠাকুর বলিলেন, "আলু, কাঁচকলা, বেগুন, দুই-এক টুকরা ফুলকপিও ছিল।"

ডাক্তার বলিলেন, "এঁ্যা—ফুলকপি খেয়েছ? এ ত খাবার-অত্যাচার হয়েছে, ফুলকপি বিষম গরম ও দুষ্পাচ্য। কয় টুকরা খেয়েছ?"

ঠাকুর বলিলেন, "এক টুকরাও খাই নাই, তবে ঝোলে উহা ছিল দেখিয়াছি।"

ডাক্তার বলিলেন, "খাও আর নাই খাও, ঝোলে উহার সত্ত্ব ত ছিল—সেইজন্যই তোমার হজমের ব্যাঘাত হইয়া আজ ব্যারামের বৃদ্ধি হইয়াছে।"

ঠাকুর বলিলেন, "সে কি গো! কপি খাইলাম না, পেটের অসুখও হয় নাই, ঝোলে কপির একটু রস ছিল বলিয়া ব্যারাম বাড়িয়াছে, এ কথা যে আদৌ মনে নেয় না।"

ডাক্তার বলিলেন, "ঐরূপ একটুতে যে কতটা অপকার করিতে পারে তাহা তোমাদের ধারণা নাই। আমার জীবনের একটা ঘটনা বলিতেছি, শুনিলে বুঝিতে পারিবে। আমার হজমশক্তিটা বরাবরই কম; মধ্যে মধ্যে অজীর্ণে খুব ভুগিতে হইত; সেজন্য খাদ্যের সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হইয়া নিয়ম রক্ষা করিয়া সর্ব্বদা চলি। দোকানের কোন জিনিস খাই না; ঘি, তেল পর্য্যন্ত বাড়ীতে করাইয়া লই। তথাচ এক সময়ে বিষম সর্দ্দি হইয়া ব্রন্‌কাইটিস হইল, কিছুতেই সারিতে চায় না। তখন মনে হইল, নিশ্চিত

একটু অত্যাচার অনিয়মে কতটা অপকার হয় তাহার দৃষ্টান্ত

খাবারে কোন প্রকার দোষ হইতেছে। সন্ধান করিয়া উহাতেও কোন প্রকার দোষ ধরিতে পারিলাম না। উহার পরে সহসা একদিন চোখে পড়িল—যে গোরুটার দুধ খাইয়া থাকি, তাহাকে চাকরটা কতকগুলো মাষকড়াই খাওয়াইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, কোনও স্থান হইতে কয়েক মণ ঐ কড়াই পাওয়া গিয়াছিল, সর্দ্দির ভয়ে কেহ খাইতে চাহে না বলিয়া কিছুদিন হইতে উহা গোরুকে খাইতে দেওয়া হইতেছে। মিলাইয়া পাইলাম, যখন হইতে ঐরূপ করা হইয়াছে প্রায় সেই সময় হইতে আমার সর্দ্দি হইয়াছে। তখন গোরুকে ঐ কড়াই খাওয়ান বন্ধ করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্দ্দিও অল্পে অল্পে কমিতে লাগিল। সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইতে সেইবার অনেকদিন লাগিয়াছিল এবং বায়ু-পরিবর্ত্তনাদিতে আমার চারি-পাঁচ হাজার টাকা খরচ হইয়া গিয়াছিল।”

ঠাকুর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “ও বাবা, এ যে তেঁতুলতলা দিয়া গিয়াছিল বলিয়া সর্দ্দি হইল—সেইরূপ!”

সকলে হাসিতে লাগিল। ডাক্তারের ঐরূপ অনুমান করাটা একটু বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ হইলেও, উহাতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া ঐ বিষয়ে আর কোন কথা কেহ উত্থাপন করিল না এবং তাঁহার নিষেধ মানিয়া লইয়া এখন হইতে ঠাকুরের ঝোলে কপি দেওয়া বন্ধ করা হইল।

ঠাকুরের ভালবাসা, সরল ব্যবহার এবং আধ্যাত্মিকতায় ডাক্তারের মন তাঁহার প্রতি ক্রমে কতদূর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছিল, তাহা তাঁহার এক এক দিনের কথায় ও কার্য্যে

বেশ বুঝা যাইত। শুদ্ধ ঠাকুরকে কেন, তদীয় ভক্তগণকেও তিনি এখন ভালবাসার চক্ষে দেখিতেছিলেন এবং ঠাকুরকে লইয়া তাহারা যে একটা মিথ্যা হুজুক করিতে বসে নাই, এবিষয়ে বিশ্বাসবান্ হইয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুরকে তাহারা যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তি বিশ্বাস করিত তাহা তিনি কি ভাবে দেখিতেন তাহা বলা যায় না। বোধ হয় তাঁহার নিকটে উহা কিছু বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইত। অথচ তাহারা যে উহা কোন প্রকার স্বার্থের জন্য অথবা 'লোক-দেখান'র মত করে না তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেন। সুতরাং তাঁহার নিকটে উহা এক বিচিত্র রহস্যের ন্যায় প্রতিভাত হইত বলিয়া বোধ হয়। ভক্তদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়া তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ঐ বিষয়ের সমাধানে নিত্য নিযুক্ত থাকিয়াও ঐ প্রহেলিকাভেদে সমর্থ হয় নাই। কারণ, ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইলেও মানবের ভিতর তাঁহার অসাধারণ শক্তিপ্রকাশ দেখিয়া তাঁহাকে গুরু ও অবতার বলিয়া শ্রদ্ধা-পূজাদি করাটা তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে বুঝিতে পারিতেন না এবং বুঝিতে পারিতেন না বলিয়া উহার বিরোধী ছিলেন। বিরোধের কারণ, সংসারে যাঁহারা অবতার বলিয়া পূজা পাইতেছেন, তাঁহাদের শিষ্য-পরম্পরা তাঁহাদিগের মহিমা প্রচার করিতে যাইয়া বুদ্ধির দোষে কোন কোন বিষয় এমন অতিরঞ্জিত করিয়া ফেলিয়াছেন যে, তাঁহারা স্বরূপতঃ কীদৃশ ছিলেন লোকের তাহা ধরা-বুঝা এখন একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ঐ প্রসঙ্গে ডাক্তার একদিন ঠাকুরের সম্মুখে স্পষ্ট বলিয়াও ছিলেন, "ঈশ্বরকে ভক্তি-পূজাদি যাহা বল তাহা বুঝিতে

ডাক্তারের ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধার বৃদ্ধি ও ভক্তগণের প্রতি ভালবাসা

পারি, কিন্তু সেই অনন্ত ভগবান্ মানুষ হইয়া আসিয়াছেন—এই কথা বলিলেই যত গোল বাধে। তিনি যশোদানন্দন, মেরীনন্দন, শচীনন্দন হইয়া আসিয়াছেন, এই কথা বুঝা কঠিন—ঐ নন্দনের দলই দেশটাকে উচ্ছন্ন দিয়াছে!" ঠাকুর ঐ কথায় হাসিয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "এ বলে কি? তবে হীনবুদ্ধি গোঁড়ারা অনেক সময় তাঁহাকে বাড়াইতে যাইয়া ঐরূপ করিয়া ফেলে বটে।"

অবতার সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত মত প্রকাশের জন্য ডাক্তারের সঙ্গে গিরিশচন্দ্র ও নরেন্দ্রনাথের সময়ে সময়ে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছিল। ফলে, উহার বিপরীতে অনেক যুক্তিগর্ভ কথা বলা যাইতে পারে, ইহা প্রতিপন্ন হওয়ায় ঐরূপ একান্ত বিরোধী মত সহসা প্রকাশ করিতে তিনি সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু তর্কে যাহা হয় নাই, ঠাকুরের মনের অলৌকিক মাধুর্য্য ও প্রেম এবং তাঁহার ভিতর হইতে যে অদৃষ্টপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক প্রকাশ ডাক্তারের সময়ে সময়ে নয়নগোচর হইতেছিল, তাহা দ্বারা সেই বিষয় সংসিদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার ঐরূপ মত ধীরে ধীরে অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ঐবৎসর ৺দুর্গাপূজার সন্ধিক্ষণে যে অলৌকিক বিভূতিপ্রকাশ ঠাকুরের ভিতরে সহসা উপস্থিত হইতে আমরা সকলে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম,[১] ডাক্তার সরকারও উহা দেখিবার ও পরীক্ষা করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। তিনি সেই দিন অপর এক ডাক্তার বন্ধুর সহিত তথায় উপস্থিত থাকিয়া ভাবাবেশকালে ঠাকুরের হৃদয়ের স্পন্দনাদি যন্ত্রসাহায্যে পরীক্ষা

ডাক্তারের অবতার সম্বন্ধীয় মত ও তাহার প্রতিবাদ—৺দুর্গাপূজাকালে ঠাকুরের ভাবাবেশ দর্শনে ডাক্তারের বিস্ময়

১ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—সাধকভাব,' ৮ম অধ্যায়

করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ডাক্তার বন্ধু ঠাকুরের উন্মীলিত নয়ন সঙ্কুচিত হয় কি না দেখিবার জন্য তন্মধ্যে অঙ্গুলী প্রদান করিতেও ত্রুটি করেন নাই। ফলে হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল, বাহিরে দেখিতে সম্পূর্ণ মৃতের ন্যায় প্রতীয়মান ঠাকুরের এই সমাধি অবস্থা সম্বন্ধে বিজ্ঞান কোনরূপ আলোক এখনও প্রদান করিতে পারে নাই; পাশ্চাত্য দার্শনিক উহাকে জড়ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ ও ঘৃণা প্রকাশপূর্ব্বক নিজ অজ্ঞতা ও ইহসর্ব্বস্বতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; ঈশ্বরের সংসারে এমন অনেক বিষয় বিদ্যমান, যাহাদের রহস্যভেদ দর্শন-বিজ্ঞান কিছুমাত্র করিতে সক্ষম হয় নাই—কোনও কালে পারিবে বলিয়াও বোধ হয় না। বাহিরে মৃতের ন্যায় অবস্থিত হইয়া ঠাকুর সেদিন ঐকালে যাহা দর্শন বা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা কতদূর বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া ভক্তগণ মিলাইয়া পাইয়াছিল, সে-সকল কথা আমরা অন্যত্র উল্লেখ করায় উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

আশ্বিন অতীত হইয়া কার্ত্তিক এবং শ্রীশ্রীকালীপূজার দিন ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইল, কিন্তু ঠাকুরের শারীরিক অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি দেখা গেল না। চিকিৎসার প্রথমে যে ফল পাওয়া গিয়াছিল, তাহা দিন দিন নষ্ট হওয়ায় ব্যাধি প্রবলভাব ধারণ করিবে বলিয়া আশঙ্কা হইতে লাগিল। ঠাকুরের মনের আনন্দ ও প্রসন্নতা কিছুমাত্র হ্রাস না হইয়া বরং অধিকতর বলিয়া ভক্তগণের নিকটে প্রতিভাত হইল। ডাক্তার সরকার পূর্ব্বের ন্যায় ঘন ঘন যাতায়াত ও পুনঃ পুনঃ ঔষধ পরিবর্ত্তন করিয়াও আশানুরূপ ফল না পাইয়া ভাবিতে লাগিলেন ঋতু পরিবর্ত্তনের জন্য

রোগবৃদ্ধি

ঐরূপ হইতেছে, শীতটা একটু চাপিয়া পড়িলেই বোধ হয় ঐ ভাবটা কাটিয়া যাইবে।

দুর্গাপূজার ন্যায় কালীপূজার সময়েও ঠাকুরের ভিতরে অদ্ভুত আধ্যাত্মিক প্রকাশ ভক্তগণের নয়নগোচর হইয়াছিল।

৺কালীপূজা দিবসে ঠাকুরের অদ্ভুত ভাবাবেশের বিবরণ

দেবেন্দ্রনাথ কোন সময়ে প্রতিমা আনয়নপূর্ব্বক কালীপূজা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তগণের সম্মুখেই ঐ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে পরম আনন্দ হইবে ভাবিয়া, তিনি শ্যামপুকুরের বাটীতে উক্ত পূজা করিবার কথা পাড়িলেন। কিন্তু পূজার উৎসাহ, উত্তেজনা ও গোলমালে ঠাকুরের শরীর অধিকতর অবসন্ন হইবে ভাবিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে ঐরূপ কার্য্য হইতে বিরত হইবার পরামর্শ প্রদান করিল। দেবেন্দ্র ভক্তগণের কথা যুক্তিযুক্ত ভাবিয়া ঐ সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। ঠাকুর কিন্তু পূজার পূর্ব্ব দিবসে কয়েকজন ভক্তকে সহসা বলিয়া বসিলেন, "পূজার উপকরণসকল সংক্ষেপে সংগ্রহ করিয়া রাখিস্—কাল কালীপূজা করিতে হইবে।" তাহারা তাঁহার ঐ কথায় আনন্দিত হইয়া অন্য সকলের সহিত ঐ বিষয়ে পরামর্শ করিতে বসিল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি ভিন্ন পূজার আয়োজন সম্বন্ধে অন্য কোন কথা ঠাকুরের নিকটে না পাওয়ায় কি ভাবে উহা সম্পন্ন করিতে হইবে তদ্বিষয় লইয়া নানা জল্পনা তাহাদিগের মধ্যে উপস্থিত হইল। পূজা, ষোড়শোপচারে অথবা পঞ্চোপচারে হইবে, উহাতে অন্নভোগ দেওয়া হইবে কি না, পূজকের পদ কে গ্রহণ করিবে ইত্যাদি বিষয়ের কোন মীমাংসা না করিতে পারিয়া অবশেষে স্থির হইল, গন্ধ-পুষ্প,

ধূপ-দীপ, ফলমূল এবং মিষ্টান্নমাত্র সংগ্রহ করিয়া রাখা হউক, পরে ঠাকুর যেরূপ বলেন, করা যাইবে। কিন্তু সেই দিবস এবং পূজার দিনের অর্দ্ধেক অতীত হইলেও ঠাকুর ঐ সম্বন্ধে আর কোন কথা তাহাদিগকে বলিলেন না।

ক্রমে সূর্য্যাস্ত হইয়া রাত্রি প্রায় ৭টা বাজিয়া গেল। ঠাকুর তখনও তাহাদিগকে পূজা সম্বন্ধে কিছুই না বলিয়া অন্য দিবসের ন্যায় স্থিরভাবে শয্যায় বসিয়া আছেন দেখিয়া তাহারা তাঁহার সন্নিকটে পূর্ব্বদিকের কতকটা স্থান মার্জ্জন করিয়া সংগৃহীত দ্রব্যসকল আনিয়া রাখিতে লাগিল। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে গন্ধপুষ্পাদি পূজোপকরণ লইয়া ঠাকুর কখন কখন আপনাকে আপনি পূজা করিতেন। ভক্তগণের কেহ কেহ উহা দেখিয়াছিল। অদ্যও সেইরূপে তিনি নিজ দেহমনরূপ প্রতীকাবলম্বনে জগচ্চৈতন্য ও জগচ্ছক্তি-রূপিণীর পূজা করিবেন, অথবা ৺জগদম্বার সহিত অভেদজ্ঞানে শাস্ত্রোক্ত আত্মপূজা সম্পন্ন করিবেন, তাহারা পরিশেষে এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিল। সুতরাং পূজোপকরণসকল তাহারা এখন ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে পূর্ব্বোক্তরূপে সাজাইয়া রাখিবে, ইহা বিচিত্র নহে। ঠাকুর তাহাদিগকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া কোনরূপ অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না।

পূজার আয়োজন

ক্রমে সকল উপকরণ আনয়ন করা হইল এবং ধূপ-দীপসকল প্রজ্বালিত হওয়ায় গৃহ আলোকময় ও সৌরভে আমোদিত হইল। ঠাকুর তখনও স্থির হইয়া বসিয়া আছেন দেখিয়া ভক্তগণ এখন তাঁহার নিকটে উপবেশন করিল এবং কেহ বা তাঁহার আদেশ

প্রতীক্ষা করিয়া একমনে তাঁহাকে দেখিতে এবং কেহ বা জগজ্জননীর চিন্তা করিতে লাগিল। ঐরূপে গৃহ এককালে নীরব এবং ত্রিশ বা ততোধিক ব্যক্তি উহার অন্তরে অবস্থান করিলেও জনশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কতক্ষণ ঐরূপে অতীত হইল, ঠাকুর কিন্তু তখনও স্বয়ং পূজা করিতে অগ্রসর হওয়া অথবা আমাদিগের কাহাকেও ঐ বিষয়ে আদেশ করা, কিছুই না করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া রহিলেন।

ঠাকুরের নীরবে অবস্থান

যুবক ভক্তগণের সহিত মহেন্দ্রনাথ, রামচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি প্রবীণ ব্যক্তিসকল উপস্থিত ছিলেন—তন্মধ্যে গিরিশচন্দ্রের 'পাঁচসিকে পাঁচ আনা' বিশ্বাস[১] বলিয়া—ঠাকুর কখন কখন নির্দ্দেশ করিতেন। পূজা সম্বন্ধে ঠাকুরকে ঐরূপ ব্যবহার করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের অনেকে এখন বিস্মিত হইতে লাগিলেন। ঠাকুরের প্রতি অসীম বিশ্বাসবান্ গিরিশচন্দ্রের প্রাণে কিন্তু উহাতে অন্যভাবের উদয় হইল। তাঁহার মনে হইল, আপনার জন্য ঠাকুরের ৺কালীপূজা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যদি বল, অহেতুকী ভক্তির প্রেরণায় তাঁহার পূজা করিবার ইচ্ছা হইয়াছে—তাহা হইলে উহা না করিয়া এরূপে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন কেন? অতএব তাহাও বোধ হইতেছে না; তবে কি তাঁহার শরীররূপ জীবন্ত প্রতিমায় জগদম্বার পূজা করিয়া ভক্তগণ ধন্য হইবে বলিয়া এই পূজায়োজন?

গিরিশচন্দ্রের মীমাংসা ও ঠাকুরের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান—ঠাকুরের ভাবাবেশ

১ অর্থাৎ—ষোল-আনার উপর চারি-পাঁচ আনা অধিক বিশ্বাস।

—নিশ্চয় তাহাই। ঐরূপ ভাবিয়া তিনি উল্লাসে অধীর হইলেন এবং সম্মুখস্থ পুষ্পচন্দন সহসা গ্রহণপূর্ব্বক 'জয় মা' বলিয়া ঠাকুরের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। ঠাকুরের সমস্ত শরীর উহাতে শিহরিয়া উঠিল এবং তিনি গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় এবং দিব্য হাস্যে বিকশিত হইয়া উঠিল এবং হস্তদ্বয় বরাভয়-মুদ্রা ধারণপূর্ব্বক তাঁহাতে ৺জগদম্বার আবেশের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল! এত অল্পকালের মধ্যে এই সকল ঘটনা উপস্থিত হইল যে, পার্শ্ববর্ত্তী ভক্তগণের অনেকে ভাবিল ঠাকুরকে ঐরূপ ভাবাবিষ্ট হইতে দেখিয়াই গিরিশ তাঁহার শ্রীপদে বারম্বার অঞ্জলি প্রদান করিতেছেন এবং যাহারা কিঞ্চিদ্দূরে ছিল তাহারা দেখিল যেন ঠাকুরের শরীরাবলম্বনে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী-প্রতিমা সহসা তাহাদিগের সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়াছেন!

ভাবাবিষ্ট ঠাকুরকে ভক্তগণের পূজা

বলা বাহুল্য, ভক্তগণের প্রাণে এখন উল্লাসের অবধি রহিল না। তাহারা প্রত্যেকে কোনরূপে পুষ্পপাত্র হইতে ফুলচন্দন গ্রহণ করিয়া যাহার যেরূপ ইচ্ছা মন্ত্র উচ্চারণ ও ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম পূজাপূর্ব্বক 'জয় জয়' রবে গৃহ মুখরিত করিয়া তুলিল। কতক্ষণ ঐরূপে গত হইলে ভাবাবেশের উপশম হইয়া ঠাকুরের অর্দ্ধবাহ্য অবস্থা উপস্থিত হইল। তখন পূজার নিমিত্ত সংগৃহীত ফলমূলমিষ্টান্নাদি পদার্থসকল তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে খাইতে দেওয়া হইল। তিনিও ঐ সকলের কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া ভক্তি ও জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য ভক্তগণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তাহারা সকলে প্রাণের

উল্লাসে ৺দেবীর মহিমা কীর্ত্তন ও নামগুণ-গানে অতিবাহিত করিল।

ঐরূপে ভক্তগণ সেই বৎসর অভিনব প্রণালীতে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজা করিয়া যে অভূতপূর্ব্ব উল্লাস অনুভব করিয়াছিল তাহা চিরকালের নিমিত্ত তাহাদিগের প্রাণে জাগরূক হইয়া রহিয়াছে এবং দুঃখ-দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়া যখনই তাহারা অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে তখনই ঠাকুরের সেই দিব্যহাস্যফুল্ল প্রসন্ন আনন ও বরাভয়যুক্ত করদ্বয় তাহাদিগের সম্মুখে উদিত হইয়া তাহাদিগের জীবন সর্ব্বথা 'দেবরক্ষিত', এই কথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুরের ভিতরে দিব্যশক্তি ও দেব-ভাবের পরিচয় ভক্তগণ পূর্ব্বোক্তরূপে কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ পর্ব্বকালেই যে পাইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু সহসা যখন তখন তাঁহাতে ঐরূপ ভাবের বিকাশ দেখিবার অবসর লাভ করিয়া তাঁহার প্রতি তাহাদের দেবমানব বলিয়া বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। ঐ ভাবের ঘটনাসকল ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত ঘটনাগুলির ন্যায় অনেক সময়ে সকলের সমক্ষে উপস্থিত না হইলেও, ভক্তগণের মধ্যে যাহারা উহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল অগ্রে তাহাদিগের প্রাণে এবং পরে তাহাদিগের নিকটে শুনিয়া অপর সকলের প্রাণে পূর্ব্বোক্ত ফলের উদয় করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপে কয়েকটির এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠকের ঐ বিষয় বোধগম্য হইবে—

পর্ব্ববিশেষ ভিন্ন অন্য সময়ে ভক্তগণের ঠাকুর সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্ত

বলরামের সম্বন্ধে কোন কোন কথা আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। তিনি এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন বলিয়া তাঁহার আত্মীয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার প্রতি বিরূপ ছিলেন। ঐরূপ হইবার তাঁহাদিগের কারণও যথেষ্ট ছিল। প্রথমতঃ, তাঁহারা বৈষ্ণব বংশে জন্মগ্রহণ করায় প্রচলিত শিক্ষা-দীক্ষানুসারে তাঁহাদিগের ধর্ম্মমত যে কতকটা একদেশী এবং অতিমাত্রায় বাহ্যাচারনিষ্ঠ হইবে ইহা বিচিত্র নহে। সুতরাং সকল প্রকার ধর্ম্মমতের সত্যতায় স্থির-বিশ্বাসসম্পন্ন, বাহ্যচিহ্নমাত্র ধারণে পরাঙ্মুখ ঠাকুরের ভাব তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না—ঐরূপ করিবার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করিতেন না। অতএব ঠাকুরের সঙ্গগুণে এবং কৃপালাভে বলরামের দিন দিন উদারভাবসম্পন্ন হওয়াটা তাঁহারা ধর্ম্মহীনতার পরিচায়ক বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ—ধন, মান, আভিজাত্যাদি পার্থিব প্রাধান্য মানবের অন্তরে প্রায় অভিমান-অহঙ্কারই পরিপুষ্ট করে। পুণ্যকীর্ত্তি ৺কৃষ্ণরাম বসু যে কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সেই কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারাও আপনাদিগকে সমধিক মহিমান্বিত জ্ঞান করিতেন। ঐ বংশমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া বলরাম ইতরসাধারণের ন্যায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে ধর্ম্মলাভের জন্য যখন তখন উপস্থিত হইতেছেন এবং আপন স্ত্রী-কন্যা প্রভৃতিকেও তথায় লইয়া যাইতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগের অভিমান যে বিষম প্রতিহত হইবে, একথা বলা বাহুল্য। অতএব ঐ কার্য্য হইতে তাঁহাকে

ঠাকুরকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করায় বলরামের আত্মীয়বর্গের অপ্রসন্নতা

প্রতিনিবৃত্ত করিতে তাঁহাদিগের বিষম আগ্রহ এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছিল।

সৎ উপায় অবলম্বনে কার্য্যসিদ্ধি না হইলে অহঙ্কৃত মানবকে অসদুপায় গ্রহণ করিতে অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়। বলরামের আত্মীয়বর্গের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির প্রায় ঐরূপ অবস্থা হইয়াছিল। কালনার ভগবান-দাসপ্রমুখ বৈষ্ণব বাবাজীদিগের নিষ্ঠা ও ভক্তি-প্রেমের আতিশয্য কীর্ত্তন করিয়া এবং আপনা-দিগের বংশগৌরবের কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিয়াও যখন তাঁহারা বলরামের ঠাকুরের নিকটে গমন নিবারণ করিতে পারিলেন না, তখন ঠাকুরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া তাঁহারা কখন কখন তাঁহার অযথা নিন্দাবাদ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিলেন না। অবশ্য, অপরের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াই যে তাঁহারা ঠাকুরকে নিষ্ঠাপরিশূন্য, সদাচারবিরহিত, খাদ্যাখাদ্য-বিচার-বিহীন, কণ্ঠী তিলকাদি বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণের বিরোধী ইত্যাদি বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন, একথা বলিতে হইবে। যাহা হউক, উহাতেও কোন ফলোদয় হইল না দেখিয়া তাঁহারা অবশেষে ঠাকুরের ও বলরামের সম্বন্ধে নানা কথার বিকৃত আলোচনা তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতৃদ্বয় ৺নিমাইচরণ ও ৺হরিবল্লভ বসুর কর্ণে উত্থাপিত করিতে লাগিলেন।

বলরামের ঠাকুরের নিকট গমন নিবারণে তাঁহাদিগের চেষ্টা

আমরা ইতিপূর্ব্বে একস্থলে বলিয়াছি, বলরামের ভিতরে দয়া ও ত্যাগবৈরাগ্যের ভাব বিশেষ প্রবল ছিল। জমিদারী প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে অনেক সময় নির্ম্মম হইয়া নানা হাঙ্গামা না করিলে

চলে না দেখিয়া, তিনি নিজ বিষয়সম্পত্তির ভার নিমাই বাবুর উপরে সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে প্রতি মাসে আয়স্বরূপে যাহা পাইতেন অনেক সময়ে উহা পর্য্যাপ্ত না হইলেও তাহাতেই কোনরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার শরীরও ঐ সকল কর্ম্ম করিবার উপযোগী ছিল না। যৌবনে অজীর্ণ রোগে উহা এক সময়ে এতদূর স্বাস্থ্যহীন হইয়াছিল যে, একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসর অন্ন ত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে যবের মণ্ড ও দুগ্ধ পান করিয়া কাটাইতে হইয়াছিল। ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তিনি ঐ সময়ের অনেক কাল পুরীধামে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের নিত্য দর্শন, পূজা, জপ, ভাগবতাদি শাস্ত্র শ্রবণ এবং সাধুসঙ্গাদি কার্য্যেই তাঁহার তখন দিন কাটিত এবং ঐরূপে তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভিতরে ভাল ও মন্দ যাহা কিছু ছিল সেই সকলের সহিত সুপরিচিত হইবার বিশেষ অবসর ঐকালে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে কার্য্যানুরোধে কলিকাতায় আসিবার কিছুকাল পরেই ঠাকুরের দর্শন ও পূতসঙ্গে তাঁহার জীবন কিরূপে দিন দিন পরিবর্ত্তিত হয়, তদ্বিষয়ের আভাস আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রদান করিয়াছি।

বলরামের পূর্ব্বজীবন

প্রথমা কন্যার বিবাহ দানের কালে বলরামকে কয়েক সপ্তাহের জন্য কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। নতুবা ৺পুরীধামে অতিবাহিত পূর্ণ একাদশ বৎসরের ভিতর তাঁহার জীবনে অন্য কোন প্রকারে শান্তিভঙ্গ হয় নাই। ঐ ঘটনার কিছুকাল পরেই তাঁহার ভ্রাতা হরিবল্লভ বসু রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটস্থ ৫৭ নং ভবন ক্রয় করিয়াছিলেন এবং সাধুদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবশতঃ পাছে বলরাম

সংসার পরিত্যাগ করেন, এই ভয়ে তাঁহার পিতা ও ভ্রাতৃগণ গোপনে পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে ঐ বাটীতে বাস করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ঐরূপে সাধুদিগের পূতসঙ্গ ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিত্যদর্শনে বঞ্চিত হইয়া বলরাম ক্ষুণ্ণমনে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। এখানে কিছুদিন থাকিয়া পুনরায় পুরীধামে কোন প্রকারে চলিয়া যাইবেন, বোধ হয় পূর্ব্বে তাঁহার এরূপ অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু ঠাকুরের দর্শনলাভের পরে ঐ সঙ্কল্প এককালে পরিত্যাগ করিয়া তিনি ঠাকুরের নিকটে কলিকাতায় স্থায়িভাবে বসবাসের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং পাছে হরিবল্লভ বাবু তাঁহাকে উক্ত বাটী খালি করিয়া দিতে বলেন, অথবা নিমাই বাবু বিষয়সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করিবার জন্য তাঁহাকে কোঠারে আহ্বানপূর্ব্বক ঠাকুরের পুণ্যসঙ্গে বঞ্চিত করেন, এই ভয়ে তাঁহার অন্তর এখন সময়ে সময়ে বিশেষ ব্যাকুল হইত।

বলরামের কলিকাতায় আগমন ও ঠাকুরকে দর্শন

অন্তরের চিন্তা সময়ে সময়ে ভবিষ্যৎ ঘটনার সূচনা করে। বলরামেরও এখন ঐরূপ হইয়াছিল। তিনি যাহা ভয় করিতে-ছিলেন প্রায় তাহাই উপস্থিত হইল। আত্মীয়বর্গের গুপ্ত প্রেরণায় তাঁহার উভয় ভ্রাতাই তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এইরূপ ইঙ্গিত করিয়া পত্র পাঠাইলেন এবং হরিবল্লভ বাবু তাঁহার সহিত পরামর্শে বিশেষ প্রয়োজনীয় কোন বিষয় স্থির করিবার অভিপ্রায়ে শীঘ্রই কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার সহিত একত্রে কয়েকদিন অবস্থান করিবেন, এই সংবাদও অবিলম্বে তাঁহার নিকটে উপস্থিত

বলরামের ভ্রাতা হরিবল্লভের কলিকাতা আগমন

হইল। অন্যায় কিছুই করেন নাই বলিয়া বলরামের অন্তরাত্মা উহাতে ক্ষুব্ধ না হইলেও ঘটনাচক্র পাছে তাঁহাকে ঠাকুরের নিকট হইতে দূরে লইয়া যায়, এই ভয়ে অবসন্ন হইল। অনন্তর অশেষ চিন্তার পরে তিনি স্থির করিলেন, ভ্রাতারা অপরের কথা শুনিয়া যদি তাঁহাকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করেন তথাপি তিনি ঠাকুরের অসুখের সময়ে তাঁহাকে ফেলিয়া অন্যত্র যাইবেন না। ইতিমধ্যে হরিবল্লভ বাবুও কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত অবস্থানকালে ভ্রাতাকে যাহাতে কোনরূপ কষ্ট বা অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়, এইরূপে সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া বলরাম নিজ সঙ্কল্প দৃঢ় রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান করিতে এবং ঠাকুরের নিকটে প্রতিদিন যেভাবে যাতায়াত করিতেন, প্রকাশ্যভাবে তদ্রূপ করিতে লাগিলেন।

বলরামের প্রতি কৃপায় ঠাকুরের হরিবল্লভকে দেখিবার সঙ্কল্প

মুখই মনের প্রকৃষ্ট দর্পণ। হরিবল্লভ বসুর কলিকাতায় আসিবার দিবসে বলরাম ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিয়া লইলেন তাহার অন্তরে কি একটা সংগ্রাম চলিয়াছে। বলরামকে তিনি বিশেষভাবে আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতেন; তাহার বেদনায় ব্যথিত হইয়া তাহাকে নিজ সমীপে ডাকিয়া প্রশ্নপূর্ব্বক সকল বিষয় জানিয়া লইলেন এবং বলিলেন, "সে লোক কেমন? তাহাকে (হরিবল্লভ বসুকে) একদিন এখানে আনিতে পার?" বলরাম বলিলেন, "লোক খুব ভাল, মশায়! বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সদাশয়, পরোপকারী, দান যথেষ্ট, ভক্তিমানও বটে—দোষের মধ্যে বড় লোকের যাহা অনেক সময়

হইয়া থাকে একটু 'কান পাতলা'—এ ক্ষেত্রে অপরের কথাতেই কি একটা ঠাওরাইয়াছে। এখানে আসি বলিয়াই আমার উপরে অসন্তোষ, অতএব আমি বলিলে এখানে আসিবে কি?" ঠাকুর বলিলেন, "তবে থাক্, তোমার বলিয়া কাজ নাই; একবার গিরিশকে ডাক দেখি।"

গিরিশচন্দ্র আসিয়া সানন্দে ঐ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, "হরিবল্লভ ও আমি যৌবনের প্রারম্ভে কিছুকাল সহপাঠী ছিলাম, সেজন্য কলিকাতায় আসিয়াছে শুনিলেই আমি তাহার সহিত দেখা করিয়া আসি; অতএব এই কাজ আমার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নহে, অদ্যই আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব।"

পরদিন অপরাহ্নে প্রায় ৫টার সময় গিরিশচন্দ্র হরিবল্লভ বাবুকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঠাকুরের সহিত তাঁহাকে পরিচিত করিবার মানসে বলিলেন, "ইনি আমার বাল্যবন্ধু, কটকের সরকারী উকীল হরিবল্লভ বসু, আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।" ঠাকুর ঐকথা শুনিয়া তাঁহাকে পরম সমাদরে নিজ সমীপে বসাইয়া বলিলেন, "তোমার কথা অনেকের নিকটে শুনিয়া তোমাকে দেখিবার ইচ্ছা হইত, আবার মনে ভয়ও হইত—যদি তোমার পাটোয়ারী বুদ্ধি হয়! (গিরিশকে লক্ষ্য করিয়া) কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা ত নয়, (হরিবল্লভ বসুকে নির্দ্দেশ করিয়া) এ যে বালকের ন্যায় সরল! (গিরিশকে) কেমন চক্ষু দেখিয়াছ? ভক্তিপূর্ণ অন্তর না হইলে

গিরিশচন্দ্রের হরিবল্লভকে আনয়ন ও ঠাকুরের আচরণে তাঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন হওয়া

অমন চক্ষু কখন হয় না! (হরিবল্লভ বাবুকে সহসা স্পর্শ করিয়া) হাঁ গো, ভয় করা দূরে থাকুক, তোমাকে যেন কত আত্মীয় বলিয়া মনে হইতেছে।" হরিবল্লভ বাবু প্রণাম ও পদধূলী গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন, "সেটা আপনার কৃপা।"

গিরিশচন্দ্র এইবার বলিলেন, যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে উঁহার ত ভক্তিমান হইবারই কথা; ৺কৃষ্ণরাম বসুর ভক্তি তাঁহাকে প্রাতঃস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহার কীর্ত্তিতে দেশ উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার বংশে যাঁহারা জন্মিয়াছেন তাঁহারা ভক্তিমান হইবেন না ত হইবে কাহারা।"

ঐরূপে ভগবদ্ভক্তির প্রসঙ্গ উঠিল, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস, ভক্তি ও ঐকান্তিক নির্ভরতাই মানবজীবনের চরম সার্থকতা—ঐ বিষয়ে নানা কথা উপস্থিত সকলকে বলিতে বলিতে ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। অনন্তর অর্দ্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর আমাদিগের একজনকে একটি ভজন সঙ্গীত গাহিতে বলিলেন এবং উহার মর্ম্ম হরিবল্লভ বাবুকে মৃদুস্বরে বুঝাইয়া বলিতে বলিতে পুনরায় গভীর ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। সঙ্গীত সম্পূর্ণ হইলে দেখা গেল, দুই-তিনজন যুবক ভক্তেরও ভাবাবেশ হইয়াছে এবং ঠাকুরের ভাবোজ্জ্বল মূর্ত্তি ও মর্ম্মস্পর্শী বাণীতে এককালে মুগ্ধ হওয়ায় হরিবল্লভ বাবুর নয়নদ্বয়ে প্রেমধারা বিগলিত হইতেছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল গত হইবার পরে হরিবল্লভ বাবু সেদিন ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাইতাম, আগন্তুক কোন ব্যক্তি ঠাকুরের মতের বিরোধী হইয়া

তাঁহার সহিত বাদানুবাদ আরম্ভ করিলে অথবা কোন কারণে তাঁহার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া কেহ উপস্থিত হইলে, ঠাকুর কথা কহিতে কহিতে তাহাদিগকে কৌশলে স্পর্শ করিতেন এবং ঐরূপ করিবার পরমুহূর্ত্ত হইতে তাহারা তাঁহার কথা মানিয়া লইতে থাকিত। অবশ্য যাহাদিগকে দেখিয়া তাঁহার মন প্রসন্ন হইত তাহাদিগের সম্বন্ধেই তিনি ঐরূপ ব্যবহার করিতেন।

আলাপ করিবার কালে ঠাকুরের অপরকে স্পর্শের কারণ ও ফল

স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি এক দিবস আমাদিগের নিকটে ঐ বিষয়ের এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। 'অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অথবা আমি কাহারও অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহি, এইরূপ ভাব লইয়াই লোকে কাহারও কথা সহজে মানিয়া লইতে চাহে না। (আপনার শরীর নির্দ্দেশ করিয়া) ইহার ভিতরে যে রহিয়াছে তাহাকে স্পর্শমাত্র তাহার দিব্যশক্তিপ্রভাবে তাহাদিগের ঐ ভাব আর মাথা উঁচু করিতে পারে না। সর্প যেমন ফণা ধরিবার কালে ওষধিস্পৃষ্ট হইয়া মাথা নীচু করে, তাহাদিগের অন্তরের অহঙ্কারের অবস্থাও তখন ঠিক ঐরূপ হয়। ঐজন্যই কথা কহিতে কহিতে কৌশলে তাহাদিগের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া থাকি।"

হরিবল্লভ বাবুকে ঐদিন ঠাকুরের নিকট হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব লইয়া সশ্রদ্ধ হৃদয়ে চলিয়া যাইতে দেখিয়া আমাদিগের মনে ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত কথার উদয় হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, বলরাম ঠাকুরের নিকটে যাতায়াত করায় অন্যায় করিতেছেন, এইরূপ ভাব তাঁহার ভ্রাতৃগণের হৃদয়ে এখন হইতে আর কখন দেখা দেয় নাই।

ভক্ত-সংখ্যার বৃদ্ধি ; সাধন-পথ নির্দ্দেশ— সাকার ও নিরাকার চিন্তার উপযোগী আসন

শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাঁহার পুণ্যদর্শন ও কৃপালাভে সমাগত জনগণের সংখ্যাও তেমনি দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র মুস্তফি প্রমুখ অনেক গৃহস্থভক্তের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তসঙ্ঘে যিনি পরে স্বামী ত্রিগুণাতীত নামে সুপরিচিত হইয়াছিলেন—শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন মিত্র,[১] মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত[২] প্রভৃতি অনেক যুবক ভক্তেরাও এখানে ঠাকুরের প্রথম-দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। অনেকে আবার ইতিপূর্ব্বে দুই-এক বার দক্ষিণেশ্বরে গতায়াত করিলেও এখানেই ঠাকুরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। নবাগত এই সকল ব্যক্তিদিগের প্রকৃতি ও সংস্কার লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর ইহাদিগের প্রত্যেককে ভক্তিপ্রধান অথবা জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তিপ্রধান সাধনমার্গ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন এবং সুযোগ পাইলেই নিভৃতে নানারূপ উপদেশ দিয়া ঐ পথে অগ্রসর করাইতেন। আমাদিগের জানা আছে, জনৈক যুবককে ঐরূপে ঠাকুর একদিন সাকার ও নিরাকার ধ্যানের উপযোগী নানাপ্রকার আসন ও অঙ্গসংস্থান দেখাইতেছিলেন। পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া বাম করতলের উপরে

১ সারদাপ্রসন্ন ১৮৮৪ খৃঃ-এর ডিসেম্বরের মধ্যে আসিয়াছিলেন—'কথামৃত' ২য় ভাগ, ২১৫ পৃঃ এবং ১ম ভাগ, ৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।—প্রঃ

২ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয়ের প্রথম পরিচয় হয় এখানে। ইঁহার ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণেশ্বরে কয়েকবার দর্শন করিয়াছিলেন মাত্র—তাঁহার লিখিত 'শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের পুণ্যস্মৃতি', 'উদ্বোধন', ৩৯শ বর্ষ, ভাদ্র-সংখ্যা দ্রষ্টব্য। —প্রঃ

দক্ষিণ করপৃষ্ঠ সংস্থাপনপূর্ব্বক ঐভাবে উভয়হস্ত বক্ষে ধারণ ও চক্ষু নিমীলন করিয়া বলিলেন, ইহাই সকল প্রকার সাকার-ধ্যানের প্রশস্ত আসন। পরে ঐ আসনেই উপবিষ্ট থাকিয়া বাম ও দক্ষিণ হস্তদ্বয় বাম ও দক্ষিণ জানুর উপরে রক্ষাপূর্ব্বক প্রত্যেক হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগ সংযুক্ত ও অপর সকল অঙ্গুলী ঋজু রাখিয়া এবং ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থির করিয়া বলিলেন, ইহাই নিরাকার ধ্যানের প্রশস্ত আসন। ঐকথা বলিতে না বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন এবং কিছুক্ষণ পরে বলপূর্ব্বক মনকে সাধারণ জ্ঞানভূমিতে নামাইয়া বলিলেন, "আর দেখান হইল না; ঐরূপে উপবিষ্ট হইলেই উদ্দীপনা হইয়া মন তন্ময় ও সমাধিলীন হয় এবং বায়ু ঊর্দ্ধগামী হওয়ায় গলদেশের ক্ষতস্থানে আঘাত লাগে; ডাক্তার ঐজন্য সমাধি যাহাতে না হয় তাহা করিতে বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছে।" যুবক তাহাতে কাতর হইয়া বলিল, "আপনি কেন ঐ সকল দেখাইতে যাইলেন, আমি ত দেখিতে চাহি নাই।" তিনি তদুত্তরে বলিলেন, "তা ত বটে, কিন্তু তোদের একটু-আধটু না বলিয়া, না দেখাইয়া থাকিতে পারি কৈ?" যুবক ঐ কথায় বিস্মিত হইয়া ঠাকুরের অপার করুণা এবং তাঁহার মনের অলৌকিক সমাধিপ্রবণতার কথা ভাবিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

ঠাকুরের দৈনন্দিন ব্যবহারসকলের মধ্যেও এমন মাধুর্য্য ও অসাধারণত্বের পরিচয় পাওয়া যাইত যে, নবাগত অনেক ব্যক্তি তাহা দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া পড়িত। দৃষ্টান্তস্বরূপে নিম্নে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ঘটনাটি আমরা মহাকবি গিরিশচন্দ্রের বন্ধুবৎসল কনিষ্ঠ সহোদর পরলোকগত অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের

নিকটে শ্রবণ করিয়াছিলাম। যথাসম্ভব তাঁহারই ভাষায় আমরা উহা লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব—"উপেন্দ্র[1] আমার বিশেষ বন্ধু ছিল, বিদেশে ডেপুটিগিরি চাকরি করিত। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার পরে তাহাকে চিঠিতে লিখিয়াছিলাম, 'এবার যখন আসিবে তখন তোমাকে এক অদ্ভুত জিনিস দেখাব।' বড়দিনের ছুটিতে আসিয়া সে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিল। আমি বলিলাম, 'মনে করেছিলাম তোমায় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে দেখাব—কিন্তু এখন তাঁর অসুখ, শ্যামপুকুরে আছেন, কথা কহিতে ডাক্তারের বারণ—তুমি নূতন লোক, তোমায় এখন কেমন করিয়া লইয়া যাই?'

ঠাকুরের প্রতি কার্য্যের মাধুর্য্য ও অসাধারণত্ব দেখিয়া অনেকের আকৃষ্ট হওয়া

সে দিন গেল। তাহার পর উপেন্দ্র আর একদিন মেজদাদার (গিরিশচন্দ্রের) সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে, ঠাকুরের কথা উঠিল এবং মেজদাদা তাহাকে বলিলেন, 'যাস্ না একদিন অতুলের সঙ্গে, তাঁকে দেখ্‌তে।' উপেন বলিল, 'উনি তো ছয় মাস (পূর্ব্ব) হইতে বলিতেছিলেন লইয়া যাইব, কিন্তু যখন এখানে আসিয়া সেই কথা বলিলাম, তখন বলিলেন—এখন হইবে না।' আমি শুনিয়া মেজদাদাকে বলিলাম, 'আমরাই এখন সব সময়ে ঢুকিতে পাই না, নূতন লোককে কেমন করিয়া লইয়া যাই।' মেজদাদা বলিলেন, 'তাহা হউক, তবু একদিন

দৃষ্টান্ত—উপেন্দ্র মুন্সেফ

১ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, ইনি শ্যামবাজারস্থ সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের কোন আত্মীয়াকে বিবাহ করেন এবং মুন্সেফ ছিলেন।

লইয়া যান্, তাহার পরে ওর অদৃষ্টে থাকে তিনি ওকে দর্শন দিবেন, আদর করিবেন।'

"তাহার পর একদিন অপরাহ্নে উপেনকে লইয়া যাইলাম। সেদিন ঠাকুরের ঘরে তাঁহার বিছানার নিকট হইতে দুটি সপ্ বিছাইয়া একঘর লোক বসিয়া, আর নানারকম আজে-বাজে কথা হইতেছে—যেমন, ছবি আঁকার কথা (কারণ চিত্রবিদ্যাকুশল অন্নদা বাগ্‌চী সেদিন সেখানে ছিল), সেক্‌রার দোকানে সোনারূপা গলানর কথা[১] ইত্যাদি। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিলাম, (ঐরূপ কথা ভিন্ন) একটিও ভাল কথা হইল না! ভাবিতে লাগিলাম, আজ এই নূতন লোকটিকে লইয়া আসিলাম আর আজই যত আজে-বাজে কথা! ও (উপেন) ঠাকুরের সম্বন্ধে কিরূপ ভাব লইয়া যাইবে!—ভাবিয়া আমার মুখ শুষ্ক হইতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে উপেনের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু যতবার দেখিলাম, দেখিলাম তাহার

উপেন্দ্রের শ্যামপুকুরে আগমন ও ঠাকুরের সপ্রেম ব্যবহারে উপলব্ধি

১ সেক্‌রাদিগের সোনারূপা চুরি করিবার দক্ষতা সম্বন্ধে ঠাকুর আমাদিগকে একটি মজার গল্প সময়ে সময়ে বলিতেন। অতুল বাবু এখানে ঐ গল্পটির ইঙ্গিত করিয়াছেন। গল্পটি ইহাই—কয়েকজন বন্ধু সমভিব্যাহারে এক ব্যক্তি একখানি গহনা বিক্রয়ের জন্য এক স্বর্ণকারের দোকানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তিলকাঙ্কিত-সর্ব্বাঙ্গ শিখামাল্যধারী বৃদ্ধ স্বর্ণকার সম্মুখে বসিয়া গম্ভীরভাবে হরিনাম করিতেছে এবং তাহার তিন-চারি জন সহকারী ঐরূপ তিলকমালাদি ধারণ করিয়া গৃহমধ্যে নানাবিধ অলঙ্কারগঠনে নিযুক্ত আছে। বৃদ্ধ স্বর্ণকার ও তাহার সহকারীদিগের সাত্ত্বিক বেশভূষা দেখিয়া ঐ ব্যক্তি ও তাহার বন্ধুগণ ভাবিল—ইহারা ধার্ম্মিক, আমাদিগকে ঠকাইবে না। পরে যে অলঙ্কারখানি তাহারা বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল তাহা বৃদ্ধের সম্মুখে রাখিয়া উহার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য অনুরোধ

মুখ বেশ প্রসন্ন—যেন ঐ সকল কথায় সে বেশ আনন্দ পাইতেছে। তখন ইসারা করিয়া তাহাকে উঠিতে বলিলাম, সে তাহাতে আর একটু বসিতে ইসারায় জানাইল। ঐরূপে দুই-তিন বার ইসারা

করিল। বৃদ্ধও তাহাদিগকে সাদরে বসাইয়া একজন সহকারীকে তামাকু দিতে বলিল এবং কষ্টিপাথরে কষিয়া অলঙ্কারের স্বর্ণের দাম বলিয়া তাহাদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক উহা গলাইবার নিমিত্ত গৃহমধ্যস্থ এক সহকারীর হস্তে প্রদান করিল। সেও উহা তৎক্ষণাৎ গলাইতে আরম্ভ করিয়া সহসা দেবতার স্মরণপূর্ব্বক বলিয়া উঠিল, 'কেশব, কেশব।' ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপনায় বৃদ্ধও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, 'গোপাল, গোপাল।' গৃহমধ্যস্থ এক সহকারী উহার পরেই বলিয়া উঠিল, 'হরি, হরি, হরি।' যে তামাকু আনিয়াছিল সে ইতিমধ্যে কলিকাটি আগন্তুকদিগকে প্রদানপূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে বলিয়া উঠিল, 'হর, হর, হর।' ঐরূপ বলিবামাত্র প্রথমোক্ত সহকারী কতকটা গলিত স্বর্ণ সম্মুখস্থ বারিপূর্ণ পাত্রে দক্ষতার সহিত নিক্ষেপ করিয়া আত্মসাৎ করিল। স্বর্ণকার ও তাহার সহকারিগণ শ্রীভগবানের পূর্ব্বোক্ত নামসকল যে ভিন্নার্থে ব্যবহার করিতেছে, অর্থাৎ 'কেশব' না বলিয়া 'কে সব'—ইহারা চতুর অথবা নির্ব্বোধ, এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে এবং ঐ প্রশ্নের উত্তরস্বরূপেই 'গোপাল' অথবা গরুর পালের ন্যায় নির্ব্বোধ, এই কথা বলিতেছে এবং 'হরি' ও 'হর' শব্দদ্বয় 'অপহরণ করি' ও 'কর' এই অর্থে উচ্চারণ করিতেছে—একথা বুঝিতে না পারিয়া আগন্তুক ব্যক্তিগণ ইহাদিগের ভক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় প্রীত হইয়া নিশ্চিন্তমনে তামাকু সেবন করিতে লাগিল। অনন্তর গলিত স্বর্ণ ওজন করাইয়া উহার মূল্য লইয়া তাহারা প্রসন্নমনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

ঠাকুরের পরম ভক্ত অধরচন্দ্র সেনের ভবনে বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত যেদিন তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেদিন বঙ্কিম বাবু সন্দেহবাদীর পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক ঠাকুরকে ধর্ম্মবিষয়ক নানা কূট প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ঠাকুর ঐ সকলের যথাযথ উত্তর দিবার পরে বঙ্কিমচন্দ্রকে পরিহাসপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "তুমি নামেও বঙ্কিম, কাজেও বঙ্কিম।" প্রশ্নসকলের হৃদয়স্পর্শী উত্তর লাভে প্রীত হইয়া বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন, "মহাশয়, আপনাকে একদিন আমাদের কাঁঠালপাড়ার বাটীতে যাইতে হইবে, সেখানে ঠাকুরসেবার বন্দোবস্ত আছে এবং আমরা সকলেও হরিনাম করিয়া থাকি।" ঠাকুর তাহাতে রহস্যপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "কেমনতর হরিনাম গো, সেকরাদের মত নয় ত?"—বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন এবং সভামধ্যে হাস্যের রোল উঠিয়াছিল।

করার পরে সে উঠিয়া আসিল। তখন তাহাকে বলিলাম, 'কি শুন্‌ছিলি এতক্ষণ? ঐসব কথায় শুনিবার কি আছে বল দেখি?—সাধে তোকে 'বাঙাল' বলি!' তাহার কপালে একটি উল্‌কির টিপ ছিল বলিয়া তাহাকে আমরা ঐরূপ বলিতাম। সে বলিল, 'না হে, বেশ শুনিতেছিলাম। পূর্ব্বে universal love (সকলের প্রতি সমান ভালবাসা) কথাটা শুনেছি, কিন্তু কাহাতেও উহার প্রকাশ দেখি নাই। সকল বিষয় লইয়া সকলের সঙ্গে উঁহাকে (ঠাকুরকে) আনন্দ করিতে দেখিয়া আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। কিন্তু আর একদিন আসিতে হইবে—আমার তিনটি প্রশ্ন আছে, জিজ্ঞাসা করিব।'

"তাহার পর একদিন প্রাতে উপেনকে লইয়া যাইলাম। তখন ঠাকুরের নিকটে বড় একটা কেহ নাই—কেবল, সেবকদিগের দুই-এক জন ও আমার ভগ্নীপতি 'মল্লিক মহাশয়' ছিলেন। যাইবার পূর্ব্বে উপেনকে পৈ-পৈ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলাম, 'যাহা জিজ্ঞাসা করিবার স্বয়ং করিবি, তাহা হইলে মনের মত উত্তর পাইবি; কাহাকেও দিয়া প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করাইবি না।' কিন্তু সে মুখচোরা ছিল, যাহা বারণ করিয়াছিলাম এখানে আসিয়া তাহাই করিয়া বসিল—মল্লিক মহাশয়ের দ্বারা প্রশ্ন করাইল। ঠাকুর উত্তর করিলেন, কিন্তু উপেনের মুখের ভাবে বুঝিলাম উত্তরটি তাহার মনের মত হইল না। তখন আমি তাহাকে পুনরায় চুপি-চুপি বলিলাম, 'ঐরূপ ত হবেই, আমি যে তোকে বার বার বলে এলাম, যা জিজ্ঞাসা করবার আপনি কর্‌বি; নিজে জিজ্ঞাসা কর্‌ না, মোক্তার ধরেছিস্ কেন?'

"সাহস করিয়া সে এইবার স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার? আর যদি দুই-ই হন, তাহা হলে একসঙ্গে ঐরূপ সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের দুই কেমন করিয়া হইতে পারেন?' ঠাকুর শুনিয়াই বলিলেন, 'তিনি (ঈশ্বর) সাকার নিরাকার দুই-ই—যেমন জল, আর বরফ।' উপেন কলেজে বিজ্ঞান (Science course) লইয়াছিল, তজ্জন্য ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত তাহার মনের মত হইল এবং উহার সহায়ে সে তাহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাইয়া আনন্দিত হইল। ঐ প্রশ্নটি করিয়াই কিন্তু সে নিরস্ত হইল এবং কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। বাহিরে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "উপেন, তুমি তিনটি প্রশ্নের কথা বলিয়াছিলে, একটি মাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াই উঠিয়া আসিলে কেন?' সে তাহাতে বলিল, 'তাহা বুঝি বুঝ নাই—ঐ এক উত্তরে আমার তিনটি প্রশ্নেরই মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।'

ঈশ্বর সাকার নিরাকার দুই-ই—যেমন জল আর বরফ

"তোমার মনে আছে বোধ হয়, রামদাদা[১] এই সময়ে প্রায়ই বাটীতে সকাল সকাল আহারাদি করিয়া আফিসের কাপড় চোপড় সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের নিকটে আসিতেন এবং দুই-এক ঘণ্টা এখানে কাটাইয়া বেশপরিবর্ত্তনপূর্ব্বক কর্ম্মস্থলে চলিয়া যাইতেন। ঠাকুর যখন আজ উপেনের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, তখন তিনি আফিসে যাইবার বেশ পরিতে পরিতে ঐ ঘরে সহসা আসিয়া ঠাকুরের কথাগুলি শুনিয়াছিলেন। আমরা যেমন বাহিরে আসিয়াছি অমনি রামদাদা

রামদাদার কথায় অতুলের বিরক্তি

[১] শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত

বলিয়া উঠিলেন, 'অতুলদাদা, ওঁকে (উপেনকে) এদিকে নিয়ে এস ; ঠাকুর ওঁর প্রশ্নের উত্তরে বড় শক্ত কথা বলিয়াছেন, উনি বুঝিতে পারিবেন না। আমার এই বইখানা[১] ওঁকে পড়িতে হইবে, তবে উনি ঠাকুরের ঐকথা বুঝিতে পারিবেন।' ঐকথা শুনিয়া আমার ভারি রাগ হইল, বলিয়া ফেলিলাম, 'রামদাদা, তুমি না আমাদের চেয়ে সাত বৎসর আগে ঠাকুরকে দেখেছ ও তাঁর কাছে যাওয়া আসা করছ ? উনি (ঠাকুর) যা বল্‌লেন তা বুঝ্‌তে পারবে না, আর তোমার বই পড়ে উনি যা বোঝাতে পার্‌লেন না তা বুঝ্‌তে পারবে ! এটা তোমার কেমনতর কথা ? তবে উপেনকে তোমার বইখানা পড়তে দেবে দাও—সেটা আলাদা কথা।' রামদাদা ঐ কথায় একটু অপ্রস্তুত হইয়া পুস্তকখানি উপেনকে দিলেন।"

[১] শ্রীরামচন্দ্র দত্ত-প্রণীত 'তত্ত্বপ্রকাশিকা'।

দ্বাদশ অধ্যায়—তৃতীয় পাদ

ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান

শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুরের এক দিবস এক অদ্ভুত দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন, তাঁহার সূক্ষ্মশরীর স্থূলদেহের অভ্যন্তর হইতে নির্গত হইয়া গৃহমধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে এবং তাঁহার গলার সংযোগস্থলে পৃষ্ঠদেশে কতকগুলি ক্ষত হইয়াছে। বিস্মিত হইয়া তিনি ঐরূপ ক্ষত হইবার কারণ কি ভাবিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, নানারূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়া আসিয়া লোকে তাঁহাকে স্পর্শপূর্ব্বক পবিত্র হইয়াছে, তাহাদের পাপভার ঐরূপে তাঁহাতে সংক্রমিত হওয়ায় তাঁহার শরীরে ক্ষতরোগ হইয়াছে। জীবের কল্যাণসাধনে তিনি লক্ষ লক্ষ বার জন্ম পরিগ্রহ-পূর্ব্বক দুঃখভোগ করিতে কাতর নহেন, একথা আমরা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে সময়ে সময়ে বলিতে শুনিয়াছিলাম, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দর্শনে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া আনন্দের সহিত তিনি যে এখন ঐ বিষয়ে আমাদিগকে বলিবেন, ইহা বিচিত্র বোধ হইল না এবং উহাতে তাঁহার অপার করুণার কথা স্মরণ ও আলোচনা করিয়া আমরা মুগ্ধ হইলাম। কিন্তু ঠাকুরের শরীর পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত যাহাতে কোন নূতন লোক আসিয়া তাঁহার চরণ স্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম না করে, তদ্বিষয়ে ভক্তদিগের—বিশেষতঃ যুবক-ভক্তদিগের

ঠাকুরের নিজ সূক্ষ্মশরীরে ক্ষত দর্শন—অপরের পাপভার গ্রহণ-কারণ ঐরূপ হওয়া ও উহার ফল

মধ্যে উহাতে বিশেষ প্রয়াস উপস্থিত হইল এবং ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ আবার পূর্ব্বজীবনের উচ্ছৃঙ্খলতার কথা স্মরণপূর্ব্বক এখন হইতে ঠাকুরের পবিত্র দেহ আর স্পর্শ করিবেন না, এইরূপ সংকল্প করিয়া বসিলেন। আবার নরেন্দ্র প্রমুখ বিরল কোন কোন ব্যক্তি উক্ত দর্শনের কথা শুনিয়া অন্যকৃত কর্ম্মের জন্য অন্যের স্বেচ্ছায় ফলভোগ করারূপ যে মতবাদ খৃষ্টান, বৈষ্ণব প্রভৃতি কোন কোন ধর্ম্মের মূলভিত্তিস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, উহাতে তাহারই সত্যতার ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইয়া, ঐ বিষয়ের চিন্তা ও গবেষণায় নিযুক্ত হইলেন।

ভক্তগণের নবাগত ব্যক্তিসকলের সম্বন্ধে নিয়মবন্ধন

ঠাকুরের নিকটে নূতন লোকের গমনাগমন নিবারণের চেষ্টা দেখিয়া গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "চেষ্টা করিতেছ কর, কিন্তু উহা সম্ভবপর নহে—কারণ, উনি (ঠাকুর) যে ঐজন্যই দেহধারণ করিয়াছেন।" ফলে দেখা গেল, সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকসকলকে নিষেধ করিতে পারিলেও ভক্তগণের পরিচিত নবাগত ব্যক্তিসকলকে নিবারণ করা সম্ভবপর হইল না। সুতরাং নিয়ম হইল, ভক্তগণের মধ্যে কাহারও সহিত বিশেষ পরিচয় না থাকিলে নবাগত কাহাকেও ঠাকুরের নিকটে যাইতে দেওয়া হইবে না এবং ঐরূপ ব্যক্তি-সকলকে পূর্ব্ব হইতে বলিয়া দেওয়া হইবে, যাহাতে ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম না করেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত কাহার কাহারও ব্যাকুলতা দেখিয়া মধ্যে মধ্যে উক্ত নিয়মেরও ব্যতিক্রম হইতে লাগিল।

ঐরূপ নিয়ম লইয়া একদিন এক রঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র পরিচালিত নাট্যশালায় ধর্ম্মমূলক নাটক বিশেষের

অভিনয় দর্শন করিতে ঠাকুর একদিবস দক্ষিণেশ্বরে থাকিবার কালে গমন করিয়াছিলেন এবং নাটকের প্রধান ভূমিকা যে অভিনেত্রী গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার অভিনয় দক্ষতার প্রশংসা করিয়াছিলেন। অভিনয়ান্তে ঐদিন উক্ত অভিনেত্রী ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের পাদ-বন্দনা করিবার সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়াছিল। তদবধি সে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া মনে মনে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত এবং আর এক দিবস তাঁহার পুণ্যদর্শন লাভ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। ঠাকুরের নিদারুণ পীড়ার কথা শুনিয়া সে এখন তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং শ্রীযুত কালীপদ ঘোষের সহিত পরিচিত থাকায় বিশেষ অনুনয়-বিনয়পূর্ব্বক ঐ বিষয়ের জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইল। কালীপদ সকল বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের অনুগামী ছিলেন এবং ঠাকুরকে যুগাবতার বলিয়া ধারণা করায় দুষ্কৃতকারী অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণস্পর্শ করিলে তাঁহার রোগবৃদ্ধি হইবে—এ কথায় আস্থাবান ছিলেন না। সুতরাং ঠাকুরের নিকটে উক্ত অভিনেত্রীকে আনয়ন করিতে তাঁহার মনে কোনরূপ দ্বিধা বা ভয় আসিল না। গোপনে পরামর্শ স্থির করিয়া একদিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি তাহাকে পুরুষের ন্যায় 'হ্যাট-কোটে' সজ্জিত করিয়া শ্যামপুকুরের বাসায় উপস্থিত হইলেন এবং নিজ বন্ধু বলিয়া আমাদিগের নিকটে পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক ঠাকুরের সমীপে লইয়া যাইয়া তাহার যথার্থ পরিচয় প্রদান করিলেন। ঠাকুরের ঘরে তখন আমরা কেহই ছিলাম না, সুতরাং ঐরূপ করিবার পথে তাঁহাকে কোন বাধাই পাইতে হইল না। আমাদিগের

কালীপদের সাহায্যে অভিনেত্রীর ঠাকুরকে দর্শন

চক্ষে ধূলি দিবার জন্যই অভিনেত্রী ঐরূপ বেশে আসিয়াছে জানিয়া রঙ্গপ্রিয় ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন এবং তাহার সাহস ও দক্ষতার প্রশংসাপূর্ব্বক তাহার ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর ঈশ্বরে বিশ্বাসবতী ও তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাকিবার জন্য তাহাকে দুই-চারিটি তত্ত্ব-কথা বলিয়া অল্পক্ষণ পরে বিদায় দিলেন। সেও অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার শ্রীচরণে মস্তক স্পর্শপূর্ব্বক কালীপদের সহিত চলিয়া যাইল। ঠাকুরের নিকট হইতে আমরা পরে একথা জানিতে পারিলাম এবং আমরা প্রতারিত হওয়ায় তিনি হাস্য-পরিহাস ও আনন্দ করিতেছেন দেখিয়া কালীপদের উপরে বিশেষ ক্রোধ করিতে পারিলাম না।

ভক্তগণের মধ্যে ভাবুকতা বৃদ্ধির কারণ

ঠাকুরের সঙ্গগুণে এবং তাঁহার সেবা করিবার ফলে ভক্তগণের হৃদয়ে ভক্তি-বিশ্বাস দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকিলেও, এক বিষয়ে তাহাদিগের মনের গতির বিপদসঙ্কুল বিপরীত পথে যাইবার সম্ভাবনা এখন উপস্থিত হইয়াছিল। কঠোর ত্যাগ এবং কষ্টসাধ্য সংযমের আদর্শ অপেক্ষা সাময়িক ভাবের উচ্ছ্বাসই তাহাদিগের নিকটে এক্ষণে অধিকতর প্রিয় হইতেছিল। ত্যাগ ও সংযমকে ভিত্তিস্বরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক উদিত না হইলে ঐ প্রকার ভাবোচ্ছ্বাসসকল ধর্ম্ম-মূলক হইলেও যে মানবকে কাম-ক্রোধাদি রিপুর সহিত সংগ্রামে জয়ী হইবার সামর্থ্য দিতে পারে না, একথা তাহারা বুঝিতে পারিতেছিল না। ঐরূপ হইবার অনেকগুলি কারণ একে একে উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথমে সহজ বা সুখসাধ্য পথ ও বিষয়কে অবলম্বন করিতে যাওয়াই মানবের সাধারণ প্রকৃতি। ধর্ম্মানুষ্ঠান

করিতে যাইয়াও সে ঐজন্য সংসার ও ঈশ্বর—ভোগ ও ত্যাগ উভয় দিক রক্ষা করিয়া চলিতে চাহে। ভাগ্যবান কোন কোন ব্যক্তিই তদুভয়কে আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া ধারণা করে এবং ঈশ্বরার্থে সর্ব্বস্বত্যাগরূপ আদর্শকে কাটিয়া-ছাঁটিয়া অনেকটা কমাইয়া না আনিলে যে ঐ উভয়ের সামঞ্জস্য হওয়া অসম্ভব, একথা বুঝিয়া ঐরূপ ভ্রমে পতিত হয় না। ঐরূপে উভয় দিক্ রক্ষা করিয়া যাহারা চলিতে চাহে, তাহারা শীঘ্রই ত্যাগাদর্শের দিকে এতটা পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য ভাবিয়া সীমা নির্দ্দেশপূর্ব্বক চিরকালের নিমিত্ত সংসারে নোঙর ফেলিয়া বসে। ঠাকুর ঐজন্য কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তাহাকে নানারূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন, সে ঐরূপে নোঙর ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছে কি না এবং ঐরূপ করিয়াছে বুঝিলে ঈশ্বরার্থে সর্ব্বস্বত্যাগ-রূপ আদর্শের সে যতটা লইতে পারিবে ততটা মাত্র প্রথমে তাহার নিকটে প্রকাশ করিতেন। ঐজন্যই দেখা যাইত, অধিকারিভেদে তাঁহার উপদেশ বিভিন্ন প্রকারের হইতেছে অথবা তাঁহার গৃহী ও যুবক-ভক্তদিগকে তিনি সাধন সম্বন্ধে ভিন্ন প্রকারের শিক্ষা দিতেছেন। ঐজন্যই আবার সর্ব্বসাধারণকে উপদেশ দিবার কালে তিনি বলিতেন, 'কলিতে কেবলমাত্র শ্রীহরির নামসঙ্কীর্ত্তন ও নারদীয়-ভক্তি।" সাধারণের মধ্যে তখন ধর্ম্ম ও শাস্ত্র-চর্চ্চা এতটা লুপ্ত হইয়াছিল যে, 'নারদীয়-ভক্তি' কথার অর্থও শতের মধ্যে একজন বুঝিত কিনা সন্দেহ। উহাতেও যে ঈশ্বর-প্রেমে সর্ব্বস্ব-ত্যাগের কথা উপদিষ্ট হইয়াছে, একথা লোকের হৃদয়ঙ্গম হইত না। সুতরাং ঠাকুরের অনভিজ্ঞ ভক্তগণ যে দুর্ব্বল প্রকৃতির বশবর্ত্তী

হইয়া সময়ে সময়ে সংসার ও ধর্ম্ম উভয় বজায় রাখিবার ভ্রমে পতিত হইবেন এবং সুখসাধ্য ভাবুকতার বৃদ্ধিটাকেই ধর্ম্মলাভের চূড়ান্ত বলিয়া ধরিয়া লইবেন, একথা বিচিত্র নহে।

আবার ঠাকুরের কঠোর সংযম ও তপস্যাদি আমরা তাঁহার নিকটে যাইবার পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হওয়ায়, তাঁহার অলৌকিক ভাবুকতা কোন্ সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহা দেখিতে না পাওয়া ভক্তগণের ঐরূপ ভ্রমে পতিত হইবার অন্যতম কারণ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ঐ বিষয়ে চূড়ান্ত কারণ উপস্থিত হইল, যখন গিরিশচন্দ্র ঠাকুরের আশ্রয় লাভ এবং তাঁহাকে যুগাবতার বলিয়া স্থির ধারণাপূর্ব্বক প্রাণের উল্লাসে সাধারণের সম্মুখে ঐ কথা হাঁকিয়া ডাকিয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ঠাকুরের সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণা ইতিপূর্ব্বে অনেকের প্রাণে উপস্থিত হইলেও তাহারা সকলে তাঁহার নিষেধ মানিয়া ঐ বিষয় প্রাণের মধ্যে লুকায়িত রাখিয়াছিল—কারণ ঠাকুর চিরকাল একথা বলিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহার দেহরক্ষার অনতিকাল পূর্ব্বেই বহুলোকে তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া জানিতে পারিবে। গিরিশচন্দ্রের মনের গঠন অন্যরূপ ছিল, তিনি দুষ্কর্ম্ম বা সুকর্ম্ম যাহা কিছু করিয়াছেন আজীবন কখনও লুকাইয়া করিতে পারেন নাই, সুতরাং ঐ বিষয়েও ঠাকুরের নিষেধ মানিয়া চলিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রখর বুদ্ধি, উচ্চাবচ ঘটনা-বলীপূর্ণ বিচিত্র জীবন এবং প্রাণের অসীম উৎসাহ ও বিশ্বাসই যে তাঁহাকে ঠাকুরের দিব্যশক্তির অনন্ত প্রভাবের কথা বুঝাইয়া তাঁহার হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে সহায়তা করিয়াছে, একথা ভুলিয়া যাইয়া তিনি স্বয়ং যাহা করিয়াছেন তাহাই করিবার জন্য

সকলকে মুক্তকণ্ঠে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ফলে আন্তরিকতার পরিবর্ত্তে লোকে মুখে বকল্‌মা দিয়াছি, আত্মসমর্পণ করিয়াছি ইত্যাদি বলিয়া সাধন, ভজন, ত্যাগ ও তপস্যাদির প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষাপূর্ব্বক ধর্ম্মলাভ ব্যাপারটাকে সুখসাধ্য করিয়া লইল। ঠাকুরের প্রতি গিরিশচন্দ্রের অসীম ভালবাসা ঐ বিষয় প্রচারের পথে অন্তরায় হইতে পারিত, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যুগযুগান্তের গ্লানি দূরপূর্ব্বক অভিনব ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের জন্য যাঁহার দেহধারণ এবং ত্রিতাপে তাপিত জীবকুলকে আশ্রয় দিবার জন্যই যিনি জন্মজরাদি দুঃখ-কষ্ট স্বেচ্ছায় বহন করিতেছেন, অভীষ্ট কার্য্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার দেহাবসান কখন সম্ভবপর নহে। সুতরাং ঠাকুরের আশ্রয় লাভপূর্ব্বক লোকে তাঁহার ন্যায় শান্তি ও দিব্যোল্লাসের অধিকারী হইবে বলিয়া তিনি যে তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন তাহাতে দূষণীয় কিছুই নাই।

উহার বৃদ্ধি বিষয়ে গিরিশের অনুসরণে রামচন্দ্রের চেষ্টা

গিরিশচন্দ্রের প্রখর বুদ্ধি ও যুক্তিতর্কের সম্মুখে রামচন্দ্র প্রমুখ অনেক প্রবীণ গৃহী ভক্তের বুদ্ধি তখন ভাসিয়া গিয়াছিল। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, রামচন্দ্র বৈষ্ণববংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং দিব্যশক্তির বিকাশ দেখিয়া তিনি যে ঠাকুরকে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের প্রচারের পূর্ব্বে তিনি উহা অনেকটা রাখিয়া-ঢাকিয়া লোকসমক্ষে প্রকাশ করিতেন। এখন গিরিশচন্দ্রের সহায়তা পাইয়া তাঁহার উৎসাহ ঐ বিষয়ে সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তিনি এখন ঠাকুরকে অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না

কিন্তু তাঁহার ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণাবতারে কে কোন্ সাঙ্গোপাঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল, সময়ে সময়ে তদ্বিষয়ের জল্পনাও করিতে লাগিলেন এবং বলা বাহুল্য, সাময়িক ভাবুকতার উচ্ছ্বাসে যাহাদিগের এখন শারীরিক বিকৃতি এবং কখন কখন বাহ্যসংজ্ঞার লোপ হইতেছিল, তাহারা তৎকৃত সিদ্ধান্তে উচ্চস্থান লাভ করিতে থাকিল।

ঠাকুরের যুগাবতারত্বে বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক ভক্তগণের অনেকে যখন ঐরূপে ভাবুকতার উচ্ছ্বাসে অঙ্গ ঢালিতেছিল, তখন শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ঢাকা হইতে আগমন এবং ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়া সকলের সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করা যে, তিনি ঢাকায় গৃহমধ্যে বসিয়া ধ্যান করিবার কালে ঠাকুর তথায় সশরীরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তিনি (বিজয়) তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বহস্তে স্পর্শ করিয়া দেখিয়াছিলেন[১]—অগ্নিতে ইন্ধন সংযোগের ন্যায় ফলদ হইয়াছিল। ঐরূপে নানা প্রকারে ভাবুকতার বৃদ্ধিতে ভক্তগণের মধ্যে পাঁচ-সাত জনের তখন ভজন-সঙ্গীতাদি শুনিবামাত্র বাহ্যসংজ্ঞার আংশিক লোপ ও শারীরিক বিকৃতি উপস্থিত হইতেছিল এবং অনেকেই সহজ-বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিচারের প্রশস্ত পথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ঠাকুরের দৈবশক্তি প্রভাবে কখন কি অঘটন ঘটিয়া বসিবে, এইরূপ একটা ভাব লইয়া সর্ব্বদা উদ্গ্রীব হইয়া থাকিতে অভ্যস্ত হইতেছিল।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ঐ বিষয়ে সহায়তা

১ 'লীলাপ্রসঙ্গ—গুরুভাব', উত্তরার্দ্ধ, ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ঐরূপে ভাবুকতার বৃদ্ধিই যখন ধর্ম্মের চূড়ান্ত বলিয়া ভক্তগণের মধ্যে পরিগণিত হইতেছিল, তখন ত্যাগ, সংযম ও নিষ্ঠাদির তুলনায় উহা যে অতি অকিঞ্চিৎকর বস্তু এবং উহার নির্বাধ প্রশ্রয়ে ভবিষ্যতে বিষম বিপদের সম্ভাবনা আছে—একথা ঠাকুর যাঁহাকে ভক্তগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চাসন সর্ব্বদা প্রদান করিতেন, সেই সূক্ষ্মদর্শী নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। তিনি ঐ বিষয় বুঝাইয়া উহার হস্ত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। প্রশ্ন হইতে পারে, ভক্তগণের ঐরূপে বিপথে যাইবার সম্ভাবনা দেখিয়াও ঠাকুর নিশ্চেষ্ট ছিলেন কেন? উত্তরে বলা যায় তিনি নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, কিন্তু যে ভাবুকতায় কোনরূপ কৃত্রিমতা নাই, তাহাকে ঈশ্বরলাভের অন্যতম পথ জানিয়া ঐসকল ভক্তগণের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি ঐপথের যথার্থ অধিকারী তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে ঐ পথে চালিত করিবার সময় ও সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন—কারণ, তাঁহাকে আমরা বারংবার বলিতে শুনিয়াছি, 'ইচ্ছা করিলেই সহসা কোন বিষয় সংসিদ্ধ হয় না, কালে হইয়া থাকে', অথবা ঐ বিষয়ের সিদ্ধি উপযুক্ত কালের আগমন প্রতীক্ষা করে। হইতেও পারে, ভক্তগণের ঐ ভ্রম দূর করিতে নরেন্দ্রনাথকে বদ্ধপরিকর দেখিয়া ঠাকুর উহার ফলাফল লক্ষ্য করিতেছিলেন, অথবা নরেন্দ্রনাথকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া ঐ বিষয় সংসিদ্ধ করাই তাঁহার অভীপ্সিত ছিল।

নরেন্দ্রের ঐ বিষয় খর্ব্ব করিয়া ভক্তদিগের মধ্যে ত্যাগ-সংযমাদি-বৃদ্ধির চেষ্টা—ঠাকুর ঐ চেষ্টা করেন নাই কেন

দৃঢ়বদ্ধ শরীর এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ মন-বিশিষ্ট যুবক ভক্তমণ্ডলীই তাঁহার কথা সহজে ধরিতে-বুঝিতে পারিবে ভাবিয়া নরেন্দ্রনাথ

নানা যুক্তিতর্ক সহায়ে তাহাদিগকে সর্ব্বদা বলিতে লাগিলেন, "যে ভাবোচ্ছ্বাস মানব জীবনে স্থায়ী পরিবর্ত্তন উপস্থিত না করে, যাহার প্রভাব মানবকে এইক্ষণে ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলিয়া পরক্ষণে কামকাঞ্চনের অনুসরণ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না, তাহার গভীরতা নাই, সুতরাং তাহার মূল্যও অতি অল্প। উহার প্রভাবে কাহারও শারীরিক বিকৃতি যথা অশ্রু-পুলকাদি, অথবা কিছুক্ষণের জন্য বাহ্যসংজ্ঞার আংশিক লোপ হইলেও তাঁহার নিশ্চয় ধারণা, উহা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যপ্রসূত; মানসিক শক্তিবলে উহাকে দমন করিতে না পারিলে পুষ্টিকর খাদ্য এবং চিকিৎসকের সহায়তা গ্রহণ করা মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য।"

জীবনে স্থায়ী পরিবর্ত্তন আনে না বলিয়া ভাবুকতার মূল্য অল্প

নরেন্দ্র বলিতেন, "ঐরূপ অঙ্গবিকার এবং বাহ্যসংজ্ঞা লোপের ভিতর অনেকটা কৃত্রিমতা আছে। সংযমের বাঁধ যত উচ্চ এবং দৃঢ় হইবে মানসিক ভাব তত গভীর হইতে থাকিবে, এবং বিরল কোন কোন ব্যক্তির জীবনেই আধ্যাত্মিক ভাবরাশি প্রবলতায় উত্তাল তরঙ্গের আকার ধারণ করিয়া ঐরূপ সংযমের বাঁধকেও অতিক্রম-পূর্ব্বক অঙ্গবিকার এবং বাহ্যসংজ্ঞার বিলোপরূপে প্রকাশিত হয়। নির্ব্বোধ মানব ঐকথা বুঝিতে না পারিয়া বিপরীত ভাবিয়া বসে। সে মনে করে, ঐরূপ অঙ্গবিকৃতি ও সংজ্ঞাবিলুপ্তির ফলেই বুঝি ভাবের গভীরতা সম্পাদিত হয় এবং তজ্জন্য ঐ সকল যাহাতে তাহার শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত হয়, তদ্বিষয়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক চেষ্টা করিতে থাকে। ঐরূপে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চেষ্টা ক্রমে অভ্যাসে পরিণত হয় এবং

অশ্রুপুলকাদি শারীরিক বিকৃতির মধ্যে অনেক সময় কৃত্রিমতা থাকে

তাহার স্নায়ুসকল দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া ঈষন্মাত্র ভাবের উদয়েও তাহাতে ঐ বিকৃতিসকল উপস্থিত করে। ফলে উহার অবাধ প্রশ্রয়ে মানব চরমে চিররুগ্ন অথবা বাতুল হইয়া যায়। ধর্ম্মসাধনে অগ্রসর হইয়া শতকরা আশী জন জুয়াচোর এবং পনর জন আন্দাজ উন্মাদ হইয়া যায়। অবশিষ্ট পাঁচজন মাত্র পূর্ণ সত্যের সাক্ষাৎকারে ধন্য হইয়া থাকে। অতএব সাবধান।"

কোন কোন ভক্তের আচরণ দেখিয়া নরেন্দ্রের কথায় বিশ্বাস

নরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বোক্ত কথাসকল সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া আমরা প্রথম প্রথম বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। কিন্তু অনতিকাল পরে ঘটনাচক্রে যখন জানিতে পারা গেল নির্জ্জনে বসিয়া ভাবোদ্দীপক পদাবলী গাহিতে গাহিতে অনুরূপ অঙ্গবিকৃতিসকল আনয়নের জন্য জনৈক ভক্ত চেষ্টা করিয়া থাকে—ভাবাবেশে বাহ্যসংজ্ঞার আংশিক বিলোপ হইলে অপর জনৈক ভক্ত যেরূপ মধুর নৃত্য করে, সেইরূপ নৃত্য সে পূর্ব্বে অভ্যাস করিয়াছিল—এবং পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির নৃত্য দেখিবার স্বল্পকাল পরে অপর এক ব্যক্তিও ভাবাবিষ্ট হইয়া তদনুরূপ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, তখন তাঁহার (নরেন্দ্রনাথের) কথার সত্যতা আমাদিগের অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হইল। আবার, জনৈক ভক্তের পূর্ব্বাপেক্ষা ঘন ঘন ভাবাবেশ হইতে দেখিয়া যেদিন তিনি তাহাকে বিরলে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া ভাবসংযম অভ্যাস ও অপেক্ষাকৃত পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন করিতে অনুরোধ করিলেন এবং এক পক্ষকাল ঐরূপ করিবার ফলে সে যখন অনেকটা সুস্থ ও সংযত হইতে পারিল, তখন নরেন্দ্রনাথের কথায় অনেকে বিশ্বাস স্থাপন-পূর্ব্বক তাহাদিগের ন্যায় ভাবাবেশে অঙ্গবিকৃতি ও বাহ্যসংজ্ঞাবিলুপ্তি

হয় নাই বলিয়া আপনাদিগকে অভাগ্যবান্ বলিয়া আর ধারণা করিতে পারিল না।

যুক্তিতর্ক অবলম্বনে ঐবিষয় প্রচার করিয়াই নরেন্দ্র ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু কাহারও ভাবুকতায় কিছুমাত্র কৃত্রিমতার সন্ধান পাইলে ঐ বিষয় লইয়া সকলের সমক্ষে ব্যঙ্গ পরিহাসে তাহাকে সময়ে সময়ে বিশেষ অপ্রতিভ করিতেন। আবার, পুরুষের স্ত্রীজনোচিত ভাবানুকরণ, যথা—বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রচলিত সখীভাবাদি সাধনাভ্যাস কখন কখন কিরূপ হাস্যাস্পদ আকার ধারণ করে, তদ্বিষয়ে প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি ভক্তদিগের মধ্যে কখন কখন হাস্যের রোল তুলিতেন এবং আমাদিগের মধ্যে যাহাদিগের ঐরূপ ভাবপ্রবণতা ছিল, তাহাদিগকে সখী-শ্রেণীভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া পরিহাস করিতেন। ফলকথা, ধর্ম্মসাধনে অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া পুরুষ নিজ পুরুষকার, তত্ত্বানুসন্ধানপ্রবৃত্তি, ওজস্বিতাদি বিসর্জ্জন দিয়া সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিবে এবং স্ত্রীজনোচিত ভাবানুকরণ, বৈষ্ণবপদাবলী ও রোদনমাত্র অবলম্বন করিবে ইহা —পুরুষসিংহ নরেন্দ্রনাথ একেবারেই সহ্য করিতে পারিতেন না— তজ্জন্য ঠাকুরের পুরুষভাবাশ্রয়ী জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বিশিষ্ট ভক্তদিগকে 'শিবের ভূত অথবা দানা-শ্রেণীভুক্ত' বলিয়া পরিহাসপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিতেন এবং তদ্বিপরীত সকলকে পূর্ব্বোক্তরূপে 'সখী-শ্রেণীভুক্ত' বলিতেন।

ভাবুকতা লইয়া নরেন্দ্রের ব্যঙ্গ পরিহাস—দানা ও সখী

ঐরূপে যুক্তিতর্কে এবং ব্যঙ্গ-পরিহাস সহায়ে ভাবুকতার গণ্ডী ভগ্ন করিয়াই নরেন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত হন নাই। কাহারও কোনরূপ

ভাব ভঙ্গ করিয়া তাহার স্থলে অবলম্বনস্বরূপে অন্য ভাব যতক্ষণ না প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়, ততক্ষণ প্রচার-কার্য্য সুসম্পন্ন ও ফলপ্রদ হয় না—একথা তিনি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেন এবং তজ্জন্য ঐ বিষয়ে এখন হইতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। অবসরকালে যুবক-ভক্তসকলকে দলবদ্ধ করিয়া তিনি সংসারের অনিত্যতা, বৈরাগ্য এবং ঈশ্বরভক্তিমূলক সঙ্গীতসকল তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া গাহিয়া তাহাদিগের প্রাণে ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং ভক্তিভাব অনুক্ষণ প্রদীপ্ত রাখিতেন। ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়া অনেকে তখন তাঁহার মধুর স্বরলহরী উৎক্ষিপ্ত 'কেয়া দেলমান তামিল পেয়ারা আখের মাট্টিমে মিল যানা', অথবা—'জীবন মধুময় তব নামগানে হয় হে, অমৃতসিন্ধু চিদানন্দঘন হে', অথবা—

ভাবুকতার স্থলে যথার্থ বৈরাগ্য ও ঈশ্বরপ্রেম প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা

মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥

প্রভৃতি সঙ্গীত ও স্তবাদি শ্রবণে বৈরাগ্য ও ঈশ্বর-প্রেমের উত্তেজনায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ঠাকুরের জীবনের গভীর ঈশ্বরানুরাগপ্রসূত সাধন-কথাসকল বিবৃত করিয়া কখন বা তিনি তাহাদিগকে তাঁহার মহিমাজ্ঞাপনে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করিতেন এবং 'ঈশানু-সরণ' গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতেন, 'প্রভুকে যে যথার্থ ভালবাসিবে তাহার জীবন সর্ব্বতোভাবে শ্রীপ্রভুর

ঠাকুরকে ভালবাসিলে তাঁহার সদৃশ জীবন হইবে

জীবনের অনুযায়ী হইয়া গঠিত হইয়া উঠিবে,—অতএব ঠাকুরকে আমরা ঠিক ঠিক ভালবাসি কি-না তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ উহা হইতেই পাওয়া যাইবে।' আবার 'অদ্বৈত-জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যাহা ইচ্ছা তাহা কর্'—ঠাকুরের ঐকথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া বুঝাইয়া দিতেন, তাঁহার সকলপ্রকার ভাবুকতা ঐ জ্ঞানকে ভিত্তিস্বরূপে অবলম্বন করিয়া উত্থিত হইয়া থাকে—অতএব ঐ জ্ঞান যাহাতে সর্ব্বাগ্রে লাভ করিতে পারা যায় তজ্জন্য তাহাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

ভক্তগণকে নূতন তত্ত্বসকল পরীক্ষাপূর্ব্বক গ্রহণ করাইবার চেষ্টা

নূতন তত্ত্বসকলের পরীক্ষাপূর্ব্বক গ্রহণে তিনি তাঁহাদিগকে অনেক সময়ে প্রোৎসাহিত করিতেন। আমাদের স্মরণ আছে, ধ্যান বা চিত্তৈকাগ্রতা সহায়ে আপনার ও অপরের শারীরিক ব্যাধি দূর করা যাইতে পারে, ঐকথা শুনিয়া তিনি একদিন আমাদিগকে একত্র মিলিত করিয়া ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি দূর করিবার মানসে দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহমধ্যে ঐরূপ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐরূপ আবার, অযুক্তিকর বিষয়সকল হইতে ভক্তগণ যাহাতে দূরে অবস্থান করে, তদ্বিষয়েও তিনি সর্ব্বদা প্রয়াস পাইতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নলিখিত ঘটনাটির উল্লেখ করা যাইতে পারে—

মতিঝিলের দক্ষিণাংশ যথায় কাশীপুরের রাস্তার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, তাহারই সম্মুখে রাস্তার অপর পার্শ্বে মহিমাচরণ চক্রবর্ত্তীর বাটী ছিল। নানা সদ্‌গুণভূষিত হইলেও চক্রবর্ত্তী মহাশয় লোকমান্যের জন্য নিরন্তর লালায়িত ছিলেন। বোধ হয়

মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলে যদি লোকমান্য পাওয়া যাইত তাহা হইলে তাহা করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। কিসে লোকে তাঁহাকে ধনী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ধার্ম্মিক, দানশীল ইত্যাদি যাবতীয় সদ্‌গুণশালী বলিবে, এই ভাবনা তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্য নিয়মিত করিয়া সময়ে সময়ে তাঁহাকে লোকের নিকটে হাস্যাস্পদ করিয়াও তুলিত। চক্রবর্ত্তী মহাশয় কোন সময়ে এক অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন, 'প্রাচ্য-আর্য্য-শিক্ষা-কাণ্ড-পরিষৎ', তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন, 'মৃগাঙ্ক-মৌলী পূততুণ্ডী,' বাটীতে একটি হরিণ ছিল তাহার নামকরণ করিয়াছিলেন, 'কপিঞ্জল'। কারণ তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তির ছোটখাট সরল নাম রাখা কি শোভা পায়? তাঁহার ইংরাজী, সংস্কৃত নানা গ্রন্থ সংগ্রহ ছিল। আলাপ হইবার পরে একদিন নরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বাটীতে যাইয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'চক্রবর্ত্তী মহাশয়, আপনি এত গ্রন্থ সব পড়িয়াছেন?' উত্তরে তিনি সবিনয়ে উহা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই নরেন্দ্র উহার মধ্যস্থিত কতকগুলি গ্রন্থ বাহির করিয়া উহাদিগের পাতা কাটা নাই দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন, 'কি জান ভায়া, লোকে আমার পড়া পুস্তকগুলি লইয়া যাইয়া আর ফিরাইয়া দেয় নাই, তাহার স্থলে এই পুস্তকগুলি পুনরায় কিনিয়া রাখিয়াছি, এখন আর কাহাকেও পুস্তক লইয়া যাইতে দিই না।' নরেন্দ্রনাথ কিন্তু স্বল্প দিনেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সংগৃহীত যাবতীয় পুস্তকেরই পাতা কাটা নাই! সুতরাং

মহিম চক্রবর্ত্তীর লোকমান্যলাভের লালসা

ঐ সকল গ্রন্থ যে তিনি কেবলমাত্র লোকমান্যলাভ ও গৃহশোভা বর্দ্ধনের জন্য রাখিয়াছেন, তদ্বিষয়ে নরেন্দ্রের একরূপ দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল।

আমাদের সহিত আলাপ হইবার কালে ধর্ম্মসাধনার কথাপ্রসঙ্গে চক্রবর্ত্তী মহাশয় আপনাকে জ্ঞানমার্গের সাধক বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। কলিকাতাবাসী ভক্তসকলের ঠাকুরের নিকট যাইবার বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতে মহিমাচরণ দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন এবং কোন কোন পর্ব্বদিবসে পঞ্চবটীতলে ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিছাইয়া গেরুয়াবস্ত্র পরিধান, রুদ্রাক্ষ ধারণ ও একতারা গ্রহণপূর্ব্বক আড়ম্বর করিয়া সাধনায় বসিতেন। গৃহে ফিরিবার কালে ব্যাঘ্রাজিনখানি ঠাকুরের ঘরের এক কোণে দেয়ালের গায়ে ঝুলাইয়া রাখিয়া যাইতেন। ঠাকুর তাঁহাকে 'এক আঁচড়েই' চিনিয়া লইয়াছিলেন। কারণ ঐ ব্যাঘ্রাজিনখানি কাহার, একথা আমাদিগের একজন এক দিবস প্রশ্ন করিলে বলিয়াছিলেন, "ওখানি মহিম চক্রবর্ত্তী রাখিয়া গিয়াছে। কেন জান? লোকে উহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিবে ওখানি কার এবং আমি তাহার নাম করিলে ধারণা করিবে মহিম চক্রবর্ত্তী একটা মস্ত সাধক।"

জ্ঞানী মহিমের ব্যাঘ্রাজিন

দীক্ষাসম্বন্ধে কথা উঠিলে মহিম বাবু কখন বলিতেন, "আমার গুরুদেবের নাম আগমাচার্য্য ডমরুবল্লভ।" আবার কখন বলিতেন, "ঠাকুরের ন্যায় তিনিও পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত তোতাপুরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন! পশ্চিমে তীর্থপর্য্যটনকালে এক স্থানে তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলাম

মহিমের গুরু

এবং দীক্ষিত হইয়াছিলাম, ঠাকুরকে তিনি ভক্তি অবলম্বন করিয়া থাকিতে বলিয়াছেন এবং আমাকে জ্ঞানমার্গের সাধক হইয়া সংসারে থাকিতে উপদেশ করিয়াছেন।" বলা বাহুল্য ঐকথা কতদূর সত্য তাহা তিনি স্বয়ং এবং সর্ব্বান্তর্য্যামী পুরুষই জানিতেন।

সাধনার মধ্যে দেখা যাইত মহিম বাবু যখন তখন এবং যেখানে সেখানে একতারার সুরের সহিত গলা মিলাইয়া প্রণবোচ্চারণ, মধ্যে মধ্যে এক-আধটি উত্তরগীতাদি পুস্তকের শ্লোক পাঠ ও হুঁঙ্কারধ্বনি করিতেন। তিনি বলিতেন, উহাই সনাতন জ্ঞানমার্গের সাধনা, উহা করিলে অন্য কোনও সাধনা করিবার প্রয়োজন নাই। উহাতেই কুলকুণ্ডলিনী জাগরিতা হইয়া উঠিবে এবং ঈশ্বরদর্শন হইবে। মহিম বাবুর বাটীতে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং বোধ হয় প্রতি বৎসর ৺জগদ্ধাত্রীপূজাও হইত—উহা হইতে অনুমিত হয় তিনি শাক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষজীবনে ইনি শাক্ত-সাধনপ্রণালীই অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কারণ তখন ইঁহাকে একখানি ছোট বগি-গাড়ীতে করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিবার কালে মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া বলিতে শুনা যাইত, 'তারা তত্ত্বমসি, ত্বমসি তৎ।' চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অল্প-স্বল্প জমিদারী ছিল, তাহার আয় হইতেই তাঁহার সংসার নির্ব্বাহ হইত।

মহিম বাবুর ধর্ম্ম-সাধনা

ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান করিবার কালে মহিম বাবু দুই-তিন বার তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তখন ঠাকুরের সহিত কুশল-প্রশ্নাদি করিবার পরে তিনি সাধারণের নিমিত্ত যে

ঘর নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাতে আসিয়া বসিতেন এবং একতারা-সংযোগে মন্ত্রসাধনে এবং উহারই ভিতর মধ্যে মধ্যে অপরের সহিত ধর্ম্মালাপে নিযুক্ত হইতেন। তাঁহার গৈরিকপরিহিত সুন্দর কান্তি, বিশাল বপু এবং বাক্যচ্ছটায় মুগ্ধ হইয়া অনেকে তখন তাঁহাকে আধ্যাত্মিক নানা প্রশ্ন করিতে থাকিত। ঠাকুরও কখন কখন তাঁহাকে বলিতেন, "তুমি পণ্ডিত, (উপস্থিত সকলকে দেখাইয়া) ইহাদিগকে কিছু উপদেশ দাও গে।" কারণ কতকগুলি শিষ্য সংগ্রহপূর্ব্বক ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়া নিজ নাম জাহির করাটা যে তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা, একথা তাঁহার জানিতে বাকি ছিল না।

শ্যামপুকুরে মহিমাচরণ

শ্যামপুকুরে আসিয়া মহিম বাবু একদিন ঐরূপে নানা কথা কহিতে লাগিলেন এবং অন্য সকলপ্রকার সাধনোপায়কে হীন করিয়া তাঁহার অবলম্বিত সাধনপথই শ্রেষ্ঠ এবং সহজ, ইহা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের যুবকভক্ত-সকলে তাঁহার ঐ কথাসকল বিনা প্রতিবাদে শুনিতেছে দেখিয়া নরেন্দ্রনাথের আর সহ্য হইল না। তিনি বিপরীত তর্ক উত্থাপিত করিয়া মহিম বাবুর কথা অযুক্তিকর দেখাইতে লাগিলেন এবং বলিলেন, 'আপনার ন্যায় একতারা বাজাইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিলেই যে ঈশ্বর-দর্শন উপস্থিত হইবে তাহার প্রমাণ কি?' উত্তরে মহিম বাবু বলিলেন, 'নাদই ব্রহ্ম, ঐ স্বরসংযুক্ত মন্ত্রোচ্চারণের প্রভাবে ঈশ্বরকে দেখা দিতেই হইবে, অন্য আর কিছু করিবার আবশ্যক নাই।' নরেন্দ্র বলিলেন, 'ঈশ্বর আপনার সহিত ঐরূপ লেখা-পড়া করিয়াছেন না কি? অথবা ঈশ্বর

মহিম ও নরেন্দ্রের তর্ক

মন্ত্রৌষধিবশ সর্পের ন্যায়—সুর চড়াইয়া হম্‌-হাম্‌ করিলেই অবশ হইয়া সুড়্‌সুড়্‌ করিয়া সম্মুখে নামিয়া আসিবেন!' বলা বাহুল্য, নরেন্দ্রনাথের তর্কের জন্য মহিম বাবুর প্রচার কার্য্যটা সেদিন বিশেষ জমিল না এবং তিনি ঐ দিবস শীঘ্র শীঘ্র বিদায় গ্রহণ করিলেন।

নরেন্দ্রের যথার্থ সাধকসকলকে সমান জ্ঞান করিতে শিক্ষা দেওয়া

ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত যথার্থ সাধকসকলে যাহাতে ঠাকুরের ভক্তদিগের নিকটে বিশেষ সম্মান পায়, তদ্বিষয়েও নরেন্দ্রনাথের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি বলিতেন, সাধারণে যেরূপে অপর সকলের নিন্দা এবং কেবলমাত্র নিজ সম্প্রদায়ের সাধকসকলকেই শ্রদ্ধা-ভক্তি করে, ঐরূপ করিলে ঠাকুরের 'যত মত তত পথ'-রূপ মতবাদের উপরে—সুতরাং ঠাকুরের উপরেই অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। শ্যামপুকুরে থাকিবার কালে ঐরূপ একটি ঘটনার কথা আমাদিগের স্মরণ হইতেছে—

খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক প্রভুদয়াল মিশ্র

প্রভুদয়াল মিশ্র নামক জনৈক খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য একদিন উপস্থিত হইলেন। গেরুয়া পরিহিত দেখিয়া আমরা তাঁহাকে প্রথমে খৃষ্টান বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। পরে কথাপ্রসঙ্গে তিনি যখন তাঁহার স্বরূপ পরিচয় প্রদান করিলেন, তখন তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল, তিনি খৃষ্টান হইয়া গৈরিক বস্ত্র ব্যবহার করেন কেন? তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ভাগ্যক্রমে ঈশামসির উপর বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে নিজ ইষ্টদেবতারূপে গ্রহণ করিয়াছি বলিয়াই কি আমাকে আমার পিতৃপিতামহাগত চালচলনাদি

ছাড়িয়া দিতে হইবে? আমি যোগশাস্ত্রে বিশ্বাস এবং ঈশাকে ইষ্টদেবতারূপে অবলম্বন করিয়া নিত্য যোগাভ্যাস করিয়া থাকি। জাতিভেদে আমার বিশ্বাস না থাকিলেও যাহার-তাহার হস্তে ভোজনে যোগাভ্যাসের হানি হয়, এ কথায় আমি বিশ্বাস করি এবং নিত্য স্বপাকে হবিষ্যান্ন খাইয়া থাকি। উহার ফলে খৃষ্টান হইলেও যোগাভ্যাসের ফল—যথা, জ্যোতিঃদর্শনাদি আমার একে একে উপস্থিত হইতেছে। ভারতের ঈশ্বরপ্রেমিক যোগীরা সনাতন-কাল হইতে গৈরিক পরিধান করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং উহাপেক্ষা আমার নিকটে অন্য কোন প্রকার বসন কি প্রিয়তর হইতে পারে?" প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া নরেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রাণের কথাসকল ঐরূপে একে একে বাহির করিয়া লইয়াছিলেন এবং সাধু ও যোগী জানিয়া তাঁহাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাদিগকেও ঐরূপ করিতে শিক্ষাপ্রদান করিয়াছিলেন। আমাদিগের অনেকেও উহাতে তাঁহার পাদস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম ও তাঁহার সহিত একত্রে ঠাকুরের প্রসাদী মিষ্টান্নাদি ভোজন করিয়াছিল। ঠাকুরকে ইনি সাক্ষাৎ ঈশা বলিয়া নিজ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের ব্যাধির বৃদ্ধি ও ভক্তগণের তাঁহাকে কাশীপুর যাওয়া

ঐরূপে নরেন্দ্রনাথ যখন ঠাকুরের ভক্তগণকে সুপথে পরিচালিত করিতে নিযুক্ত ছিলেন, তখন ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। ডাক্তার সরকার পূর্ব্বে যে-সকল ঔষধপ্রয়োগে স্বল্পাধিক ফল পাইয়াছিলেন, ঐ সকল ঔষধে এখন আর কোন উপকার হইতেছে না দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং কলিকাতার দূষিত বায়ুর জন্য ঐরূপ হইতেছে স্থির করিয়া সহরের

বাহিরে কোন বাগানবাটীতে ঠাকুরকে রাখিবার জন্য পরামর্শ প্রদান করিলেন। তখন অগ্রহায়ণের অর্দ্ধেক অতীত হইয়াছে। পৌষ মাসে ঠাকুর বাটী পরিবর্ত্তন করিতে চাহিবেন না জানিয়া ভক্তগণ এখন উঠিয়া পড়িয়া ঐরূপ বাগানবাটীর অনুসন্ধানে লাগিয়া যাইলেন এবং অনতিকালের মধ্যেই কাশীপুরস্থ মতিঝিলের উত্তরাংশ যেখানে বরাহনগর-বাজারে যাইবার বড় রাস্তার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, তাহারই সম্মুখে রাস্তার অপর (পূর্ব্ব) পার্শ্বে অবস্থিত ৺রাণী কাত্যায়নীর জামাতা ৺গোপালচন্দ্র ঘোষের উদ্যানবাটী ৮০৲ টাকা মাসিক ভাড়ায় ঠাকুরের বাসের জন্য ভাড়া করিয়া লইলেন। ঠাকুরের পরমভক্ত কলিকাতার সিমুলিয়া পল্লীনিবাসী সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় উক্ত বাটীভাড়ার সমস্ত ব্যয়বহনে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

বাটী স্থির হইলে শুভদিন দেখিয়া শ্যামপুকুর হইতে দ্রব্যাদি লইয়া যাইয়া উক্ত বাটীতে থাকিবার বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। পরিশেষে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির এক দিবস পূর্ব্বে অপরাহ্নে ভক্তগণ শ্যামপুকুরের বাসা হইতে ঠাকুরকে কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে আনয়ন করিলেন এবং ফলপুষ্পসমন্বিত বৃক্ষরাজিশোভিত ঐস্থানের মুক্তবায়ু, নির্জ্জনতা প্রভৃতি দর্শনে ঠাকুরকে আনন্দিত দেখিয়া পরম চিত্তপ্রসাদ লাভ করিলেন।

পরিশিষ্ট

কাশীপুরের উদ্যান-বাটী

কলিকাতার উত্তরাংশে যে প্রশস্ত রাস্তাটি প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত বরাহনগরকে বাগবাজার পল্লীর সহিত সংযুক্ত রাখিয়াছে তাহার উপরেই কাশীপুরের উদ্যান-বাটী বিদ্যমান।

বাগবাজার পুলের উত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া উক্ত উদ্যানের কিছুদূর দক্ষিণে অবস্থিত কাশীপুরের চৌরাস্তা পর্য্যন্ত ঐ রাস্তার প্রায় উভয় পার্শ্বেই দরিদ্র মুটেমজুর-শ্রেণীর লোকসমূহের থাকিবার কুটীর এবং তাহাদিগেরই দৈনন্দিন জীবননির্ব্বাহের উপযোগী দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপণিসকল দেখিতে পাওয়া যায়, উহার মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকখানি ইষ্টকালয়—যথা, কয়েকটি পাটের গাঁট বাঁধিবার কুঠি, দাস কোম্পানির লৌহের কারখানা, রেলির কুঠি, দুই-একখানি উদ্যান বা বাসভবন ও কাশীপুরের চৌরাস্তার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত পুলিসের ও অগ্নিভয়নিবারক ইঞ্জিনাদি রক্ষার কুঠি এবং উহারই পশ্চিমে অনতিদূরে ৺সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর সুপ্রসিদ্ধ মন্দির—যেন মানবদিগের মধ্যে বিষম অবস্থাভেদের সাক্ষ্যপ্রদান করিবার জন্যই দণ্ডায়মান। শিয়ালদহ রেলওয়ের উন্নতি ও বিস্তৃতি হওয়ায় অধুনা আবার উক্ত রাস্তার ধারে অনেকগুলি টিনের ছাদসংযুক্ত গুদাম ইত্যাদি নির্ম্মিত হইয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উহার যাহা কিছু সৌন্দর্য্য ছিল তাহারও অধিকাংশের বিলোপসাধন করিয়াছে। ঐরূপে ঐ প্রাচীন রাস্তাটি নয়নপ্রীতিকর

না হইলেও ঐতিহাসিকের চক্ষে উহার কিছু মূল্য আছে। কারণ শুনা যায়, এই পথ দিয়া অগ্রসর হইয়াই নবাব সিরাজ গোবিন্দপুরের বৃটিশ দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন এবং বাগবাজার হইতে কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ মাইল উত্তরে উহারই একাংশে মসীমুখ নবাব মীর্জাফরের এক প্রাসাদ এককালে অবস্থিত ছিল। ঐরূপে বাগবাজার হইতে কাশীপুরের চৌমাথা পর্য্যন্ত পথটি মনোজ্ঞদর্শন না হইলেও উহার পর হইতে বরাহনগরের বাজার পর্য্যন্ত বিস্তৃত উহার অংশটি দেখিতে মন্দ ছিল না। উক্ত চৌমাথা হইতে উত্তরে স্বল্পদূর অগ্রসর হইলেই মতিঝিলের দক্ষিণাংশ এবং উহার বিপরীতে রাস্তার পূর্ব্ব পার্শ্বে আমাদিগের পরিচিত ৺মহিমাচরণ চক্রবর্ত্তীর সুন্দর বাসভবন তৎকালে দেখা যাইত। রেল কোম্পানি অধুনা উক্ত বাটীর চতুঃপার্শ্বস্থ উদ্যানের অধিকাংশ ক্রয় করিয়া উহার ভিতর দিয়া রেলের এক শাখা গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া উহাকে এককালে শ্রীহীন করিয়াছে। ঐস্থান হইতে আরও কিছু দূর উত্তরে অগ্রসর হইলে বামে মতিঝিলের উত্তরাংশ এবং তদ্বিপরীতে রাস্তার পূর্ব্ব পার্শ্বে কাশীপুর উদ্যানের উচ্চ প্রাচীর ও লৌহময় ফটক নয়নগোচর হয়। মতিঝিলের পশ্চিমাংশের পশ্চিমে অবস্থিত রাস্তার ধারে কয়েকখানি সুন্দর উদ্যান-বাটী গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল, তন্মধ্যে ৺মতিলাল শীলের উদ্যানই—যাহা এখন কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানির হস্তগত হইয়া ইতিপূর্ব্বের বিরাম ও সৌন্দর্য্যের ভাব হারাইয়া কর্ম্ম ও ব্যবসায়ের ব্যস্ততা ও উচ্চ ধ্বনিতে সর্ব্বদা মুখরিত রহিয়াছে—প্রশস্ত ও বিশেষ মনোজ্ঞ ছিল। মতি শীলের উদ্যানের উত্তরে তখন বসাকদিগের একখানি ভগ্ন বাসভবন গঙ্গাতীরে

অবস্থিত ছিল। রাস্তা হইতে উক্ত জীর্ণ ভবনে যাইবার যে পথ ছিল তাহার উভয় পার্শ্বে বৃহৎ ঝাউগাছের শ্রেণী বিদ্যমান থাকায় তখন এক অপূর্ব্ব শোভা ও দিব্যধ্বনি সর্ব্বদা নয়ন ও শ্রবণের সুখ সম্পাদন করিত। কাশীপুরের উদ্যান-বাটীতে ঠাকুরের নিকটে থাকিবার কালে আমরা উক্ত শীলমহাশয়দিগের উদ্যানে অনেক সময়ে গঙ্গাস্নানার্থ গমন করিতাম এবং ঠাকুর ভালবাসিতেন বলিয়া ঘাটের ধারে অবস্থিত বৃহৎ গুল্‌চি পুষ্পের গাছ হইতে কুসুম চয়ন করিয়া আনিয়া তাঁহাকে উপহার প্রদান করিতাম। অনেক সময় আবার অপূর্ব্ব ঝাউবৃক্ষরাজিশোভিত পথ দিয়া অগ্রসর হইয়া বসাকদিগের জনমানবশূন্য উদ্যানভবনে উপস্থিত হইয়া গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়া থাকিতাম। ঐ উদ্যানের কিঞ্চিৎ উত্তরে ৺প্রাণনাথ চৌধুরীর প্রশস্ত স্নানের ঘাট এবং তদুত্তরে সুপ্রসিদ্ধ লালাবাবুর পত্নী রাণী কাত্যায়নীর বিচিত্র গোপাল-মন্দির। ঐ স্থানেও আমরা কখন কখন স্নান এবং ৺গোপালজীর দর্শন জন্য গমন করিতাম। রাণী কাত্যায়নীর জামাতা ৺গোপালচন্দ্র ঘোষ কাশীপুর উদ্যানবাটীর সত্বাধিকারী ছিলেন। ভক্তগণ তাঁহারই নিকট হইতে উহা ঠাকুরের বাসের জন্য মাসিক ৮০৲ টাকা হার নিরূপণ করিয়া প্রথমে ছয় মাসের এবং পরে আরও তিন মাসের অঙ্গীকার-পত্র প্রদানে ভাড়া লইয়াছিল। ঠাকুরের পরমভক্ত শিমলাপল্লী-নিবাসী সুরেন্দ্রনাথ মিত্রই উক্ত অঙ্গীকারপত্রে সহি করিয়া ঐ ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৃহৎ না হইলেও কাশীপুরের উদ্যান-বাটীটি বেশ রমণীয়। পরিমাণে উহা চৌদ্দ বিঘা আন্দাজ হইবে। উত্তর-দক্ষিণে অপেক্ষা

ঐ চতুষ্কোণ ভূমির প্রসার পূর্ব্ব-পশ্চিমে কিছু অধিক ছিল এবং উহার চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। উদ্যানের উত্তর সীমার প্রায় মধ্যভাগে প্রাচীরসংলগ্ন পাশাপাশি তিন চারিখানি ছোট ছোট কুঠরি রন্ধন ও ভাঁড়ারের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঐ ঘরগুলির সম্মুখে উদ্যানপথের অপর পার্শ্বে একখানি দ্বিতল বাসবাটী; উহার নীচে চারখানি এবং উপরে দুইখানি ঘর ছিল। নিম্নের ঘরগুলির ভিতর মধ্যভাগের ঘরখানিই প্রশস্ত হলের ন্যায় ছিল। উহার উত্তরে পাশাপাশি দুইখানি ছোট ঘর, তন্মধ্যে পশ্চিমের ঘরখানি হইতে কাষ্ঠনির্ম্মিত সোপানপরম্পরায় দ্বিতলে উঠা যাইত এবং পূর্ব্বের ঘরখানি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত পূর্ব্বোক্ত প্রশস্ত হলঘর ও তাহার দক্ষিণের ঘরখানি—যাহার পূর্ব্বদিকে একটি ক্ষুদ্র বারাণ্ডা ছিল—সেবক ও ভক্তগণের শয়ন-উপবেশনাদির নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। নিম্নের হলঘরখানির উপরে দ্বিতলে সমপরিসর একখানি ঘর, উহাতেই ঠাকুর থাকিতেন। উহার দক্ষিণে প্রাচীরবেষ্টিত স্বল্পপরিসর ছাদ, উহাতে ঠাকুর কখন কখন পাদচারণ ও উপবেশন করিতেন এবং উত্তরে সিঁড়ির ঘরের উপরের ছাদ এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ঘরখানির উপরে অবস্থিত সমপরিসর একখানি ক্ষুদ্র ঘর, উহা ঠাকুরের স্নানাদির এবং দুই-একজন সেবকের রাত্রিবাসের জন্য ব্যবহৃত হইত।

বসতবাটীর পূর্ব্বে ও পশ্চিমে কয়েকটি সোপান বাহিয়া নিম্নের হলঘরে প্রবেশ করা যাইত এবং উহার চতুর্দ্দিকে ইষ্টকনির্ম্মিত সুন্দর উদ্যানপথ প্রায় গোলাকারে প্রসারিত ছিল। উদ্যানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে উহার পশ্চিম দিকের প্রাচীরসংলগ্ন দ্বারবানের নিমিত্ত

নির্দ্দিষ্ট ক্ষুদ্র ঘর এবং তদুত্তরে লৌহময় ফটক। ঐ ফটক হইতে আরম্ভ হইয়া গাড়ি যাইবার প্রশস্ত উদ্যানপথ পূর্ব্বোত্তরে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে অগ্রসর হইয়া বসতবাটীর চতুর্দ্দিকের গোলাকার পথের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। বসতবাটীর পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র ডোবা ছিল। হলঘরে প্রবেশ করিবার পশ্চিমের সোপানশ্রেণীর বিপরীতে উদ্যানপথের অপর পারে উক্ত ডোবাতে নামিবার সোপানাবলী বিদ্যমান ছিল। উদ্যানের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে উক্ত ডোবা অপেক্ষা একটি চারি-পাঁচগুণ বড় ক্ষুদ্র পুষ্করিণী ও তাহার উত্তর-পশ্চিম কোণে দুই-তিনখানি একতলা ঘর ছিল। তদ্ভিন্ন উদ্যানের উত্তর-পশ্চিম কোণে পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র ডোবার পশ্চিমে আস্তাবল ঘর এবং উদ্যানের দক্ষিণ সীমার প্রাচীরের মধ্যভাগের সম্মুখেই মালীদিগের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট দুইখানি পাশাপাশি অবস্থিত জীর্ণ ইষ্টকনির্ম্মিত ঘর ছিল। উদ্যানের অন্য সর্ব্বত্র আম্র, পনস, লিচু প্রভৃতি ফলবৃক্ষসমূহ ও উদ্যানপথসকলের উভয় পার্শ্ব পুষ্পবৃক্ষরাজিতে শোভিত ছিল এবং ডোবা ও পুষ্করিণীর পার্শ্বের ভূমির অনেক স্থল নিত্য আবশ্যকীয় শাকসব্জী উৎপাদনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। আবার, বৃহৎ বৃক্ষসকলের অন্তরালে মধ্যে মধ্যে শ্যামলতৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ড বিদ্যমান থাকিয়া উদ্যানের রমণীয়ত্ব অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়াছিল।

এই উদ্যানেই ঠাকুর অগ্রহায়ণের শেষে আগমনপূর্ব্বক সন ১২৯১ সালের শীত ও বসন্তকাল এবং সন ১২৯২ সালের গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতু অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ঐ আট মাস কাল ব্যাধি যেমন প্রতিনিয়ত প্রবৃদ্ধ হইয়া তাঁহার দীর্ঘ বলিষ্ঠ শরীরকে জীর্ণ ভগ্ন করিয়া

শুষ্ক কঙ্কালে পরিণত করিয়াছিল, তাঁহার সংযমসিদ্ধ মনও তেমনি উহার প্রকোপ ও যন্ত্রণা এককালে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি ব্যক্তিগত এবং মণ্ডলীগতভাবে ভক্তসংঘের মধ্যে যে কার্য্য ইতিপূর্ব্বে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার পরিসমাপ্তির জন্য নিরন্তর নিযুক্ত থাকিয়া প্রয়োজনমত তাহাদিগকে শিক্ষাদীক্ষাদি-প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। শুদ্ধ তাহাই নহে, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে নিজ সম্বন্ধে যে-সকল ভবিষ্যৎ কথা ভক্তগণকে অনেক সময়ে বলিয়াছিলেন, যথা—"যাইবার (সংসার পরিত্যাগ করিবার) আগে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিব (অর্থাৎ নিজ দেব-মানবত্ব সকলের সমক্ষে প্রকাশিত করিব)"; "যখন অধিক লোকে (তাঁহার দিব্য মহিমার বিষয়) জানিতে পারিবে, কানাকানি করিবে তখন (নিজশরীর দেখাইয়া) এই খোলটা আর থাকিবে না, মা'র (জগন্মাতার) ইচ্ছায় ভাঙ্গিয়া যাইবে"; "(ভক্তগণের মধ্যে) কাহারা অন্তরঙ্গ ও কাহারা বহিরঙ্গ তাহা এই সময়ে (তাঁহার শারীরিক অসুস্থতার সময়ে) নিরূপিত হইবে" ইত্যাদি—এই সকল কথার সাফল্য আমরা এখানে প্রতি-নিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভক্তগণসম্বন্ধী তাঁহার ভবিষ্যৎবাণীসকলের সফলতাও আমরা এই স্থানে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। যথা—"মা তোকে (নরেন্দ্রকে) তাঁর কাজ করিবার জন্য সংসারে টানিয়া আনিয়াছেন," "আমার পশ্চাতে তোকে ফিরিতেই হইবে, তুই যাইবি কোথায়," "এরা সব (বালক ভক্তগণ) যেন হোমা পাখীর শাবকের ন্যায়; হোমা পাখী আকাশে বহু উচ্চে উঠিয়া অণ্ড প্রসব করে, সুতরাং প্রসবের পরে উহার অণ্ডসকল প্রবলবেগে পৃথিবীর দিকে নামিতে থাকে—ভয় হয় মাটিতে

পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে; কিন্তু তাহা হয় না, ভূমি স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই অণ্ড বিদীর্ণ করিয়া শাবক নির্গত হয় এবং পক্ষ প্রসারিত করিয়া পুনরায় উর্দ্ধে আকাশে উড়িয়া যায়; ইহারাও সেইরূপ সংসারে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই সংসার ছাড়িয়া ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইবে।" তদ্ভিন্ন নরেন্দ্রনাথের জীবনগঠন পূর্ব্বক তাঁহার উপরে নিজ ভক্তমণ্ডলীর, বিশেষতঃ বালক-ভক্তসকলের ভারার্পণ করা ও তাহাদিগকে কিরূপে পরিচালনা করিতে হইবে তদ্বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া ঠাকুর এই স্থানেই করিয়াছিলেন। সুতরাং কাশীপুরের উদ্যানে সংসাধিত ঠাকুরের কার্য্যসকলের যে বিশেষ গুরুত্ব ছিল তাহা বলিতে হইবে না।

ঠাকুরের জীবনের ঐ সকল গুরুগম্ভীর কার্য্য যেখানে সংসাধিত হইয়াছিল, সেই স্থানটি যাহাতে তাঁহার পুণ্য-স্মৃতি বক্ষে ধারণপূর্ব্বক চিরকাল মানবকে ঐ সকল কথা স্মরণ করাইয়া বিমল আনন্দের অধিকারী করে তদ্বিষয়ে সকলের মনেই প্রবল ইচ্ছা স্বতঃ জাগ্রত হইয়া উঠে। কিন্তু হায়, ঐ বিষয়ে বিশেষ বিঘ্ন অধুনা উদিত হইয়াছে। আমরা শুনিয়াছি, উক্ত উদ্যান-বাটী রেল কোম্পানি হস্তগত করিতে অগ্রসর হইয়াছে। সুতরাং ঠাকুরের এই অপূর্ব্ব লীলাস্থল যে শীঘ্রই রূপান্তরিত হইয়া পাটের গুদাম বা অন্য কোনরূপ শ্রীহীন পদার্থে পরিণত হইবে তাহা বলিতে হইবে না।[১] কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা যদি ঐরূপ হয় তাহা হইলে দুর্ব্বল মানব আমরা আর কি করিতে পারি? অতএব 'যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্' বলিয়া ঐ কথার এখানে উপসংহার করি।

---

১ আনন্দের বিষয় এই যে, বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের কর্ত্তৃপক্ষ এই উদ্যানবাটী ক্রয় করিয়া নিজেদের অধিকারে আনিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতি এইস্থানে যথোচিত রক্ষিত হইবে।—প্রঃ

কাশীপুরে সেবাব্রত

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, পৌষ মাসে যাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া ঠাকুর অগ্রহায়ণ মাস সম্পূর্ণ হইবার দুই দিন পূর্ব্বে শ্যামপুকুর হইতে কাশীপুর উদ্যানে চলিয়া আসিয়াছিলেন। কলিকাতায় জনকোলাহল-পূর্ণ রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত শ্যামপুকুরের বাটী অপেক্ষা উদ্যানের বসতবাটীখানি অনেক অধিক প্রশস্ত ও নির্জ্জন ছিল এবং উহার মধ্য হইতে যে দিকেই দেখ না কেন, বৃক্ষরাজির হরিৎপত্র, কুসুমের উজ্জ্বল বর্ণ এবং তৃণ ও শষ্পসকলের শ্যামলতা নয়নগোচর হইত। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের তুলনায় উদ্যানের ঐ শোভা অকিঞ্চিৎকর হইলেও নিরন্তর চারি মাস কাল কলিকাতা-বাসের পরে ঠাকুরের নিকটে উহা রমণীয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। উদ্যানের মুক্ত বায়ুতে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি প্রফুল্ল হইয়া উহার চারিদিক লক্ষ্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আবার, দ্বিতলে তাঁহার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রশস্ত ঘরখানিতে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে তিনি উহার দক্ষিণে অবস্থিত ছাদে উপস্থিত হইয়া ঐস্থান হইতেও কিছুক্ষণ উদ্যানের শোভা নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। শ্যামপুকুরের বাটীতে যেরূপ রুদ্ধ, সঙ্কুচিতভাবে থাকিতে হইয়াছিল এখানে সেইভাবে থাকিতে হইবে না অথচ ঠাকুরের সেবা পূর্ব্বের ন্যায়ই করিতে পারিবেন এই কথা ভাবিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীও যে আনন্দিতা হইয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। অতএব তাঁহাদিগের উভয়ের আনন্দে সেবকগণের মন প্রফুল্ল হইয়াছিল একথাও বলা বাহুল্য।

উদ্যান-বাটীতে বাস করিতে উপস্থিত হইয়া যে-সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ অসুবিধা প্রথম প্রথম নয়নগোচর হইতে লাগিল সেই সকল দূর করিতে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। ঐ সকলের আলোচনায় নরেন্দ্রনাথ সহজেই বুঝিতে পারিলেন, ঠাকুরের সেবার দায়িত্ব যাঁহারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও চিকিৎসকগণের আবাস হইতে দূরে অবস্থিত এই উদ্যান-বাটীতে থাকিতে হইলে লোকবল এবং অর্থবল উভয়েরই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। প্রথম হইতে ঐ দুই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্যে অগ্রসর না হইলে সেবার ত্রুটি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। বলরাম, সুরেন্দ্র, রাম, গিরিশ, মহেন্দ্র প্রভৃতি যাঁহারা অর্থবলের কথা এ পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা ঐ বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন এক উপায় নিশ্চয় স্থির করিবেন। কিন্তু লোকবলসংগ্রহে তাঁহাকেই ইতিপূর্ব্বে চেষ্টা করিতে হইয়াছে এবং এখনও হইবে। ঐজন্য কাশীপুর উদ্যানে এখন হইতে তাঁহাকে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে হইবে। তিনি ঐরূপে পথ না দেখাইলে অভিভাবকদিগের অসন্তোষ এবং চাকরি ও পাঠহানির আশঙ্কায় যুবক-ভক্তদিগের অনেকে ঐরূপ করিতে পারিবে না। কারণ, ঠাকুরের শ্যামপুকুরে থাকিবার কালে তাহারা যেরূপে নিজ নিজ বাটীতে আহারাদি করিয়া আসিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইতেছিল এখান হইতে সেইরূপ করা কখনই সম্ভবপর নহে।

আইন (বি.এল্.) পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত নরেন্দ্র ঐ বৎসর প্রস্তুত হইতেছিলেন। উক্ত পরীক্ষার ও জ্ঞাতিদিগের শত্রুতাচরণে বাস্তুভিটার বিভাগ লইয়া হাইকোর্টে যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল তদুভয়ের নিমিত্ত তাঁহার কলিকাতায় থাকা এখন একান্ত

প্রয়োজনীয় হইলেও তিনি শ্রীগুরুর সেবার নিমিত্ত ঐ অভিপ্রায় মন হইতে এককালে পরিত্যাগপূর্ব্বক আইন-সংক্রান্ত গ্রন্থগুলি কাশীপুর-উদ্যানে আনয়ন ও অবসরকালে যতদূর সম্ভব অধ্যয়ন করিবেন, এইরূপ সংকল্প স্থির করিলেন। ঐরূপে সর্ব্বাগ্রে ঠাকুরের সেবা করিবার সংকল্পের সহিত সুবিধামত ঐ বৎসর আইন-পরীক্ষা দিবার সংকল্পও নরেন্দ্রনাথের মনে এখন পর্য্যন্ত দৃঢ় রহিল। কারণ, অন্য কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া তিনি ইতিপূর্ব্বে স্থির করিয়াছিলেন আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কয়েকটা বৎসরের পরিশ্রমে মাতা ও ভ্রাতাগণের জন্য মোটামুটি গ্রাসাচ্ছাদনের একটা সংস্থান করিয়া দিয়াই সংসার হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক ঈশ্বরসাধনায় ডুবিয়া যাইবেন। কিন্তু হায়, ঐরূপ শুভ সংকল্প ত আমরা অনেকেই করিয়া থাকি—সংসারের পশ্চাদাকর্ষণে এতদূর মাত্র গাত্র ঢালিয়াই বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক সম্মুখে শ্রেয়ঃমার্গে অগ্রসর হইব এইরূপ ভাবিয়া কার্য্যারম্ভ আমরা অনেকেই করি, কিন্তু আবর্ত্তে না পড়িয়া পরিণামে কয়জন ঐরূপ করিতে সমর্থ হই ? উত্তমাধিকারিগণের অগ্রণী হইয়া ঠাকুরের অশেষ কৃপালাভে সমর্থ হইলেও নরেন্দ্রনাথের ঐ সংকল্প সংসার-সংঘর্ষে বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া কালে অন্য আকার ধারণ করিবে না ত ?—হে পাঠক, ধৈর্য্য ধর, ঠাকুরের অমোঘ ইচ্ছাশক্তি নরেন্দ্রনাথকে কোথা দিয়া কি ভাবে লক্ষ্যে পৌছাইয়াছিল তাহা আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব।

ঠাকুরের সেবার জন্য ভক্তগণ যাহা করিতেছিলেন সেই সকল কথাই আমরা এ পর্য্যন্ত বলিয়া আসিয়াছি। সুতরাং প্রশ্ন হইতে পারে, দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে যাঁহাকে আমরা বেদ-বেদান্তের

পায়ের তত্ত্বসকলের সাক্ষাৎ উপলব্ধির সহিত একযোগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৈনন্দিন বিষয়সকলে এবং প্রত্যেক ভক্তের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে দেখিয়াছি, সেই ঠাকুর কি এইকালে নিজ সম্বন্ধে কোন চিন্তা না করিয়া সকল বিষয়ে সর্ব্বদা ভক্তগণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেন ? উত্তরে বলিতে হয়, তিনি চিরকাল যাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেন সেই জগন্মাতার উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ ও একান্ত নির্ভর করিয়া এখনও ছিলেন এবং ভক্তগণের প্রত্যেকের নিকট হইতে যে প্রকারের যতটুকু সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা লওয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার অভিপ্রেত ও তাহাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত একথা পূর্ব্ব হইতে জানিয়াই লইতেছিলেন। তাঁহার জীবনের আখ্যায়িকা বলিতে আমরা যতই অগ্রসর হইব ততই ঐ বিষয়ের পরিচয় পাইব।

আবার ভক্তগণকৃত যে-সকল বন্দোবস্ত তাঁহার মনঃপূত হইত না সেই সকল তিনি তাহাদিগের জ্ঞাতসারে এবং যেখানে বুঝিতেন তাহারা মনে কষ্ট পাইবে সেখানে অজ্ঞাতসারে পরিবর্ত্তন করিয়া লইতেন। চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আসিবার কালে শ্রীযুক্ত বলরামকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ, দশজনে চাঁদা করিয়া আমার দৈনন্দিন ভোজনের বন্দোবস্ত করিবে এটা আমার নিতান্ত রুচিবিরুদ্ধ, কারণ কখন ঐরূপ করি নাই। যদি বল, তবে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে ঐরূপ করিতেছি কিরূপে, কর্ত্তৃপক্ষেরা ত এখন নানা সরিকে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং সকলে মিলিয়া দেবসেবা চালাইতেছে ?—তাহাতে বলি এখানেও আমায় চাঁদায় খাইতে হইতেছে না ; কারণ রাসমণির সময় হইতেই বন্দোবস্ত করা হইয়াছে,

পূজা করিবার কালে ৭৲ টাকা করিয়া মাসে মাসে যে মাহিনা পাইতাম তাহা এবং যতদিন এখানে থাকিব ততদিন দেবতার প্রসাদ আমাকে দেওয়া হইবে। সেজন্য এখানে আমি একরূপ পেন্সনে[১] খাইতেছি বলা যাইতে পারে। অতএব চিকিৎসার জন্য যতদিন দক্ষিণেশ্বরের বাহিরে থাকিব ততদিন আমার খাবারের খরচটা তুমিই দিও।" ঐরূপে কাশীপুরের উদ্যান-বাটী যখন তাঁহার নিমিত্ত ভাড়া লওয়া হইল তখন উহার মাসিক ভাড়া অনেক টাকা (৮০৲) জানিতে পারিয়া তাঁহার 'ছাপোষা' ভক্তগণ উহা কেমন করিয়া বহন করিবে এই কথা ভাবিতে লাগিলেন; পরিশেষে ডষ্ট কোম্পানির মুৎসুদ্দি পরম ভক্ত সুরেন্দ্রনাথকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ সুরেন্দর, এরা সব কেরানী-মেরানী ছাপোষা লোক, এরা অত টাকা চাঁদায় তুলিতে কেমন করিয়া পারিবে, অতএব ভাড়ার টাকাটা সব তুমিই দিও।" সুরেন্দ্রনাথও করজোড়ে 'যাহা আজ্ঞা' বলিয়া ঐরূপ করিতে সানন্দে স্বীকৃত হইলেন। ঐরূপে পরে আবার একদিন তিনি দুর্ব্বলতার জন্য গৃহের বাহিরে শৌচাদি করিতে যাওয়া শীঘ্র অসম্ভব হইবে আমাদিগকে বলিতেছিলেন। যুবক ভক্ত লাটু[২] ঐদিন তাঁহার ঐ কথায় ব্যথিত হইয়া সহসা করজোড়ে সরলগম্ভীর ভাবে "যে আজ্ঞা মশায়, হামি ত আপন্‌কার মেস্তর (মেথর) হাজির আছি" বলিয়া তাঁহাকে ও আমাদিগকে

১ পেন্সনে না বলিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "পেন্সিলে খাইতেছি।"

২ স্বামী অদ্ভুতানন্দ নামে অধুনা ভক্তসংঘে সুপরিচিত। ইনি ছাপরানিবাসী ছিলেন। বাঙ্গালা বুঝিতে সমর্থ হইলেও ঐ ভাষায় কথা কহিতে ইঁহার নানাপ্রকার বিশেষত্ব প্রকাশ পাইয়া বালকের কথার ন্যায় সুমিষ্ট শুনাইত।

দুঃখের ভিতরেও হাসাইয়াছিল। যাহা হউক, ঐরূপে ক্ষুদ্র অনেক বিষয়ে ঠাকুর নিজ বন্দোবস্ত যথাযোগ্যভাবে নিজেই করিয়া লইয়া ভক্তগণের সুবিধা করিয়া দিতেন।

ক্রমে সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত হইতে লাগিল এবং যুবক ভক্তেরা সকলেই এখানে একে একে উপস্থিত হইল। ঠাকুরের সেবাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে নরেন্দ্র তাহাদিগকে ধ্যান, ভজন, পাঠ, সদালাপ, শাস্ত্রচর্চ্চা ইত্যাদিতে এমনভাবে নিযুক্ত রাখিতে লাগিলেন যে, পরম আনন্দে কোথা দিয়া দিনের পর দিন যাইতে লাগিল তাহা তাহাদিগের বোধগম্য হইতে লাগিল না। একদিকে ঠাকুরের শুদ্ধ নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রবল আকর্ষণ, অন্যদিকে নরেন্দ্র-নাথের অপূর্ব্ব সখ্যভাব ও উন্নত সঙ্গ একত্র মিলিত হইয়া তাহাদিগকে ললিত-কর্কশ এমন এক মধুর বন্ধনে আবদ্ধ করিল যে এক পরিবার-মধ্যগত ব্যক্তিসকল অপেক্ষাও তাহারা পরস্পরকে আপনার বলিয়া সত্যসত্য জ্ঞান করিতে লাগিল। সুতরাং নিতান্ত আবশ্যকে কেহ কোনদিন বাটীতে ফিরিলেও ঐ দিন সন্ধ্যায় অথবা পরদিন প্রাতে তাহার এখানে আসা এককালে অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। ঐরূপে শেষ পর্য্যন্ত এখানে থাকিয়া যাহারা সংসারত্যাগে সেবাব্রতের উদ্‌যাপন করিয়াছিল সংখ্যায় তাহারা দ্বাদশ[১] জনের অধিক না হইলেও প্রত্যেকে গুরুগতপ্রাণ ও অসামান্য কর্ম্মকুশল ছিল।

---

১ পাঠকের কৌতূহল নিবারণের জন্য ঐ দ্বাদশ জনের নাম এখানে দেওয়া গেল। যথা—নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন্দ্র, লাটু, তারক, গোপালদাদা (যুবকভক্তদিগের মধ্যে ইনিই একমাত্র বৃদ্ধ ছিলেন), কালী, শশী, শরৎ এবং (হুট্‌কো) গোপাল। সারদা পিতার নির্য্যাতনে মধ্যে মধ্যে আসিয়া দুই-এক দিন

কাশীপুরে আসিবার কয়েক দিন মধ্যেই ঠাকুর একদিন উপর হইতে নীচে নামিয়া বাটীর চতুঃপার্শ্বস্থ উদ্যানপথে অল্পক্ষণ পাদচারণ করিয়াছিলেন। নিত্য ঐরূপ করিতে পারিলে শীঘ্র সুস্থ ও সবল হইবেন ভাবিয়া ভক্তগণ উহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু বাহিরের শীতল বায়ুস্পর্শে ঠাণ্ডা লাগিয়া বা অন্য কারণে পরদিন অধিকতর দুর্ব্বল বোধ করায় কিছুদিন পর্য্যন্ত আর ঐরূপ করিতে পারেন নাই। শৈত্যের ভাবটা দুই-তিন দিনেই কাটিয়া যাইল, কিন্তু দুর্ব্বলতা-বোধ দূর না হওয়ায় ডাক্তারেরা তাঁহাকে কচি পাঁঠার মাংসের সুরুয়া খাইতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। উহা ব্যবহারে কয়েক দিনেই পূর্ব্বোক্ত দুর্ব্বলতা অনেকটা হ্রাস হইয়া তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ বোধ করিয়াছিলেন। ঐরূপে এখানে আসিয়া কিঞ্চিদধিক একপক্ষকাল পর্য্যন্ত তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়। ডাক্তার মহেন্দ্রলালও এই সময়ে একদিন তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া ঐ বিষয় লক্ষ্য করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের স্বাস্থ্যের সংবাদ চিকিৎসককে প্রদান করিতে এবং পথ্যের জন্য মাংস আনিতে যুবক সেবকদিগকে নিত্য কলিকাতা যাইতে হইত। একজনের উপরে উক্ত দুই কার্য্যের ভার প্রথমে অর্পণ করা হইয়াছিল। তাহাতে প্রায়ই বিশেষ অসুবিধা হইত

মাত্র থাকিতে সমর্থ হইত। হরিশের কয়েক দিন আসিবার পরে গৃহে ফিরিয়া মস্তিষ্কের বিকার জন্মে। হরি, তুলসী ও গঙ্গাধর বাটীতে থাকিয়া তপস্যা ও মধ্যে মধ্যে আসা-যাওয়া করিত; তদ্ভিন্ন অন্য দুইজন অল্পদিন পরে মহিমাচরণ চক্রবর্ত্তীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার বাটীতেই থাকিয়া গিয়াছিল।

দেখিয়া এখন হইতে নিয়ম করা হইয়াছিল, নিত্য প্রয়োজনীয় ঐ দুই কার্য্যের জন্য দুইজনকে কলিকাতায় যাইতে হইবে। কলিকাতায় অন্য কোন প্রয়োজন থাকিলে ঐ দুইজন ভিন্ন অপর একব্যক্তি যাইবে। তদ্ভিন্ন বাটী ঘর পরিষ্কার রাখা, বরাহনগর হইতে নিত্য বাজার করিয়া আনা, দিবাভাগে ও রাত্রে ঠাকুরের নিকটে থাকিয়া তাঁহার আবশ্যকীয় সকল বিষয় করিয়া দেওয়া প্রভৃতি সকল কার্য্য পালাক্রমে যুবক-ভক্তেরা সম্পাদন করিতে লাগিল এবং নরেন্দ্রনাথ তাহাদিগের প্রত্যেকের কার্য্যের তত্ত্বাবধান এবং সহসা উপস্থিত বিষয়সকলের বন্দোবস্ত করিতে নিযুক্ত রহিলেন।

ঠাকুরের পথ্য প্রস্তুত করিবার ভার কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর হস্তেই রহিল। সাধারণ পথ্য ভিন্ন বিশেষ কোনরূপ খাদ্য ঠাকুরের জন্য ব্যবস্থা করিলে চিকিৎসকের নিকট হইতে উহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া গোপালদাদা প্রমুখ দুই-এক জন, যাহাদের সহিত তিনি নিঃসঙ্কোচে বাক্যালাপ করিতেন তাহারা যাইয়া তাঁহাকে উক্ত প্রণালীতে পাক করিতে বুঝাইয়া দিত। পথ্য প্রস্তুত করা ভিন্ন শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বে এবং সন্ধ্যার কিছু পরে ঠাকুর যাহা আহার করিতেন তাহা স্বয়ং লইয়া যাইয়া তাঁহাকে ভোজন করাইয়া আসিতেন। রন্ধনাদি সকল কার্য্যে তাঁহাকে সহায়তা করিতে এবং তাঁহার সঙ্গিনীর অভাব দূর করিবার জন্য ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীকে এই সময়ে আনাইয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকটে রাখা হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে যাঁহারা সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন সেই সকল স্ত্রীভক্তগণের কেহ

কেহ মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সহিত কয়েক ঘণ্টা হইতে কখন কখন দুই-এক দিবস পর্য্যন্ত থাকিয়া যাইতে লাগিলেন। ঐরূপে কিঞ্চিদধিক সপ্তাহকালের মধ্যেই সকল বিষয় সুশৃঙ্খলে সম্পাদিত হইতে লাগিল।

গৃহী ভক্তেরাও ঐকালে নিশ্চিন্ত রহেন নাই। কিন্তু রামচন্দ্র অথবা গিরিশচন্দ্রের বাটীতে সুবিধামত সম্মিলিত হইয়া ঠাকুরের সেবায় কে কোন্ বিষয়ে কতটা অবসরকাল কাটাইতে এবং অর্থ-সাহায্য প্রদান করিতে পারিবেন তাহা স্থির করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। সকল মাসে সকলের সমভাবে সাহায্য প্রদান করা সুবিধাজনক না হইতে পারে ভাবিয়া তাঁহারা প্রতি মাসেই দুই একবার ঐরূপে একত্রে মিলিত হইয়া সকল বিষয় পূর্ব্ব হইতে স্থির করিবার সঙ্কল্পও এই সময়ে করিয়াছিলেন।

যুবক-ভক্তদিগের অনেকেই সকল কার্য্যের শৃঙ্খলা না হওয়া পর্য্যন্ত নিজ নিজ বাটীতে স্বল্পকালের জন্যও গমন করে নাই। নিতান্ত আবশ্যকে যাহাদিগকে যাইতে হইয়াছিল তাহারা কয়েক ঘণ্টা বাদেই ফিরিয়াছিল এবং বাটীতে সংবাদটাও কোনরূপে দিয়াছিল যে, ঠাকুর সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় নিয়মিতভাবে বাটীতে আসিতে ও থাকিতে পারিবে না। কাহারও অভিভাবক যে ঐ কথা জানিয়া প্রসন্নচিত্তে ঐ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করেন নাই, ইহা বলিতে হইবে না। কিন্তু কি করিবেন, ছেলেদের মাথা বিগড়াইয়াছে, ধীরে ধীরে তাহাদিগকে না ফিরাইলে হিতে করিতে বিপরীত হইবার সম্ভাবনা—এইরূপ ভাবিয়া তাহাদিগের ঐরূপ আচরণ কিছুদিন কোনরূপে সহ্য করিতে এবং তাহাদিগকে

ফিরাইবার উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত রহিলেন। ঐরূপে গৃহী এবং ব্রহ্মচারী ঠাকুরের উভয় প্রকারের ভক্ত সকলেই যখন একযোগে দৃঢ়নিষ্ঠায় সেবাব্রতে যোগদান করিল এবং সুবন্দোবস্ত হইয়া সকল কার্য্য যখন সুশৃঙ্খলার সহিত যন্ত্রপরিচালিতের ন্যায় নিত্য সম্পাদিত হইতে লাগিল, তখন নরেন্দ্রনাথ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া নিজের বিষয় চিন্তা করিবার অবসর পাইলেন এবং শীঘ্রই দুই-এক দিনের জন্য নিজবাটীতে যাইবার সংকল্প করিলেন। রাত্রিকালে আমাদিগের সকলকে ঐ কথা জানাইয়া তিনি শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা হইল না। কিছুক্ষণ পরেই উঠিয়া পড়িলেন এবং গোপাল প্রমুখ আমাদিগের দুই একজনকে জাগ্রত দেখিয়া বলিলেন, "চল্, বাহিরে উদ্যানপথে পাদচারণ ও তামাকু সেবন করি।" বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুরের যে ভীষণ ব্যাধি, তিনি দেহরক্ষায় সংকল্প করিয়াছেন কিনা কে বলিতে পারে? সময় থাকিতে তাঁহার সেবা ও ধ্যান-ভজন করিয়া যে যতটা পারিস্ আধ্যাত্মিক উন্নতি করিয়া নে, নতুবা তিনি সরিয়া যাইলে পশ্চাত্তাপের অবধি থাকিবে না। এটা করিবার পরে ভগবান্‌কে ডাকিব, ওটা করা হইয়া যাইলে সাধন-ভজনে লাগিব, এইরূপেই ত দিনগুলা যাইতেছে এবং বাসনাজালে জড়াইয়া পড়িতেছি। ঐ বাসনাতেই সর্ব্বনাশ, মৃত্যু—বাসনা ত্যাগ কর্, ত্যাগ কর্।"

পৌষের শীতের রাত্রি নীরবতায় ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। উপরে অনন্ত নীলিমা শত সহস্র নক্ষত্রচক্ষে ধরার দিকে স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিয়াছে। নীচে সূর্য্যের প্রখর কিরণসম্পাতে উদ্যানের বৃক্ষতলসকল শুষ্ক এবং সম্প্রতি সুসংস্কৃত হওয়ায় উপবেশনযোগ্য

হইয়া রহিয়াছে। নরেন্দ্রের বৈরাগ্যপ্রবণ, ধ্যানপরায়ণ মন যেন বাহিরের ঐ নীরবতা অন্তরে উপলব্ধি করিয়া আপনাতে আপনি ডুবিয়া যাইতে লাগিল। আর পাদচারণ না করিয়া তিনি এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন এবং কিছুক্ষণ পরে তৃণপল্লব ও ভগ্ন বৃক্ষ-শাখাসমূহের একটি শুষ্ক স্তূপ নিকটেই রহিয়াছে দেখিয়া বলিলেন, "দে উহাতে অগ্নি লাগাইয়া, সাধুরা এই সময়ে বৃক্ষতলে ধুনি জ্বালাইয়া থাকে, আর আমরাও ঐরূপে ধুনি জ্বালাইয়া অন্তরের নিভৃত বাসনাসকল দগ্ধ করি।" অগ্নি প্রজ্বলিত হইল এবং চতুর্দ্দিকে অবস্থিত পূর্ব্বোক্ত শুষ্ক ইন্ধনস্তূপসমূহ টানিয়া আনিয়া আমরা উহাতে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক অন্তরের বাসনাসমূহ হোম করিতেছি এই চিন্তায় নিযুক্ত থাকিয়া অপূর্ব্ব উল্লাস অনুভব করিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল যেন সত্যসত্যই পার্থিব বাসনাসমূহ ভস্মীভূত হইয়া মন প্রসন্ন নির্ম্মল হইতেছে ও শ্রীভগবানের নিকটবর্ত্তী হইতেছি! ভাবিলাম তাই ত কেন পূর্ব্বে এইরূপ করি নাই, ইহাতে এত আনন্দ! এখন হইতে সুবিধা পাইলেই এইরূপে ধুনি জ্বালাইব। ঐরূপে দুই-তিন ঘণ্টা কাল কাটিবার পরে, যখন আর ইন্ধন পাওয়া গেল না তখন অগ্নিকে শান্ত করিয়া আমরা গৃহে ফিরিয়া পুনরায় শয়ন করিলাম। রাত্রি তখন ৪টা বাজিয়া গিয়াছে। যাহারা আমাদিগের ঐ কার্য্যে যোগদান করিতে পারে নাই প্রভাতে উঠিয়া তাহারা যখন ঐ কথা শুনিল তখন তাহাদিগকে ডাকা হয় নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ তাহাতে তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার জন্য বলিলেন "আমরা ত পূর্ব্ব হইতে অভিপ্রায় করিয়া ঐ কার্য্য করি নাই এবং

অত আনন্দ পাইব তাহাও জানিতাম না, এখন হইতে অবসর পাইলেই সকলে মিলিয়া ধুনি জ্বালাইব, ভাবনা কি।"

পূর্ব্বকথামত প্রাতেই নরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় চলিয়া যাইলেন এবং একদিন পরেই কয়েকখানি আইনপুস্তক লইয়া পুনরায় কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

আত্মপ্রকাশে অভয়-প্রদান

কাশীপুরের উদ্যানে আসিবার কয়েক দিন পরে ঠাকুর যেরূপে একদিন নিজ কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া উদ্যানপথে স্বল্পক্ষণের জন্য পাদচারণা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা পাঠককে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। উহাতে দুর্ব্বল বোধ করায় প্রায় এক পক্ষকাল তিনি আর ঐরূপ করিতে সাহস করেন নাই। ঐ কালের মধ্যে তাঁহার চিকিৎসার না হইলেও চিকিৎসকের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। কলিকাতার বহুবাজার-পল্লীনিবাসী প্রসিদ্ধ ধনী অক্রুর দত্তের বংশে জাত রাজেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার আলোচনায় ও উহা সহরে প্রচলনে ইতিপূর্ব্বে যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ইঁহার সহিত মিলিত হইয়াই হোমিও-মতের সাফল্য ও উপকারিতা হৃদয়ঙ্গমপূর্ব্বক ঐ প্রণালী-অবলম্বনে চিকিৎসায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। ঠাকুরের ব্যাধির কথা রাজেন্দ্র বাবু লোকমুখে শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহাকে আরোগ্য করিতে পারিলে হোমিওপ্যাথির সুনাম অনেকের নিকটে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া চিন্তা ও অধ্যয়নাদিসহায়ে ঐ ব্যাধির ঔষধও নির্ব্বাচন করিয়া রাখিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণের সহিত ইনি পরিচিত ছিলেন। আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, অতুলকৃষ্ণকে একদিন এই সময়ে কোন স্থানে দেখিতে পাইয়া তিনি সহসা ঠাকুরের শারীরিক অসুস্থতার কথা জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক তাঁহাকে চিকিৎসা করিবার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত

করেন এবং বলেন, "মহেন্দ্রকে বলিও আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া রাখিয়াছি, সেইটা প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার পাইবার আশা রাখি, তাহার মত থাকিলে সেইটা আমি একবার দিয়া দেখি।" অতুলকৃষ্ণ ভক্তগণকে এবং ডাক্তার মহেন্দ্রলালকে ঐ বিষয় জানাইলে উহাতে কাহারও আপত্তি না হওয়ায় কয়েকদিন পরেই রাজেন্দ্র বাবু ঠাকুরকে দেখিতে আসেন এবং ব্যাধির আদ্যোপান্ত বিবরণ শ্রবণপূর্ব্বক লাইকোপোডিয়াম্ (২০০) প্রয়োগ করেন। ঠাকুর উহাতে এক পক্ষেরও অধিককাল বিশেষ উপকার অনুভব করিয়াছিলেন। ভক্তগণের উহাতে মনে হইয়াছিল, তিনি বোধ হয় এইবার অল্পদিনেই পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিবেন।

ক্রমে পৌষমাসের অর্দ্ধেক অতীত হইয়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী উপস্থিত হইল। ঠাকুর ঐ দিন বিশেষ সুস্থ বোধ করায় কিছুক্ষণ উদ্যানে বেড়াইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। অবকাশের দিন বলিয়া সেদিন গৃহস্থ ভক্তগণ মধ্যাহ্ন অতীত হইবার কিছু পরেই একে একে অথবা দলবদ্ধ হইয়া উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ঐরূপে অপরাহ্ণ ৩টার সময় ঠাকুর যখন উদ্যানে বেড়াইবার জন্য উপর হইতে নীচে নামিলেন তখন ত্রিশ জনেরও অধিক ব্যক্তি গৃহমধ্যে অথবা উদ্যানস্থ বৃক্ষসকলের তলে বসিয়া পরস্পরের সহিত বাক্যালাপে নিযুক্ত ছিল। তাঁহাকে দেখিয়াই সকলে সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া প্রণাম করিল এবং তিনি নিম্নের হলঘরের পশ্চিমের দ্বার দিয়া উদ্যানপথে নামিয়া দক্ষিণমুখে ফটকের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলে পশ্চাতে কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিতে

লাগিল। ঐরূপে বসতবাটী ও ফটকের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া ঠাকুর গিরিশ, রাম, অতুল প্রভৃতি কয়েকজনকে পশ্চিমের বৃক্ষতলে দেখিতে পাইলেন। তাহারাও তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তথা হইতে প্রণাম করিয়া সানন্দে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। কেহ কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই ঠাকুর সহসা গিরিশচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গিরিশ, তুমি যে সকলকে এত কথা (আমার অবতারত্ব সম্বন্ধে) বলিয়া বেড়াও, তুমি (আমার সম্বন্ধে) কি দেখিয়াছ ও বুঝিয়াছ?" গিরিশ উহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে ভূমিতে জানু সংলগ্ন করিয়া উপবিষ্ট হইয়া ঊর্দ্ধমুখে করজোড়ে গদ্‌গদ স্বরে বলিয়া উঠিল, "ব্যাস-বাল্মীকি যাঁহার ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই, আমি তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কি আর বলিতে পারি!" গিরিশের অন্তরের সরল বিশ্বাস প্রতি কথায় ব্যক্ত হওয়ায় ঠাকুর মুগ্ধ হইলেন এবং তাহাকে উপলক্ষ করিয়া সমবেত ভক্তগণকে বলিলেন, "তোমাদের কি আর বলিব, আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হউক!" ভক্তগণের প্রতি প্রেম ও করুণায় আত্মহারা হইয়া তিনি ঐ কথাগুলি মাত্র বলিয়াই ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। স্বার্থগন্ধহীন তাঁহার সেই গভীর আশীর্ব্বাণী প্রত্যেকের অন্তরে প্রবল আঘাত প্রদানপূর্ব্বক আনন্দস্পন্দনে উদ্বেল করিয়া তুলিল। তাহারা দেশ-কাল ভুলিল, ঠাকুরের ব্যাধি ভুলিল, ব্যাধি আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে স্পর্শ না করিবার তাহাদের ইতিপূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা ভুলিল এবং সাক্ষাৎ অনুভব করিতে লাগিল যেন তাহাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া কোন এক অপূর্ব্ব দেবতা হৃদয়ে অনন্ত যাতনা ও করুণা পোষণপূর্ব্বক বিন্দুমাত্র নিজ প্রয়োজন না

থাকিলেও মাতার ন্যায় তাহাদিগের স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় প্রদান করিতে ত্রিদিব হইতে সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে সস্নেহে আহ্বান করিতেছেন! তাঁহাকে প্রণাম ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণের জন্য তাহারা তখন ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং জয়রবে দিক্ মুখরিত করিয়া একে একে আসিয়া প্রণাম করিতে আরম্ভ করিল। ঐরূপে প্রণাম করিবার কালে ঠাকুরের করুণাব্ধি আজি বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া এক অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার উপস্থিত করিল। কোন কোন ভক্তের প্রতি করুণায় ও প্রসন্নতায় আত্মহারা হইয়া দিব্য শক্তিপূত স্পর্শে তাহাকে কৃতার্থ করিতে আমরা ইতিপূর্ব্বে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে প্রায় নিত্যই দেখিয়াছিলাম, অদ্য অর্দ্ধবাহ্যদশায় তিনি সমবেত প্রত্যেক ভক্তকে ঐ ভাবে স্পর্শ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার ঐরূপ আচরণে ভক্তগণের আনন্দের অবধি রহিল না। তাহারা বুঝিল আজি হইতে তিনি নিজ দেবত্বের কথা শুদ্ধ তাহাদিগের নিকট নহে কিন্তু সংসারে কাহারও নিকটে আর লুক্কায়িত রাখিবেন না এবং পাপী তাপী সকলে এখন হইতে সমভাবে তাঁহার অভয়পদে আশ্রয় লাভ করিবে—নিজ নিজ ত্রুটি, অভাব ও অসামর্থ্য-বোধ হইতে তদ্বিষয়েও তাহাদিগের বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না। সুতরাং ঐ অপূর্ব্ব ঘটনায় কেহবা বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে অক্ষম হইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহাকে কেবলমাত্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, কেহবা গৃহমধ্যস্থ সকলকে ঠাকুরের কৃপালাভে ধন্য হইবার জন্য চীৎকার করিয়া আহ্বান করিতে লাগিল, আবার কেহবা পুষ্পচয়নপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে ঠাকুরের অঙ্গে উহা নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ঐরূপ

হইবার পরে ঠাকুরের ভাব শান্ত হইতে দেখিয়া ভক্তগণও পূর্ব্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ হইল এবং অদ্যকার উদ্যান-ভ্রমণ ঐরূপে পরিসমাপ্ত করিয়া তিনি বাটীর মধ্যে নিজ কক্ষে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন।

রামচন্দ্র প্রমুখ কোন কোন ভক্ত অদ্যকার এই ঘটনাটিকে ঠাকুরের 'কল্পতরু' হওয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের বোধ হয়, উহাকে ঠাকুরের অভয়-প্রকাশ অথবা আত্মপ্রকাশপূর্ব্বক সকলকে অভয়-প্রদান বলিয়া অভিহিত করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। প্রসিদ্ধি আছে, ভাল বা মন্দ যে যাহা প্রার্থনা করে কল্পতরু তাহাকে তাহাই প্রদান করে। কিন্তু ঠাকুর ত ঐরূপ করেন নাই, নিজ দেব-মানবত্বের এবং জনসাধারণকে নির্ব্বিচারে অভয়াশ্রয়প্রদানের পরিচয়ই ঐ ঘটনায় সুব্যক্ত করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, যে-সকল ব্যক্তি অদ্য তাঁহার কৃপালাভে ধন্য হইয়াছিল তাহাদিগের ভিতর হারাণচন্দ্র দাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ, হারাণ প্রণাম করিবামাত্র ভাবাবিষ্ট ঠাকুর তাহার মস্তকে নিজ পাদপদ্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। ঐরূপে কৃপা করিতে আমরা তাঁহাকে অল্পই দেখিয়াছি।[১] ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায় ঐদিন ঐস্থানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার কৃপালাভে ধন্য হইয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "ইতিপূর্ব্বে ইষ্ট-মূর্ত্তির ধ্যান করিতে বসিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গের কতকটা মাত্র মানস নয়নে দেখিতে পাইতাম, যখন পাদপদ্ম

১ বেলিয়াঘাটানিবাসী হারাণচন্দ্র কলিকাতার ফিন্‌লে মিওর কোম্পানীর আফিসে কর্ম্ম করিতেন। ঠাকুরের কৃপার স্মরণার্থ তিনি ইদানীং প্রতি বৎসর মহোৎসব করিতেন। স্বল্পদিন হইল দেহরক্ষাপূর্ব্বক তিনি অভয়ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন।

দেখিতেছি তখন মুখখানি দেখিতে পাইতাম না, আবার মুখ হইতে কটিদেশ পর্য্যন্তই হয়ত দেখিতে পাইতাম, শ্রীচরণ দেখিতে পাইতাম না, ঐরূপে যাহা দেখিতাম তাহাকে সজীব বলিয়াও মনে হইত না, অদ্য ঠাকুর স্পর্শ করিবামাত্র সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ইষ্টমূর্ত্তি হৃদয়পদ্মে সহসা আবির্ভূত হইয়া এককালে নড়িয়া চড়িয়া ঝলমল করিয়া উঠিল !"

অদ্যকার ঘটনাস্থলে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগের আট-দশ জনের নামই মাত্র আমাদিগের স্মরণ হইতেছে, যথা—গিরিশ, অতুল, রাম, নবগোপাল, হরমোহন, বৈকুণ্ঠ, কিশোরী (রায়), হারাণ, রামলাল, অক্ষয়। 'কথামৃত'-লেখক মহেন্দ্রনাথও বোধ হয় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তগণের একজনও ঐদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না। নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ তাঁহাদিগের অনেকে ঠাকুরের সেবাদি ভিন্ন পূর্ব্বরাত্রে অধিকক্ষণ সাধন-ভজনে নিযুক্ত থাকায় ক্লান্ত হইয়া গৃহমধ্যে নিদ্রা যাইতেছিলেন। লাটু ও শরৎ জাগ্রত থাকিলেও এবং ঠাকুরের কক্ষের দক্ষিণে অবস্থিত দ্বিতলের ছাদ হইতে ঐ ঘটনা দেখিতে পাইলেও স্বেচ্ছায় ঘটনাস্থলে গমন করে নাই। কারণ, ঠাকুর উদ্যানে পাদচারণ করিতে নীচে নামিবামাত্র তাহারা ঐ অবকাশে তাঁহার শয্যাদি রৌদ্রে দিয়া ঘরখানির সংস্কারে নিযুক্ত হইয়াছিল এবং কর্ত্তব্য কার্য্য অর্দ্ধনিষ্পন্ন করিয়া ফেলিয়া যাইলে ঠাকুরের অসুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া তাহাদিগের ঘটনাস্থলে যাইতে প্রবৃত্তি হয় নাই।

উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আরও অনেক জনকে আমরা অদ্যকার অনুভবের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে বৈকুণ্ঠ-

নাথ আমাদিগকে যাহা বলিয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা এই বিষয়ের উপসংহার করিব। বৈকুণ্ঠনাথ আমাদিগের সমসাময়িক কালে ঠাকুরের পুণ্য-দর্শনলাভ করিয়াছিল। তদবধি ঠাকুর তাহাকে উপদেশাদি প্রদানপূর্ব্বক যে ভাবে গড়িয়া তুলিতেছিলেন তদ্বিষয়ের কোন কোন কথা আমরা 'লীলাপ্রসঙ্গের' স্থলে স্থলে পাঠককে বলিয়াছি। মন্ত্রদীক্ষাপ্রদানে ঠাকুর বৈকুণ্ঠনাথের জীবন ধন্য করিয়াছিলেন। তদবধি সে সাধন-ভজনে নিযুক্ত থাকিয়া যাহাতে ইষ্টদেবতার দর্শনলাভ হয় তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে-ছিল। ঠাকুরের কৃপা ভিন্ন ঐ বিষয়ে সফলকাম হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া সে তাঁহার নিকটেও মধ্যে মধ্যে কাতর প্রার্থনা করিতেছিল। এমন সময়ে ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি হইয়া চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আগমন এবং পরে কাশীপুরে গমনরূপ ঘটনা উপস্থিত হইল। ঐ কালের মধ্যেও বৈকুণ্ঠনাথ অবসর পাইয়া দুই-তিন বার ঠাকুরকে নিজ মনোগত বাসনা নিবেদন করিয়াছিল। ঠাকুর তাহাতে প্রসন্নহাস্যে তাহাকে শান্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, "রোস্ না, আমার অসুখটা ভাল হউক, তাহার পর তোর সব করিয়া দিব।"

অদ্যকার ঘটনাস্থলে বৈকুণ্ঠনাথ উপস্থিত ছিল। ঠাকুর ভক্ত-দিগের মধ্যে দুই-তিন জনকে দিব্যশক্তিপূত স্পর্শে কৃতার্থ করিবামাত্র সে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণামপুরঃসর বলিল, "মহাশয়, আমায় কৃপা করুন।" ঠাকুর বলিলেন, "তোমার ত সব হইয়া গিয়াছে।" বৈকুণ্ঠ বলিল, "আপনি যখন বলিতেছেন হইয়াছে তখন নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমি যাহাতে উহা অল্পবিস্তর বুঝিতে পারি তাহা করিয়া দিন। ঠাকুর তাহাতে

'আচ্ছা' বলিয়া ক্ষণেকের জন্য সামান্য ভাবে আমার বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিলেন মাত্র। উহার প্রভাবে কিন্তু আমার অন্তরে অপূর্ব্ব ভাবান্তর উপস্থিত হইল। আকাশ, বাড়ী, গাছপালা, মানুষ ইত্যাদি যেদিকে যাহা কিছু দেখিতে লাগিলাম তাহারই ভিতরে ঠাকুরের প্রসন্ন হাস্যদীপ্ত মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলাম। প্রবল আনন্দে এককালে উল্লসিত হইয়া উঠিলাম এবং ঐ সময়ে তোমাদের ছাদে দেখিতে পাইয়া 'কে কোথায় আছিস্ এই বেলা চলে আয়' বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে থাকিলাম। কয়েক দিন পর্য্যন্ত আমার ঐরূপ ভাব ও দর্শন জাগ্রতকালের সর্ব্বক্ষণ উপস্থিত রহিল। সকল পদার্থের ভিতর ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। অফিসে বা কর্ম্মান্তরে অন্যত্র যথায় যাইতে লাগিলাম তথায়ই ঐরূপ হইতে থাকিল। উহাতে উপস্থিত কর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে না পারায় ক্ষতি হইতে লাগিল এবং কর্ম্মের ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া উক্ত দর্শনকে কিছুকালের জন্য বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াও ঐরূপ করিতে পারিলাম না। অর্জ্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়া ভয় পাইয়া কেন উহা প্রতিসংহারের জন্য তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিদাভাস হৃদয়ঙ্গম হইল। মুক্ত পুরুষেরা সর্ব্বদা একরস হইয়া থাকেন ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য স্মরণ হওয়ায় কতটা নির্ব্বাসনা হইলে মন উক্ত একরসাবস্থায় থাকিবার সামর্থ্য লাভ করে তাহার কিঞ্চিদাভাসও এই ঘটনায় বুঝিতে পারিলাম। কারণ, কয়েক দিন যাইতে না যাইতে ঐরূপে একই ভাবে একই দর্শন ও চিন্তাপ্রবাহ লইয়া থাকা কষ্টকর বোধ হইল। কখন কখন মনে হইতে লাগিল, পাগল হইব না কি? তখন ঠাকুরের নিকটে

আবার সভয়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, 'প্রভু, আমি এই ভাবধারণে সক্ষম হইতেছি না, যাহাতে ইহার উপশম হয় তাহা করিয়া দাও।' হায়, মানবের দুর্ব্বলতা ও বুদ্ধিহীনতা! এখন ভাবি কেন ঐরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলাম—কেন তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থির রাখিয়া ঐ ভাবের চরম পরিণতি দেখিবার জন্য ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকি নাই?—না হয় উন্মাদ হইতাম, অথবা দেহের পতন হইত। কিন্তু ঐরূপ প্রার্থনা করিবার পরেই উক্ত দর্শন ও ভাবের সহসা এক দিবস বিরাম হইয়া গেল! আমার দৃঢ় ধারণা, যাঁহা হইতে ঐ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তাঁহার দ্বারাই উহা শান্ত হইল। তবে ঐ দর্শনের একান্ত বিলয়ের কথা আমার মনে উদিত হয় নাই বলিয়াই বোধ হয় তিনি কৃপা করিয়া উহার এইটুকু অবশেষ মাত্র রাখিয়াছিলেন যে, দিবসের মধ্যে যখন-তখন কয়েকবার তাঁহার সেই দিব্যভাবোদ্দীপ্ত প্রসন্ন মূর্ত্তির অহেতুক দর্শনলাভে আনন্দে স্তম্ভিত ও কৃতকৃতার্থ হইতাম।"